ক্রান্তিক

ক্রান্তিক

মাসিক সাহিত্য সঙ্কলন

২৬ বর্ষ, পৌষ (১৪০৫)

পত্রিকা পরিষদ
প্রধান উপদেষ্টা
কবিতা রায়চৌধুরী
উপদেষ্টামণ্ডলী
অমলকান্তি চট্টোপাধ্যায়, অমৃত দাশগুপ্ত,
নীলেশ চট্টোপাধ্যায়, পরেশ কর, বিষ্ণু সামন্ত
সভাপতিমণ্ডলী
পার্থ রায়, শৈবাল চন্দী, অনুপ গুহ,
রতন মিত্র, সোমনাথ চক্রবর্তী
সম্পাদক
চন্দন সেনগুপ্ত, রাসবিহারী দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক
তপন মুখোপাধ্যায়
সংযুক্ত সম্পাদক
অমর কুমারনন্দী, অশোক ভট্টাচার্য, প্রফিলকুমার কর, প্রবীর সেন,
তাপস রায়, তরু গুপ্ত
সহ-সম্পাদক
লাবু ঘোষ, সত্যজিৎকর জানা, অশোক বেরা
সঞ্চালক
বিমল দাস
সম্পাদক মণ্ডলী
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল সরকার,
অনসূয়া রায়চৌধুরী, কল্যাণ আচার্য, প্রচিবোধ মুহুরাজ,
পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, আনসারউদ্দিন হক, উত্তম পুরকায়স্থ, হারাণ আহসান,
শচীন্দ্র ঘোষ, মোহন নস্কর, মনোরঞ্জন পুরকাইত,
কল্পনা ভট্টাচার্য, গৌতম দে, প্রবীর মুখোপাধ্যায়, স্বপ্না ঘোষ,
শান্তনু সরকার, তপনকুমার রায়, পলাশ তরফ, আশিস দাস, নিরঞ্জন মণ্ডল।
কর্মাধ্যক্ষ
গোপাল পাঁজা
দপ্তর সম্পাদক □ রতন চট্টোপাধ্যায়
সহকারী দপ্তর সম্পাদক □ অনিরুদ্ধা সেন
অর্থ সচিব □ নিত্যলাল ঘোষ
বিজ্ঞাপন সচিব □ গীতা মিত্র, আরুণ দাস
প্রচার সচিব □ তপন কুমার বৈরাগ্য
প্রকাশন সচিব □ উজ্জ্বল চক্রবর্তী
প্রচ্ছদ □ অমর দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

প্রবন্ধ
পৌরাজ্ঞেশ্বরীহি কেনদন্ □ হর্ষবর্ধন □ ৩
প্রবন্ধ
একবীজ বিজ্ঞান ও সমাজ-একত □ ডাঃ কল্যাণ আচার্য □ ৫
বাল্মীকি রামায়ণে 'মানব' □ মণি রায় □ ১৩
মহাভারত-এর ভারতবর্ষ □ গোপেন ভদ্র □ ১৮
কবিতা
মনোরঞ্জন পুরকাইত, বিরূপাক্ষ পাত্র, শিবব্রত দে, কৃষ্ণচন্দ্র বরাই,
নিলীশ সামন্ত, বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়, অশোক বেরা, তপনকুমার দাস,
তপনকুমার বৈরাগ্য, আশুতোষ বিশ্বাস □ ১৫-১৭
ধারাবাহিক উপন্যাস
আকাশ কুসুম □ বিমলেন্দু চক্রবর্তী □ ২৫
বিশেষ
অমৃত কথা □ অজয়কুমার নন্দী □ ২৯
ধারাবাহিক রম্যরচনা
বঙ্গের দেশ সেনগুপ্ত □ অজিতকুমার বসু □ ৫০
গল্প
ছায়া সরে যায় □ দেবব্রত বিন্দু □ ৩৩
নতুন আলোয় □ অনিরুদ্ধা সেন □ ৪১
শিল্প সংস্কৃতি
নাটকারের প্রথম ভোমরা প্রোডিউসারের হাতে □ চন্দন সেন □ ৪৪
অনুবাদ গল্প
জগৎ যে রকম □ তোলস্তোয়ার □ ভাষান্তর-অরূপ মণ্ডল □ ৪৭
বইপত্র
□ ৫৩-৫৭

● প্রচ্ছদ-পরিচয়: অমি সরকার, অমর দাশগুপ্ত, সঞ্জীব ধাম ও পার্থ মৈত্র ● মূল্য : ১৮ টাকা

ক্রান্তিক গ্রুপ অফ পাবলিকেশনস-এর পক্ষে রাসবিহারী দত্ত কর্তৃক ৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে প্রকাশিত।
Krantik is published from Krantik group of publications for an annual subscription Rs. 150 in registered post and by hand delivery Rs. 100 Krantik Prakashani Suit-31, Block-5, Bankim Chatterjee St., Calcutta-700 073 RN-32755/78 Ph 551-4007

স · ম্পা · দ · কী · য়

অমর্ত্যের মর্ত্য গুলজার ও পশ্চিমী খেদ

নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হওয়ার পর যেমন একদিকে উৎসাহের বন্যা তেমনি নয়কণ্ডলজার-জনিত চিন্তার পশ্চিমী খেদ আন্তিপাথোর চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছেছে। তবে কি বিরাট মাপের কোন ভুল সংশোধিত হয়ে গেল। তার সুস্পষ্টভাব পশ্চিমী দুনিয়ার পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে পড়েছে। মার্কিনি সংবাদপত্রের শীর্ষ নাম অফিসারী, দি ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল স্পষ্টতই, আমাদের লৌকিক ভাষায় বলতে গেলে কেস চাঁচা ছোলা কথায় লিখেছে এবারের নোবেল পুরস্কার ভুল বিষয়ের মাথল নয় কি। রথার্ট এল পোলক তাঁর সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছেন, ইচ্ছাকৃত কি অনিচ্ছাকৃত জানিনা এবারের নোবেল কমিটির পছন্দ গতবারের পছন্দের সঙ্গে তীব্র কারাক ঘটিয়েছেন। একটি বিতর্কিত ব্যক্তিত্বকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে নোবেল পুরস্কারের পরম্পরাকে খাটো করলেন না তো। এইভাবে সম্পাদকীয় নিবন্ধের সার কথা হলো দি রয় ইকনমিষ্ট ওন। আসলে পশ্চিমী দুনিয়ার অনেকেই যাঁরা বিধায়ন বটিকার সর্বরোগহর গুণকে দুনিয়াকরণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন তাঁরা কেস কেলাসায় পড়ে গেছেন। কারণ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি ও তারপর ভারতীয় অর্থতত্ত্ব বিশ্লেষণ বিশ্ব চৌকিদার রাষ্ট্রকে তাবিরে তুলছে ক্রমশই। যত দিন যাচ্ছে বিধায়ন বিরোধী পালে জোর হাওয়া লাগছে, যান ছুটছে উৎপাতাবাদ, ঘরাতিরিক্ত গতিতে।

অথচ এমন কথা তো ছিল না ভারতীয় অর্থনীতিবিদ ভারত ছেড়ে পশ্চিমী তীর্থ ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিস্থাপন করেছেন। আমেরিকান ইকনমিক এ্যাসোসিয়েশন, দি ইকনমেট্রিক সোসাইটি, হুবার্ড, ট্রিনিটি কলেজ, ম্যাসাচুসেটস্ ইত্যাদি বিধায়নের সাহচর্য আদিত ও বন্দিত হয়েছেন যিনি তিনিই ভিন্ন এখন উদ্বিগ্নকারী ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মেসাইয়া হয়ে উঠেছেন দ্রুত। কোথায় পশ্চিমী অর্থনীতির প্রতি মমতার দক্ষিণ-বাম সমীকরণ সমূল কোন সেনার পাথরখানি তুল্য কোন অর্থনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে কলমটি ধরেন তা নয় স্তালিন আমেরিকা, ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্থান, বাংলাদেশ, আফ্রিকার মানুষের ক্ষুধা দারিদ্র্য বঞ্চনা ও নিপীড়নের জিম্মায় নিপীড়িতের প্রতি সমবেদনায় তিনি নান্দীমুখ। যারা পশ্চিমী দুনিয়ার অর্থনীতিচর্চাকে আপাদে ধরে করে যেন বলতে চাইছেন বিধায়নের চলা নিনাদ তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলোকে বিবেকশূন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন দান করে।

> অমর্ত্য সেন নির্মোহ দৃষ্টিতে ভারতীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারে অর্থনীতি চর্চা করে চলেছেন। তিনি সংঘাতের মধ্যে থেকেও ভারতীয় বৈরাগ্যের উপাসনায় দ্বৈরথীয়া অর্থনীতির বাইরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ধন্য মানবতার পূজারী। তিনি অর্থনীতি চর্চায় নৈতিকতার উচ্চ আসন দিয়েছেন। তাঁর অর্থনীতি চর্চার কেন্দ্রবিন্দু গজদন্তমিনারের মণিকোঠা নয় তাঁর অর্থনীতি চর্চা ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বঞ্চনা, নিপীড়নের শিকার যে তৃতীয় দুনিয়া তাদেরকে নিয়ে। ফলে ওঞ্জরণ তাঁকে ঘিরেই তৃতীয় দুনিয়ায়। মর্ত্যলোকে। অমর্ত্যলোকের ঠিকাদার কতিপয় দেশ তো এ নিয়ে নাক চোখ মুখ কোঁচকালেই কোথায় পুরস্কার দিয়ে কাফন কৌলিন্যের গৌলতে বিধায়ন বটিকার স্বপক্ষ প্রচার সংগঠিত করার অবরদস্ত সংগঠকের ভূমিকায় পাওয়া যাবে তাঁকে তা নয়, এ তো সেদি উল্টো মুল্লা। সংঘের পশ্চিমী খেদ।

এই সব দেশে সাহিত্যরসোত্তীর্ণ সাফল্য তখনই আসা সম্ভব যখন মানবকল্যাণ মুখী অর্থনৈতিক তত্ত্বের রূপায়ণ করা যাবে। বিনিয়োগ, উৎপাদন ও বন্টনের সীমারেখাই এক্ষেত্রে নির্ণায়ক। তাঁর মনোপীড়ায় বিশেষ উৎস পশ্চিমী অর্থনীতি চর্চায় নৈতিকতার যথাযথে বিসর্জন। প্রকরণ-সর্বস্ব অর্থতত্ত্ব নয়, প্রকরণ, প্রক্রিয়াকরণ যদি মানবতা বর্জিত কেবল উচ্চবর্গ অভিলাষ পূরক হয় তা গজদন্ত মিনার সংরক্ষিত সংবেদনার হতে পারে মাত্র। আপামর মানুষের তাতে কিছুই এসে যাবে না। উন্নয়ন ও পুঁজি বিনিয়োগ এ সবের সাফল্য নির্ভর করে মানুষের বাস্তব জীবন যাপনের ফলাফলের নিরিখে। এই নিরিখ নীতিনৈতিকতা মূল্যবোধ মানবিকতার নিরিখ। একে বাদ দিয়ে যে অর্থনীতি তা বিতন্ড, বিমূর্ত অর্থতত্ত্ব।

এ কি কথা। পল কলাগ কার্মী অর্থনীতি এ হো গ্রন্থ। নীতি নৈতিকতা এ হে বাহ্য, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ হীন, কখনো হয় না কি। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সর্বাধিক গুরুত্ব কেইনসিয়া অর্থনৈতিক তত্ত্বে রয়েছে, কিন্তু সেখানে জনকল্যাণের কি কথা নেই। কল্যাণ অর্থনীতির ঠিকাদারি কি কেবল হুবে তাদা হুকের হুকদারয়ই। এইভাবে খেলায় চটাচ্ছে পশ্চিমী দুনিয়া। তৃতীয় দুনিয়া এই নোবেল জয়কে কেন্দ্র করে বেশ মাতামাতি শুরু করেছে। এ অন্যায়।

এমন, গ্রন্থ কি এমন কাজ করেছেন বর্তমান নোবেলজয়ী। অমর্ত্য সেন নির্মোহ দৃষ্টিতে ভারতীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারে অর্থনীতি চর্চা করে চলেছেন। তিনি সংঘাতের মধ্যে থেকেও ভারতীয় বৈরাগ্যের উপাসনায় দ্বৈরথীয়া অর্থনীতির বাইরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ধন্য মানবতার পূজারী। তিনি অর্থনীতি চর্চায় নৈতিকতার উচ্চ আসন দিয়েছেন। তাঁর অর্থনীতি চর্চার কেন্দ্রবিন্দু গজদন্তমিনারের মণিকোঠা নয় ; তাঁর অর্থনীতি চর্চা ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বঞ্চনা, নিপীড়নের শিকার যে তৃতীয় দুনিয়া তাদেরকে নিয়ে। ফলে ওঞ্জরণ তাঁকে ঘিরেই তৃতীয় দুনিয়ায়। মর্ত্যলোকে। অমর্ত্যলোকের ঠিকাদার কতিপয় দেশ তো এ নিয়ে নাক চোখ মুখ কোঁচকালেই কোথায় পুরস্কার দিয়ে কাফন কৌলিন্যের গৌলতে বিধায়ন বটিকার স্বপক্ষ প্রচার সংগঠিত করার অবরদস্ত সংগঠকের ভূমিকায় পাওয়া যাবে তাঁকে তা নয়, এ তো সেদি উল্টো মুল্লা। সংঘের পশ্চিমী খেদ।

পেঁয়াজেশ্বরী হি কেবলম্

হর্ষবর্ধন

থলেতে আলু ঢেলে দিয়ে সবজিওলা বললো, বাবু পেঁয়াজ নিলেন না!

ভজহরিবাবু তো অবাক, সে কিরে, গত দুমাস ধরে তো পেঁয়াজের কথা ভুলেই আছি। হঠাৎ পেঁয়াজের কথা তুললি যে? দাম কমেছে?

—কমেছে

—এখন কত?

—পঞ্চাশে নেমেছে বাবু.....।

—এটা নাকা বলে! ভজহরিবাবুর ধমক খেয়ে সবজিওলা ছেলেটা চুপ করে থাকে। ভজহরিবাবুর পাশ্ব হওয়ার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে না। তুই বল বাবু, পঞ্চাশ যদি নাকা হয়, তবে উঁচা কাকে বলে বাচ্ছা। তার মানে একশো গ্রাম এখন পাঁচ পাঁচটা টাকা।

—পঞ্চাশ গ্রাম নেন তবে,

মিন মিন করে সবজিওলা নিবেদন করলো।

ভজহরিবাবু আড়চোখে একবার চারদিক দেখে নিলেন। চেঁচামেচি শুনে ভোম্বল, নকুড়, মহাদেব সব এসে জুটছে। নকুড় বলে—কি ভজাদা, হঠাৎ পেঁয়াজ কেনার শখ! তাদাই এসেছে নাকি?

ভজদা নকুড়কে খুবই স্নেহ করেন। পাড়ার ক্লাবের সেক্রেটারি। হাতে রাখতে হয় পূজোর চাঁদা দেওয়ার সময় কিছুটা কনসেশন মেলে।

—তাদাই না এলে পেঁয়াজ কেনা যাবে না নকুড়? এ কোন যুগে এসে পড়লাম হে ভোম্বল! তোমার ব্যাপার স্যাপার অবশ্য আলাদা।

ভোম্বল সদ্য ইনকাম ট্যাক্স অফিসে চাকরি পেয়েছে। তবু ভজাদার কথার ইঙ্গিত বুঝলো, প্রতিবাদ করে বললো, না ভজাদা, সে যুগ আর নেই। ইনকাম ট্যাক্স অফিসে চাকুরি করলেই পেঁয়াজ খাওয়া যাবে, নয়তো যাবে না— এ এখন আর হচ্ছে না।

এদিকে বাবু পড়েছে মুস্কিলে। দোকানের এক টিলতে জায়গা। অথচ ভিড় বাড়ছে। ভজহরি বাবুকে বললে, কাকু, তবে দশ গ্রাম দিই।

হা হা করে ভজহরিবাবু হাসলেন দশ গ্রাম পেঁয়াজ! মানে এক ভরির চেয়েও কম! পেঁয়াজ কি সোনা হয়ে গেল! তোর মুখে একটু মাটকালো না বাছা! দশ গ্রাম পেঁয়াজ দিবি!

ভারি কৌতুহলী দেখালো ভজহরি বাবুকে।

—দশ গ্রাম পেঁয়াজ। তা মেপে দিচ্ছিস কি করে!

ব্যাপারটা জটিল। পরোপকারী ভোম্বল এগিয়ে এলো জটিল অঙ্ক বোঝাতে।

শুনুন ভজাদা, রোজ কাগজে দেখেন না সোনারূপোর দরদাম!

—দেখি, চশমার কাঁচ মুছলো ভজহরিবাবু। এবার থেকে খবরের কাগজে পেঁয়াজের দরদামও ছাপা হবে। দেখে নেবেন।

—সে না হয় হল। কিন্তু মেজোমশাই খনা শুরু করছে যে ভোম্বল।

নকুড়ের উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ করলেন ভজহরিবাবু।

এই না হলে ক্লাবের সেক্রেটারি। ঠিক ধরেছ নকুড়।

নকুড়ও ধরে আছে। ভজহরিদার প্রশ্ন নকুড়ও আঁচ করতে পারছে না। বললো, আপনিই বলুন ভজাদা।

বলবো কি রে! আমি তো দেখতে চাইছি। দশগ্রাম পেঁয়াজ ও মেপে কি করে তা দেখতে চাইছি।

ভোম্বল বললো, দেখলি নকুড়, ভজাদার ব্রেন কত শার্প, দশগ্রাম সোনা মাপা যায়। কিন্তু দশগ্রাম পেঁয়াজ মাপা অসম্ভব।

হাবুর যোগেন্দ্র সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। যোগ পেয়েই বললো, নকুড়দা, গোটা পেঁয়াজ পেছি না তো!

ভজহরিদা তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো, এ কি রে! পেঁয়াজ কেটে বিক্রি করছিস।

হাবুর হাবভাবে কিন্তুমের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না। বরং সে একটুও বিচলিত না হয়ে বললো, কুমড়ো কাটলে তো একজনও বলেন না কেন কেটে বিক্রি করছি। আলুও তো কেটেই বিক্রি করি।

—ভোম্বল বললো, শুধু আলু কুমড়ো, কেন, কচুও তো কেটেই বিক্রি হয় ভজাদা।

নকুড় মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললো, যুক্তি অকাট্য। যেকোন গলা চুলকানো কচু ঘেঁচু কেটে বিক্রি হচ্ছে সেখানে দামি পেঁয়াজ কেটেই বিক্রি হতে পারে।

ভজহরিবাবু প্রথম রাউন্ডে হেরে গিয়ে চুপ মেরে গিয়েছিলেন। বিশেষ করে ভোম্বল যখন বললো, দেখুন ভজাদা, মাছ-মুরগি, পাঁঠা সব কেটেই বিক্রি হয়। তো পেঁয়াজ কি দোষ করলো।

ভজহরিবাবু বললো, মাছ-মাংসের তো অনেক দাম।

—হাবু বললো, এখন যা অবস্থা চলছে, দাম কম আর বলবেন না। দুহপ্তা দেখবেন আপনারী সপ্তাহে ডবল হয়ে গেছে। তখন তো কোয়ার্টার করে বিক্রি করতে হবে।

ভজহরিবাবুর চোখ ছানাবড়া। কোয়ার্টার করে মানে বুঝলুম না তো।

হাবু বললো, মানে খুবই সোজা, ভজাদা। আগে পুরো বা অর্ধেক কেটে গোটা পেঁয়াজ বিক্রি করতাম। এখন দাম বাড়লে একটি পেঁয়াজ চার টুকরো করব বিক্রি করবো।

—আরও দাম বাড়লে!

—আরও দাম বাড়লে আট টুকরো।

—আরও দাম বাড়লে।

—বোলো। আরও দাম বাড়লে!

—বত্রিশ। আরও বাড়লে চৌষট্টি। আরও বাড়লে।

ভজাদা এবার ধমক দিলেন। দাম যাচ্চা, বাড়াতে বাড়াতে একেবারে পেঁয়াজ টু দ্য পাওয়ার ইনফিনিটি পৌঁছে যাচ্ছিস।

হাবু অবাক হয়ে বললো, কাকু, পেঁয়াজ দেখো! কি বলছেন কিসসু তো বুঝতে পারলি না।

ভজহরিবাবু পকেটে হাত ঢোকাতে ঢোকাতে বললেন, বুঝতে কি আমরাও পারছি বাছা? এক ভরি পেঁয়াজ কিনবো তুইও মেপে দিবি কি করে শুনি!

—সোনারূপোর দোকানের মত একটা নিক্তি বার করেছে হাবু।

ভজহরিবাবু বললেন হাসবো কি কাঁদবো বুঝতে পারছি না, নকুড়।

নকুড় বললো, ভজাদা আগে পেঁয়াজ কাটতে চোখে জল আসত এখন পেঁয়াজ কিনতে গিয়ে চোখে জল আসছে।

* * * * *

—রাতে বাড়িতে ঝিনুমাসী ফোন করেছে। ভজহরিবাবু ফোন ধরলেন।

—হ্যাঁরে, ভজা, আমাদের এখানে পেঁয়াজ প্রদর্শনীর আয়োজন হচ্ছে।

ভজহরিবাবু চমকে উঠলেন, কি বললে মাসী, পেঁয়াজের প্রদর্শনী!

ঝিনুমাসী বললো, থাকিস তো পাঁয়ে। কালচারাল স্ট্যাণ্ডার্ড তো খুবই লো। পেঁয়াজের প্রদর্শনী তো কিছুই না। এখানে কদিন আগে পেঁয়াজ সপ্তাহ পালিত হল। আমরা সপ্তাহ পেঁয়াজের নানা তরকারি খেলাম।

—মানে! ভজহরিবাবু কিছুই বুঝতে পারছে না।

—বুঝলি না, এ একেবারে নূতন আইডিয়া। আমাদের পাড়ায় যতগুলো কোয়ার্টার আছে সেখানে সবাই মিলে ঠিক করেছে এ সপ্তাহে পেঁয়াজ সপ্তাহ বা Onion Week পালন করবে অর্থাৎ ঘুরেফিরে পেঁয়াজের সুতো, পেঁয়াজের খোল, পেঁয়াজের চাটনি

—বল কি মাসী!

—হ্যাঁরে ভজা, তবে আর বলছি কি!

—কিন্তু এত পেঁয়াজ পাচ্ছো কি করে!

—বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সাপ্লাই করেছে।

—বিনেপয়সায়!

—হ্যাঁ। একটা নাটকও মঞ্চস্থ হয়েছে। "পেঁয়াজের জন্য তোয়াজ" তবে নাটক না জমলেও প্রদর্শনীটা খুবই জমবে বলে মনে হচ্ছেরে ভজা।

ভজহরিবাবু খুবই অবাক হয়ে যাচ্ছেন। বললেন, মাসী পেঁয়াজের প্রদর্শনীতে কি হবে!

—পেঁয়াজের বিভিন্ন সুস্বাদ্য প্রজাতি প্রদর্শিত হবে। দেশে বিদেশে বিভিন্ন ধরণের পেঁয়াজ দেখানো হবে। ইরান থেকে যে প্রতিনিধি দল আসছে তারা দেখবে নকুলদানার মত পেঁয়াজ।

—নকুল দানার মত!

—একেবারে আকাশ থেকে পড়লি যে! ছোট পেঁয়াজই তো ভাল। ভরি মাপতে সুবিধে। কেন তোরা ভরিতে পেঁয়াজ কিনছিস না!

—আজই কিনেছি মাসী।

—কত পিছিয়ে আছিস দেখ। আমরা কিনছি গত পেরুমাস ধরে।

* * * * *

ভজহরিবাবুর মেজভাই জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক। সারাক্ষণ বিড় বিড় করে বকে যাচ্ছেন, অ্যালিসিরাম সিপা, অ্যালিসিরাম সিপা।

ভজহরিবাবু, দিন কয় লক্ষ্য করে বললেন, হাঁরে মজু, কি সব বিড় বিড় করে বকছিস!

—গোটা দেশ বকছে, তো আমি কি দেশের বাইরে দাদা!

ভজহরি অবাক হয়ে বললেন, গোটা দেশ বকছে মানে—

বিস্তারিত নেত্রে সন্তবাবু বললো, অ্যালিসিয়াম সিপা—মানে পেঁয়াজ। এখন ভূবিজ্ঞানীদের কাছে শুধু একটাই ধ্যানজ্ঞান—অ্যালিসিয়াম সিপা উৎপাদন।

—পারবে মনে হচ্ছে।

—খুব পারবে। দেখছো না মেদিনীপুরে মুসাম্বির চাষ হচ্ছে।

—মুসাম্বি আর পেঁয়াজ কি এক জিনিষ লো সন্তু?

সন্তকে নার্ভাস দেখাচ্ছে। কিন্তু মেয়ের ভবিষ্যৎ তো অ্যালিসিয়াম সিপা।

ভজহরিবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন তুই বাপু পেঁয়াজ বল দেখিনি। মাথাটা খালাপালা করে দিলি এসব সিপা-সিপা বলে। এমনিতে সকালে বাজার গিয়ে ভরিতে পেঁয়াজ কিনে মাথা গরম হয়ে আছে। এদিকে মিনুমাসী বলছে ইরান থেকে নাকি নকুলদানার মত ছোট পেঁয়াজ আসছে পেঁয়াজ প্রদর্শনীতে।

সন্তকে ভীষণ খুশি দেখাচ্ছে, ওমা তাই নাকি! তবে তো মাইক্রোসফোপিতে অ্যালিসিয়াম সিপা তো সম্ভব।

—মানে।

—মানে জলবৎ তরলম্। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায় এরকম পেঁয়াজ বাজারে আসবে।

—বটে।

—লিকুইড অ্যালিসিয়াম সিপা আসবে সিপা করে।

—লিকুইড মানে, তরল পেঁয়াজ মানে পেঁয়াজ জল?

—কেন হবে না লিকুইড সোপ বা তরল সাবান হয় না?

—তা বলে পেঁয়াজ জল?

—কেন গোলাপ জল হলে তো আপত্তি নেই না। পেঁয়াজ জল হলে আপত্তি কেন?

* * * * *

—পরদিনের সংবাদপত্র পড়ছেন ভজহরিবাবু। 'পেঁয়াজের জন্য তরুণীর আত্মহত্যা'।

ভজহরিবাবু খুঁটিয়ে পড়লেন খবরটা। বিয়েতে কনেপক্ষ প্রস্তাব দিয়েছিল তরকারিতে পেঁয়াজ বেশি ব্যবহার করা হবে না। বরপক্ষ মানতে নারাজ। এ নিয়ে মতান্তর। অতএব বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় তরুণীর আত্মহত্যা।

ভজহরিবাবু খবর পড়তে পড়তে রেগে বলে ফেললেন, শালার পেঁয়াজ খুব জ্বালাচ্ছে জ্বালা। বলেই জোরে জোরে অন্য খবর পড়তে লাগলেন।

ভজহরিবাবুর বাবা পাশে বসে জোর পেয়ারাচ্ছিলেন। ছেলের পেঁয়াজ নিয়ে মন্তব্য শুনে বলে উঠলেন। হ্যাঁরে, তুই এটা কোন ভাষায়ে—'শালা'-'টালা' ইত্যাদি অভদ্র শব্দ ব্যবহার করছে।

ভজহরিবাবু জিভ কাটলেন। বললেন, শালার নয় পড়তে ভুল হয়েছিল কালার পেঁয়াজ।

বুড়ো নকল দাঁত খুলে ভোকলা গালে বললেন, কালার পেঁয়াজ বলতে কি বোঝাতে চাস?

ভজহরিবাবু নিজের একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলেন। বললেন, আগে যেমন ধর লাল পেঁয়াজ হত।

বুড়ো বিরক্ত হয়ে বললেন, এখন তা বলে নীল পেঁয়াজ হবে নাকি? না বাদুনের মত পেঁয়াজও সাদা বেরোচ্ছে?

ভজহরিবাবু অগত্যা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলেন। বললেন, এখন তো লাল পেঁয়াজ নেই। কারণ সরকারের লাগে তাবি এসার্সি। লাল পার্টি, লাল সরকার, লাল পেঁয়াজ.....।

ভজহরির বাবা ওম মেরে গেলেন, ভজহরি বললো, বাবা, তুমি এ নিয়ে ঘাবড়িও ভেব না। মিনুমাসীদের পাড়ায় পেঁয়াজ প্রদর্শনীতে আরো তথ্য জানা যাবে।

* * * * *

ভজহরিবাবু রাতের খাবার খেতে যাবেন বলে ডাইনিং টেবিলের দিকে যাচ্ছেন। ঠিক এসময় কলিং বেল বেজে উঠলো।

ভজহরি ভাবছেন নিশ্চয় পেঁয়াজ নিয়ে কাল কোন প্রতিবাদ বিছিল। হয়তো বা বলবে চাঁদা চাই কাকু। হয়তো বা বলবে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সেমিনার।

এসবে ভজহরিবাবুর ঘেন্না ধরে গেছে। এক একটা মিনিটের আকাশছোঁয়া দাম হয়ে যায়। প্রতিবাদ হয়ে বিক্ষোভ হয়। তারপর একসময় সরকার এমন একটা দাম বেঁধে দেয় যা আগের দামের প্রায় দ্বিগুণ। এটাও একটা ভাঁওতা।

—কাকু আমরা.....

ভজহরিবাবুর চিন্তায় ছেদ পড়ল।

—আমরা এসেছি কাঁচালঙ্কা সমিতি থেকে।

—সেটা আবার কি?

—কেন কাকু জানেন না, কাঁচালঙ্কার দাম প্রায় আশি টাকা হয়েছে এখন?

—সে আর নূতন কি।

—কিন্তু এভাবে তো মুখ বুজে মেনে নেওয়া যায় না স্যর।

ভজহরিবাবু ভীষণ আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে। সকাল থেকে ঘটা সব ঘটনা ভেবে নিলেন। পেঁয়াজ নিয়ে যা সব জেনেছেন শুনেছেন, বিশেষ করে মিনুমাসীর প্রদর্শনীর কথাটা মনে পড়তেই ভজহরিবাবু ভদ্র করে ফেলে নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, তোমরা কাঁচালঙ্কার মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে কাঁচালঙ্কা সমিতি করেছো বুঝি। আর কি কি সমিতি হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের পাড়ায় খুব শিগগীর আলু সমিতি হবে। আলুর দামও এর মধ্যে বাড়তে শুরু করেছে।

ভজহরিবাবুর মাথায় আইডিয়া ঘোরাঘুরি করছে। এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে নিলেন। তারপর স্বগতোক্তি করলেন, পেঁয়াজেশ্বরী হি কেবলম্। আর তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি তো আমার এলাকায় পেঁয়াজ সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছি।

—ছেলেরা প্রথমটায় ভীষণ অবাক হয়ে ভজহরিবাবুর দিকে তাকিয়ে রইলো, সমিতি কাকু! এতবড় একটা খবর আপনি চেপে রেখেছিলেন! আপনি পেঁয়াজ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা!

—কেন! তোমাদেরও তো সমিতি আছে।

—আছে। আমাদের সমিতির চাই, আপনার সমিতির পরিস্থিতি অনেক বেশি মুখর। কারণ, কাঁচালঙ্কার চাইতে পেঁয়াজ প্রয়োজনীয়। এতে পাবলিক বেশিদিন অনেক বেশি হবে। আমরাও আপনার সমিতিতে যোগ দিতে চাই।

ভজহরিবাবু গম্ভীরভাবে বললেন ভেবে দেখি। আমাদের কর্মসমিতিতেও বৃহত্তর ভিত্তিতে ফ্রন্ট গড়ে তোলার আলোচনা হচ্ছে। তাতে আমরা কাঁচালঙ্কা এবং পাবলে আলুসমিতিতেও শামিল করতে চাই।

ভজহরিবাবু মুখ দিয়ে খই ফুটছে। পরিস্থিতি মানুষকে বদলে দেয়। মুখচোরা ভজহরিবাবু দারুণ বক্তা হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে পারছেন।

তাপিস পেঁয়াজ লঙ্কার দাম বেড়েছিল তাই তো ভজহরিবাবু বক্তা হিসেবে স্বীকৃতি পাবার ঘোরগোড়ায়।

কাঁচালঙ্কা সমিতির ছেলেরা জয়ধ্বনি দিতে লাগলো ভজহরিবাবুর।

ভজহরিদা যুগ যুগ জিও। পেঁয়াজের জন্য তোয়াজ করা চলবে না চলবে না।

কাঁচালঙ্কার মূল্যবৃদ্ধি চলবে না, চলবে না আলুর দাম বাড়ছে কেন—

সরকার তুমি জবাব দাও।

ভজহরিবাবুর বুকের ছাতি ফুলে উঠছে। উঁচু গলায় বললেন, কাল সকালেই আমরা তৃণমূলে কাজ শুরু করে দেবো। কাল সকাল থেকেই.....।

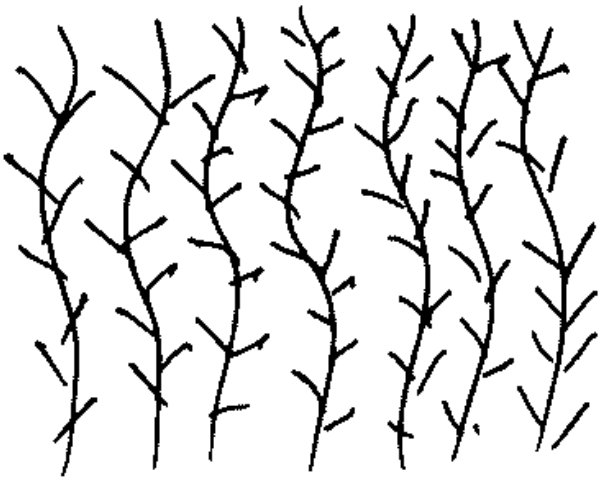

বিজ্ঞানসম্মত সমাজব্যবস্থার সন্ধানে :

এককীয় বিজ্ঞান ও সমাজ-একক

ডাঃ ক ল্যা ণ আ চা র্য

[এই রচনাটি আধুনিক দ্বন্দ্ববিজ্ঞানের বিশিষ্ট গবেষক ডা রবীন্দ্রনাথ মাইতি-র সুদীর্ঘ গবেষণার অতি-সরলীকৃত রূপ। তাঁর কিছু মৌলিক গ্রন্থ পাঠ করে এবং সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে যতটুকু বোঝা গেছে তার কিছু প্রকাশ করার চেষ্টা হ'ল। পাঠকবর্গের মনে এই দুরূহ বিষয়টি সম্পর্কে আগ্রহের সঞ্চার করাতে পারলে রচনাটি সার্থক হবে।]

এই সৃষ্টির যা কিছু অস্তিত্ববান, তাইই পদার্থ। পদার্থ ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। মানুষের ভাবনা-চিন্তাও পদার্থ অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে। আমরা যে সমস্ত শক্তির কথা জানি, অর্থাৎ তাপশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি, আলোকশক্তি ইত্যাদি—সেগুলোও মূলত পদার্থ বা বস্তুই। তাতে তরঙ্গ—উৎপাদান (বা সেদেশত রূপ) খুব সামান্যই থাকে, কেন্দ্র-উপাদান বা ক্রিয়াগত দিকটাই আমরা উপলব্ধি করি। ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম বস্তু (অণুজগৎ, প্রাণী, সমাজদেহ) আপাতভাবে ভিন্ন হলেও একটি বিশেষ প্রক্রিয়া (দেহ এবং ক্রিয়াগত) বিবর্তনের প্রতিটি পদক্ষেপে (যথাক্রমে পদার্থ, রসায়ন, প্রাণ, প্রজাতি এবং সামাজিক পর্যায়ে) কিছু কিছু পরিমার্জনা এবং ওলটপালটভাবে বিকশিত হয়ে সমস্ত কিছুর মধ্যে সর্বজনীন ভাবে বিদ্যমান রয়েছে এবং সারীভূত একক (যেমন পরমাণু, অণু, জীবকোষ, জীবদেহ ইত্যাদি) গড়ার কাজেই পরিচালিত হয়েছে, অর্থাৎ 'Evolution is unit-based (R.M)'। সেই একক্রীয় প্রক্রিয়ার স্বরূপ, বিবর্তন ও বিকাশমূলক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকে 'এককীয় বিজ্ঞান' নামে অভিহিত করা হয়।

'এককীয় বিজ্ঞান' নামকরণটি নতুন। বিষয়টি মূলত প্রকৃতিবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এটি প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ (জীবন বিজ্ঞানসহ) এবং সমাজ-বিজ্ঞানের (বা তত্ত্বের) মধ্যে আন্তঃসম্পর্কমূলক। এমনি কি এই তত্ত্ব পদার্থবিদ্যার সঙ্গে ভাষা বা সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণয়েও সক্ষম। এদিকে জানা গেছে "Dialectics is the Science of Universal Interconnection." F. Engels। সুতরাং এককীয় বিজ্ঞানের সঙ্গে দ্বন্দ্ববিজ্ঞানের এক সুনিবিড় সম্পর্ক আছে-একথা বলাই বাহুল্য। দ্বন্দ্ববিজ্ঞানের 'দ্বন্দ্ব' যদি তার প্রাণ হয়, তবে 'একক' হ'ল তার দেহ। অর্থাৎ একক দেহের মধ্যেই দ্বন্দ্ব-প্রক্রিয়ার প্রকাশ হয়। কিন্তু দেহহীন প্রাণ অকল্পনীয়। তাই একটি

সার্থক নামকরণ করা হয়েছিল 'একক্রীয় দ্বন্দ্ববিজ্ঞান'। কিন্তু 'দ্বন্দ্ববিজ্ঞান' কথাটি মার্কসবাদের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে উভয়কেই প্রায়নুযায়ী সমার্থক বলে মনে করা হয়। কিন্তু 'দ্বন্দ্ববিজ্ঞান' বিষয়টি কোন 'বাদে'র দ্বারা শুরু হয়ে যায়নি। এটি সম্পূর্ণ বস্তু-বিষয়ে পরিচালিত একটি বিজ্ঞানশীল বিষয়। প্রকৃতি বিজ্ঞানের নব নব মৌলিক নীতির আবিষ্কার (প্রকৃতি নয়) ক্রমাগত দ্বন্দ্ববিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে চলেছে এবং চলবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় 'দ্বন্দ্ববিজ্ঞান' শব্দটি তার সর্বজনীনত্ব হারিয়েছে। তাই গভীর দুঃখের সঙ্গে 'দ্বন্দ্ব' কথাটি বাদ দিয়ে শুধু 'একক্রীয় বিজ্ঞান' নামটি রাখা হয়েছে। এতে অবশ্য বিষয়বস্তুর আলোচনার খুব একটা অসুবিধা হবে না যদিও নামকরণে অনেক কিছু এসে যায়। নামের মধ্যদিয়ে বিষয় বস্তুর মূখ্য গতিটিকে ধরা যায়। 'একক্রীয় দ্বন্দ্ববিজ্ঞান' বা 'একক্রীয় বিজ্ঞান'-কে কিন্তু চিরায়ত দ্বন্দ্ববিজ্ঞান বা 'Classical Dialectics'—এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যাবে না। কারণ এতে অনেক নতুন নতুন বিষয় রয়েছে যেগুলো ইতিপূর্বে কখনো ভাবা হয়নি। মার্কস্-এঙ্গেলস্ তাঁদের জীবদ্দশায় (মার্কস্ ১৮১৮-১৮৮৩, এঙ্গেলস্ ১৮২০-১৮৯৫) মোটামুটিভাবে তিনটি বড় প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হাতে পেয়ে হেগেলীয়ান দ্বন্দ্বতত্ত্বকে সমৃদ্ধ করে (গ্রহণ বর্জন নীতিতে) তাকে দ্বন্দ্ববিজ্ঞানে বিকশিত করেন। আবিষ্কার তিনটি হ'ল—১। জীবকোষের আবিষ্কার ২। তেজের আন্তঃপরিবর্তন তত্ত্ব এবং ৩। বিবর্তনবাদ। শুধু তাই নয়, এই বিজ্ঞানকে সমাজ-বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত করে এবং তাকে সমাজ-বিকাশে কাজে লাগিয়ে অভূতপূর্ব সাফল্যও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু মার্কস্-এর মৃত্যুর পরবর্তী একশ বছরের মধ্যে প্রকৃতিবিজ্ঞানে এমন কতগুলি মৌলিকতত্ত্ব আবিষ্কৃত এবং প্রমাণিত হয়েছে যে, সে গুলোর আলোকে দ্বন্দ্ববিজ্ঞানকে নতুনভাবে সমৃদ্ধ করতে না পারলে আধুনিক সমাজে তাকে প্রয়োগ করা যাবে না। তাই চিরায়ত দ্বন্দ্ববিজ্ঞান একটি পরাতনার বিষয়বস্তু হলেও সামাজিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'বিকাশমান দ্বন্দ্ববিজ্ঞান' অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে 'একক্রীয় বিজ্ঞান' এবং 'বিকাশমান দ্বন্দ্ববিজ্ঞান' সমার্থক বলা যেতে পারে। যাই হোক, মার্কস্-পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ নতুন আবিষ্কারগুলো হ'ল :—

১। মাইকেলসন-মর্লির আলোর গতিবেগ সম্বন্ধীয় পরীক্ষা (১৮৮৭),

২। তড়িতের তেজস্ক্রিয় রশ্মি সম্বন্ধে কুরী দম্পতির আবিষ্কার (১৮৯৮),

। পরিমাণিক বলবিদ্যা সম্পর্কে প্লাঙ্ক প্রমুখের সিদ্ধান্ত (১৯০০),

। আইনস্টাইনের ভর-তেজ (mass-energy) সমষ্টির রূপপরিবর্তনীয়তা সম্বন্ধীয় আপেক্ষিক তত্ত্ব (১৯০৫),

৫। পরমাণুর গঠন আবিষ্কার (অর্থাৎ কেন্দ্রক এবং ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন (১৯১১-১২),

৬। প্রোটন আবিষ্কার (১৯২০),

৭। নিউট্রন আবিষ্কার (১৯২১, নামকরণ-১৯৩২),

। পজিট্রন আবিষ্কার—(কল্পনা ১৯২৫, আবিষ্কার ১৯৩২, ইলেকট্রন, পজিট্রন এবং প্রোটনের সম্পর্ক নির্ণয়),

৯। মেসন-কণিকার আবিষ্কার (প্রোটন এবং নিউট্রনের মধ্যবর্তী বিনিময়ক পদার্থ ১৯৩৬, ১৯৪৭-৪৮)

১০। জ্ঞান তত্ত্বের কিছু আধুনিক আবিষ্কার।

—উপরোক্ত আবিষ্কারগুলোর ভিত্তিতে চিরায়ত দ্বন্দ্ববিজ্ঞানে যে পরিবর্তনগুলো সাধিত হ'ল, সেগুলো হ'ল—

১। চিরায়ত দ্বন্দ্ববিজ্ঞান ছিল মূলতঃ আন্তঃসম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু 'বিকাশমান দ্বন্দ্ববিজ্ঞান' প্রতিষ্ঠিত হ'ল মূলতঃ আন্তঃপরিবর্তনের উপর।

২। চিরায়ত দ্বন্দ্ববিজ্ঞানে ছিল দ্বিমেরুধ্রুবিকতা কিন্তু বিকাশমান দ্বন্দ্ববিজ্ঞানে এল ত্রিমেরু ধ্রুবিকতা, অর্থাৎ একক দেহের মধ্যে দুটি আন্তঃপরিবর্তনশীল ভিন্নধর্মবিশিষ্ট (আপেক্ষিকভাবে) উপাদানের মধ্যবর্তী স্বয়ংক্রিয় বিনিময়ক উপাদানের উপস্থিতি (মূলতঃ মেসন কণার আবিষ্কারের পর প্রমাণিত)। একক্রীয় বিজ্ঞান বা বিকাশমান দ্বন্দ্ববিজ্ঞান অনুযায়ী একক দেহের মধ্যে সংঘটিত ক্রিয়াকৌশল নিম্নরূপ।

একটি পদার্থে যতরকম উপাদানই থাকুক না কেন, সেগুলোকে তিনটি ধরণে ভাগ করা যায়। ১। ভরপ্রধান উপাদান, ২। তেজপ্রধান উপাদান এবং মধ্যস্থ বিনিময়ক উপাদান। ভরপ্রধান এবং তেজপ্রধান উপাদান পরস্পর বৈপরীত্যমূলক বা ভিন্নধর্মী এবং এদের ধারণাও আপেক্ষিক। একটি ক্ষেত্রে তেজপ্রধান উপাদান অপরক্ষেত্রে তার চাইতেও ক্রিয়াশীল উপাদানের কাছে ভরপ্রধান বলে পরিগণিত হতে পারে। ভরপ্রধান উপাদানগুলি বস্তুর দেহগত রূপকে প্রকাশ করে। 'ভর' হ'ল বস্তুর এমন ধর্ম যার দ্বারা বস্তুটি কিছুটা স্থান দখল করে থাকতে চায়। সুতরাং 'ভর' কথাটির মধ্যদিয়ে 'দেশ (Space)'—মাত্রাটি (dimension) সম্পর্কে ধারণা জন্মায়। তেজপ্রধান উপাদান বস্তুর ক্রিয়াগত রূপকে প্রকাশ করে। কিন্তু ক্রিয়া হলেই সময় এগিয়েছে বোঝা যায়। কোন বস্তু যদি অপরিবর্তনীয় অবস্থায় চিরকাল নিশ্চল নিশ্চুপ হয়ে থাকে তাহলে তার কাছে সময়ও থেমে থাকে। তাই তেজপ্রধান উপাদানের মাধ্যমে আমরা 'কাল (time)' সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি। সুতরাং বিনিময়ক উপাদানগুলো এক একটি স্বয়ংক্রিয় কলাকৌশল পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করে যার মাধ্যমে ভরপ্রধান উপাদান এবং তেজপ্রধান উপাদানের মধ্যে পদার্থ বিনিময়ের মাধ্যমে অবিরাম আন্তঃক্রিয়া হয়। একক্ষেত্রে বস্তুর মধ্যে ভর এবং তেজের পরিমাণের অনুপাত হিসাবে বস্তুটি কখনও ভরপ্রধান এবং কখনও তেজপ্রধান বলে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ভর বা তেজ-কোনটিই সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় না এবং ভর-তেজের মোট পরিমাণ সমান থাকে। (আলোকতরঙ্গেরও সূক্ষ্মতম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আছে—যা তরঙ্গধর্মেই প্রকাশ করবে।) বিনিময়ক উপাদানের মাধ্যমে সমরূপ নির্দিষ্ট সময়ে কতবার এবং কতটা আন্তঃপরিবর্তন হ'ল—সেই বিষয়ে ধারণা করতে পারি। তাই এর মাধ্যমে 'সংখ্যা (Number)' বিষয়টি প্রকাশ পায়। এইভাবে দেশ, কাল ও সংখ্যা—এই তিনটি মাত্রা বা dimension-এর মাধ্যমে সমগ্র বস্তুটি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ধারণা করতে পারি। এখন আপাত স্থির এবং অপরিবর্তনীয় বস্তুর ক্ষেত্রে খুব দ্রুত তার বিপরীত প্রক্রিয়াটিও সমাধা হয় বলে বস্তুটির অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটছে না বলে মনে হয়। কিন্তু তা হলে কি হবে, এর মধ্যে 'আশা যাওয়ার' মত এক গতিবান প্রক্রিয়া সব সময়ই কাজ করছে। একজন মানুষ যদি ছোট একটি জায়গার মধ্যে খুব দ্রুত নড়াচড়া করে এবং বারে বারে একই জায়গায় ফিরে আসে, তাহলে দূর থেকে মনে হবে সে স্থির আছে। ভর-প্রধান বস্তু বা কণিকার ধর্মই হ'ল এই ধরণের আপেক্ষিক স্থিতি। কণিকাটি দিব থেকেও কেন অবিরাম কাঁপছে। এই কম্পনটিকে 'কণিকাতরঙ্গী' বা 'স্পন্দন' বলে। আরো সহজ করে হ'ল একবার আন্তঃক্রিয়ার পর আমরা কিন্তু ঠিক পুরনো উপাদানটিকে ফিরে পাচ্ছিনা, পাচ্ছি সমধর্মী এক নতুন উপাদান। সেক্ষেত্রে একটি বস্তুর অসংখ্যবার জন্ম-মৃত্যু হচ্ছে। সুতরাং 'গতি'কে বস্তুর একটি প্রধান ধর্ম বলা যায় এবং 'এক নদীতে দুবার স্নান করা যায় না' কথাটিও খুব খাঁটি। তেজবান পদার্থ বা আলো, বিদ্যুৎ ইত্যাদির ক্ষেত্রে পদার্থের অংশবিশেষ ক্রমাগত নড়তে থাকে এবং উপাদানগুলির মধ্যে এমনভাবে আন্তঃক্রিয়া হয় যে সমগ্র-বস্তুটিই একদিকে সরতে থাকে। এই তরঙ্গটিকে 'তরঙ্গ' বা প্রবাহকণী বা কম্পনও বলে। এটা তেজপ্রধান পদার্থের ধর্ম। পরিবর্তনশীল পদার্থের মধ্যে এমনভাবে আন্তঃক্রিয়া হয় যে হয় বস্তুটির পরিমাণগত পরিবর্তন হয়, নয় গুণগত পরিবর্তন—যার, অন্যের কখনও পরিমাণগত

পরিবর্তন হতে হতে হঠাৎ গুণগত পরিবর্তন হয়ে যায়। একটা গাছ ছোট থেকে বড় হলে গাছ গাছই থাকে। সুতরাং একে পরিমাণগত পরিবর্তন বলা যায়, যা জল ফুটিয়ে বাষ্প হলে তরলরূপ 'জল' তেজপ্রধান 'বাষ্পে' রূপান্তরিত হয়। এটিও কিন্তু পরিমাণগত পরিবর্তন। কারণ, জল জলই থাকছে—শুধু অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে, প্রতি একক পরিমাণ আয়তনে অণুর সংখ্যা কমছে।

আবার একটা গাছকে পুড়িয়ে যদি তাপশক্তি নির্গত করা হয়, তখন তরলপ্রধান বস্তু হিসেবে কাঠকয়লা এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ পেলাম। এগুলো সম্পূর্ণ নূতন পদার্থ। এটা গুণগত পরিবর্তন। আবার একটি কুঁড়ি বড় হতে হতে যখন হঠাৎ ফুলে রূপান্তরিত হয়, তখন বলা হয় পরিমাণগত পরিবর্তন হতে হতে গুণগত পরিবর্তন হ'ল।

কোন বস্তু তরলপ্রধান হবে না তেজপ্রধান হবে, স্থির থাকবে না গতিশীল হবে, পরিবর্তনীয় হবে পরিমাণগত নাকি গুণগত পরিবর্তন হবে ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করছে দুই উপাদানের মধ্যবর্তী স্বয়ংক্রিয় কলাকৌশলটি। (এই নিয়মটি পরমাণু পর্যায় থেকে মানব-মিথুন পর্যায় পর্যন্ত খাটে। কিন্তু মানব-বস্তু সমাজে মধ্যবর্তী উপাদান হ'ল সম্মিলিত মানব-চেতনা-যা এখনও স্বয়ংক্রিয় হয় নি।) এই মধ্যস্থ বিনিময়ক পদার্থ আবার দুই উপাদানের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া ঘটাতে ঘটাতে নিজেও পরিবর্তিত হয় কিন্তু কখনও তরলপ্রধান উপাদানে স্থিতিলাভ করে না। কারণ তা হলে কোন বস্তুতেই আভ্যন্তরীণ বা বহিস্থ গতি বজায় থাকবে না, সেক্ষেত্রে সৃষ্টি বা সমন্বয় স্তব্ধ হবে। বিনিময়ক উপাদানটি মূলতঃ একটি ক্রিয়াগত পদ্ধতি হলেও এর তরলপ্রধান উপাদানও আছে। খুব ক্ষুদ্র কণিকার মধ্যে এটিকে সব সময় সীমায় মধ্যে ধরা যায় না। অপেক্ষাকৃত বড় পদার্থ, জীবদেহ বা সমাজ-প্রক্রিয়ার মধ্যে মধ্যস্থ উপাদানটির ভূমিকা খুব পরিষ্কারভাবে ধরা যায়। একটি পরমাণুর ভেতর কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস হ'ল তরলপ্রধান উপাদান, তার চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনগুলো তেজপ্রধান উপাদান এবং মধ্যবর্তী বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র বা ফোটন প্রবাহ হ'ল সেই মধ্যস্থ উপাদান। মানবদেহের মধ্যে অস্থি-মাংসপিণ্ডের হল তরলপ্রধান উপাদান। রক্তসংবহনতন্ত্র এবং শ্বাসতন্ত্র হল তেজপ্রধান উপাদান আর স্নায়ুতন্ত্র হল মধ্যস্থ বিনিময়ক উপাদান। স্নায়ুতন্ত্র ছাড়াও Humoral system এবং Genetic Machinery-ও মধ্যস্থ উপাদান হিসেবে কাজ করে যেগুলো আন্তঃ এবং বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে এবং আন্তঃপ্রকৃতির বিভিন্ন অংগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে পরীরের কাজগুলোকে সার্থিকভাবে পরিচালনা করে। বিনিময়ক পদ্ধতিটি আসলে একতরফের (Genetico-Neuro-Humoric Reflex (R. M)। আবার সমাজ-প্রক্রিয়ার উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রকৃতিক বস্তু হল তরলপ্রধান উপাদান, মিলিত শ্রম হ'ল তেজপ্রধান উপাদান এবং বুদ্ধি বা জ্ঞান হ'ল সেই মধ্যস্থ উপাদান। [শ্রম = শারীরিক এবং মানসিক শ্রম] হিসেব দ্বান্দ্বিকতা অনুযায়ী দ্বান্দ্বীয় তত্ত্বে ছিল Forces of Production-এর সঙ্গে 'Relation of Production-এর দ্বন্দ্ব, এবার হিসেব দ্বান্দ্বিকতা অনুযায়ী তা হয়ে দাঁড়ালো 'Contradiction between two elements of Forces of Production i.e. mass-dominated natural substances and energy-dominated collective human labour power, Relation of Production being the mediating factor.' এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সেই সময় পর্যন্ত আবিষ্কারগুলোর ভিত্তিতেই উক্ত সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল। আইনস্টাইন নিজে তরলতেজ আন্তঃ পরিবর্তনীয়তার কথা বললেও তাঁর রচনায় ব্যবহার 'Matter & Energy' কথাটা ব্যবহার করেছেন (যা এখনও প্রচলিত)। যেন 'Energy' 'Matter'-এর বাইরেকার কোন বিষয়। প্রকৃতপক্ষে এটা ঘটেছে। যাই হোক, কোন সারীভূত একক-দেহের মধ্যে এই মধ্যস্থ কলাকৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই কাজ চালিয়ে যায়, যার ফলে পরমাণুতে নিউক্লীয়াসের চতুষ্পার্শে ইলেকট্রন ক্রমাগত ঘুরেই যাচ্ছে, শরীরে নিজে নিজেই প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো তৈরি হয়ে যাচ্ছে, তদপিও স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলছে, মাতৃ-জঠরে শিশু আপনা-আপনিই বড় হচ্ছে, গাছ অক্সিজেন ছাড়ছে, প্রাণী গ্রহণ করছে, এই স্বয়ংক্রিয়তা-প্রাপ্তির জন্য বস্তুটিকে প্রকৃতিবিজ্ঞানগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সমাজ-প্রক্রিয়া এখনও স্বয়ংক্রিয় হয়নি, এখনও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে আছে। সমাজ-দেহ এখনো পর্যন্ত বস্তুবিবর্তনের সর্বশেষ পর্যায়, সুতরাং সমাজকেও বস্তুপ্রক্রিয়া মেনে চলতে হবে। "The Government of persons is replaced by the administration of things and by the conduct of processes of productions. The state is not 'abolished.' It withers away.....F. Engels." বিবর্তনের অন্যান্য পর্যায়ের মত সমাজেরও বস্তু নিয়মে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-একক জানা প্রয়োজন, তা না হলে স্বয়ংক্রিয় সমাজ-ব্যবস্থাও গড়ে উঠবে না।

সমাজ-একক সম্পর্কে আলোচনার আগে, 'একক' সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যাক। (আলোচনার সুবিধার জন্য খণ্ডিকৃত সংযোজন।)

○ একক' আসে যেসব

—কোন বস্তু বা রাশির নির্দিষ্ট কোন ক্ষুদ্র এবং সুবিধাজনক অংশ (ক্ষুদ্রতম হতে পারে, নাও পারে) যার দ্বারা সমগ্র অংশটি গঠিত হয় বা যার দ্বারা সমগ্র অংশের গঠন, ক্রিয়া বা পরিমান বোঝা যায়, তাকে ঐ বস্তু বা রাশির একক বলে।

একক তাহলে তিনপ্রকার ১। গঠনগত ,২। ক্রিয়াগত ৩। পরিমাণগত।

১। গঠনগত একক (Structural unit) :- কোন বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ, যার দ্বারা বস্তুটি গঠিত হয়, তাকে ঐ বস্তুর গঠনগত একক বলে। ঐ একক্যের মধ্যে বস্তুর সামগ্রিক ধর্ম প্রতিফলিত নাও হতে পারে, যেমন তরলপ্রধান বস্তুর একক 'পরমাণু', পাকা বাড়ির একক একটি ইট, ইত্যাদি।

২। ক্রিয়াগত একক. I— (Functional unit :- কোন বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ, যাতে বস্তুর সমস্ত ধরণের ক্রিয়া (ভৌত / রাসায়নিক / জৈব) পরিলক্ষিত হয়, তাকে ঐ বস্তুর ক্রিয়াগত একক বলে। যেমন-প্রোটন, জীবকোষ। (জীবকোষ আবার জীবদেহের গঠনগত এককও বটে।)

৩। পরিমাণগত একক :—(Quantitative unit) :-কোন রাশির পরিমাপ করতে হলে ঐ রাশিরই কোন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণকে 'প্রমাণ' হিসেবে ধরে সমগ্র রাশিটি ঐ প্রমাণ মাপের কতগুণ তা নির্ণয় করা হয়। উক্ত 'প্রমাণ' মাপকেই ঐ রাশির একক বলে। বিভিন্ন রাশির বিভিন্ন একক আছে আবার একই রাশির ক্ষেত্রেও নানারকম একক আছে। যেমন, সেন্টিমিটার, ফুট, কিলোমিটার, গ্রাম, পাউণ্ড, সেকেণ্ড, মিনিট ইত্যাদি।

উপরোক্ত এককগুলিকেই প্রকৃতি অনুযায়ী আরো কয়েকধরণের এককে ভাগ করা যায়। যেমন—

(ক) স্বয়ংক্রিয় একক :—(Self-acting unit) :- যে একক-দেহের মধ্যে দ্বান্দ্বিক গতিবান প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে থাকে, তাকে স্বয়ংক্রিয় একক বলে। যেমন-ফোটন, নিউক্লীয়াস, পরমাণু, জীবকোষ, জীবদেহ ইত্যাদি। স্বয়ংক্রিয় এককটির গঠন নির্ভর করে তার দ্বান্দ্বিক ক্রিয়ার প্রকৃতি (বা ক্রিয়া) এবং স্থায়িত্ব (অর্থাৎ পরিমাণ) ওপর। যেমন—একটি পরমাণুর ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় নিউক্লীয়াস এবং ইলেকট্রনের মধ্যে (ফোটন-প্রবাহের মাধ্যমে) একটি গুপ্তচে সমধর্মী এবং ভিন্নধর্মী পরমাণুর মধ্যে ক্রমক্রমে সমযোজী বা তড়িৎ-যোজী ইলেকট্রনের মাধ্যমে, একটি জীবকোষে নিউক্লীয়াস এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যে (M-RNA-র মাধ্যমে) একটি জীবদেহে বিভিন্ন তন্ত্রের মধ্যে (রসক্রিয়া) জীবনমিথুনের ক্ষেত্রে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে (প্রজনন ক্রিয়া)। এইভাবে বিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে এককের আয়তন বড় হতে থাকে।

সমাজ-একক গঠনের আলোচনায় এই বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। লক্ষণীয় যে, একটি স্বয়ংক্রিয় এককের মধ্যে তার পূর্ববর্তী স্বয়ংক্রিয় এককটিও কাজ করে যায়, কোনটিরই ক্রিয়া বন্ধ হয় না। (যেমন-জীবদেহে জীবকোষ, জীবকোষে অণু এবং অণুতে পরমাণু স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে যায়।)

(খ) সারীভূত একক :—(Substantiated unit) :-স্বয়ংক্রিয় এককগুলো প্রকৃতিবিজ্ঞান-গতভাবে সিদ্ধ এবং স্থায়ী বলে এগুলোকে সারীভূত একক বলে।

(গ) পরীক্ষামান একক :—(Experimental unit):-একটি সারীভূত একক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঐ এককে 'ভিত্তি' করে বিভিন্ন 'পরিকাঠামোগত' পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। পরীক্ষা চলাকালীন বিভিন্ন একক গঠিত হয়, যাদের পরীক্ষামান একক বলা হয়। এগুলোর সবই স্থায়ীত্বলাভ করে না। একটিই পরবর্তী সারীভূত একক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাকীগুলোর কিছু বিলীন হয়। কিছু অন্তর্বর্তী একক হিসাবে থেকে যায়। যেমন— অ্যামন, মূলক, নিউক্লীক অ্যাসিড, প্রোকোশিওটিক কোষ, পরিবার ইত্যাদি।

(ঘ) অন্তর্বর্তী একক :— (Intermidiate unit) :-একটি সারীভূত একক থেকে অপর সারীভূত একক গঠনের সময় কিছু একক গঠিত হয় যেগুলোর মাধ্যমে পরবর্তী সারীভূত একক গঠনের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত হয়। ঐ সমস্ত এককগুলোকে অন্তর্বর্তী একক বলে। যেমন-পরমাণু ও অণুর মাঝে মূলক। অণু ও কোষের মাঝে-কার্বন ও নাইট্রোজেন ঘটিত 'মধ্যাণু' ইত্যাদি।

সমাজ এককের প্রসঙ্গে আসা যাক।

○ সমাজ-একক কাকে বলে?

—সমাজের যে ক্ষুদ্রতম অংশে সামগ্রিক সমাজের অবস্থিতি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, তাকে সমাজ-একক বলে। সমাজ হল অসংখ্য সমাজ-এককের সমষ্টি। (তুলনীয় জীবদেহ এবং জীবকোষ) অর্থাৎ Society must be conceived of in terms social units (R. M)। প্রতিটি সমাজ-এককের ভিত্তি (base) একই হলেও উপরিকাঠামোগতভাবে (Superstructurally) ভিন্ন হতে পারে। একটি কোষের ভেতরে সমস্ত অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না, কিন্তু বিভিন্ন কোষের গঠন এবং ক্রিয়ার মধ্যে একটা Uniformity আছে। তেমনি সমাজের সমস্ত বৈচিত্র্য একটি সমাজ-কোষের মধ্যে বিদ্যমান থাকলেও সমাজের বিভিন্ন অংশের সমাজ এককগুলির মধ্যে সুসমঞ্জস্য থাকবে। যেমন, পৃথিবীর যেকোন স্থানেই জল-অণুর গঠন H_2O বা একই প্রজাতির সমস্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদের গঠন এবং ক্রিয়া একই রকম।

○ সমাজ এককের মধ্যে আন্তিক ক্রিয়া পদ্ধতিটি কি?

কতগুলি মৌলবী মানুষের মিলিত ইচ্ছাপ্রকাশ, ভাষা ও জ্ঞানের মাধ্যমে (বিনিময়ক উৎপাদন) ভোগের যৌথ ভোগ (ভরপ্রধান) এবং যৌথ উৎপাদনের (ভেজপ্রধান) মধ্যে প্রকৃতিবিজ্ঞানসম্মত আন্তঃক্রিয়া (আত্মাপরিবর্তন)। উৎপাদনের জন্য যে মিলিত শক্তি (ভেজপ্রধান) প্রযুক্ত হয় (Social catabolism), সেটাই ভোগবস্তু (ভরপ্রধান) হয়ে ফিরে এসে মিলিত মানব এবং প্রকৃতির ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে, তাদের সমৃদ্ধ করে, কিছু সঞ্চয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়, যার মাধ্যমে উক্ত সমাজ-এককের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য বা নতুন সমাজ-এক গড়তে কাজে লাগে (তুলনীয় প্রাইমোজেন, স্টার্চ, যৌনকোষ) এবং নতুন উৎপাদনী এবং উদ্ভাবনী শক্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি করে (Social Anabolism)। এই ভর-ভেজের আন্তঃপরিবর্তনমূলক বিষয়টি এবং ভর-ভেজের মোট পরিমাণের অপরিবর্তনীয়তামূলক বিষয়টি একটি সমাজ-এককগোষ্ঠের মধ্যে সংঘটিত হওয়া উচিৎ, যা বর্তমান শ্রম-শোষণমূলক পরিকাঠামোয় সম্ভব হচ্ছে না।

○ একটি পরিবারকে কি সমাজ-একক বলা যাবে?

—না। আমরা দেখেছি বিবর্তনের যে কোন পর্যায়ে এককের দেহরূপ কেমন হবে, তা নির্ভর করবে তার চালিকা শক্তির উপর। সমাজ-পূর্ববর্তী এককটি হ'ল জীব-মিথুন। তার চালিকা-শক্তি হ'ল প্রজনন শক্তি এবং সেই এককের দেহ হ'ল একটি স্ত্রী এবং একটি পুরুষ একসঙ্গে। সমাজ-প্রক্রিয়ায় চালিকা-শক্তি কিন্তু সন্তান উৎপাদন নয়, সামাজিক উৎপাদন। অর্থাৎ প্রকৃতিলব্ধ বস্তুকে ব্যবহার উপযোগী করা বা তা থেকে আরো নতুন নির্জীব (শিল্প) বা সজীব (কৃষি, পশুপালন) বস্তু সৃষ্টি করা। এও অনেকটা সন্তান উৎপাদনের মতই বিষয়। Production is the evolved form of 'Reproduction' (R. M). তাই, 'পরিবার' কখনও সমাজের এক হতে পারে না। কিন্তু এই জলবিভাজী বিষয়টি হল রাষ্ট্রের বিষয়। তাই এখনকার পরিবারগুলোকে রাষ্ট্রের এক বলা যেতে পারে। অর্থাৎ পরিবার হ'ল শোষনের জন্য নির্মিত একটি অপ্রকৃতিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং পারিবারিক প্রথাগুলোও অপ্রকৃতিকভাবে গড়ে উঠেছে। সন্তান-উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল 'প্রজাতিরক্ষা' কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা দাঁড়িয়েছে 'বংশরক্ষায়'। সন্তান উৎপাদনের জন্য স্বামী-স্ত্রী পরিবার গঠন করতেই পারে, কিন্তু তার জন্যে এই নয় তাদের সন্তানকে মানুষ করার দায়িত্ব তাদেরই নিতে হবে বা সেই সন্তান মানুষ হয়ে একমাত্র তাদের পিতামাতাকেই দেখবে। বর্তমানে প্রচলিত এই পদ্ধতির জন্য সব সময়ই একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতার ভাব বজায় থাকে, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা তৈরি হয়, নিজে উন্নত হওয়ার পাশাপাশি অপরকে অবদমনের প্রচেষ্টাও তৈরি হয়। 'আমার ছেলে ফার্স্ট হোক, পাশের বাড়ির ছেলে ফেল করুক'—এই হ'ল এ যুগের মনন। এই মানসিকতাই বাজার-নির্ভর রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি। কিন্তু রাষ্ট্রের সময় বিষয়ই ভারসাম্যরক্ষক নয়। প্রযুক্তির উন্নতি, ব্যক্তিস্বের উৎকর্ষতা, শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদির প্রসারের জন্যেও রাষ্ট্রের বিকাশেরও প্রয়োজনীয়তা ছিল। সুতরাং রাষ্ট্রের সৃষ্টি অপ্রকৃতিক হলেও সমাজ-বিবর্তনের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় নয়। তাই এখনকার পরিবার-গুলোকে 'পরীক্ষামান' একক বলা যায়। 'পরিবার' বিষয়টি মানব-মস্তিষ্কের পরীক্ষালব্ধ বিষয়, অপ্রকৃতিক বিষয় নয় এবং এগুলোও বিবর্তন-প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শোষনেরও উন্নত (!) পন্থা নির্মিত হয়ে চলেছে এবং সেটা যে শুধু শ্রেণীগত শোষণ তাই নয়, প্রতিটি মানুষই এই প্রযুক্তির শিকার হচ্ছে। যে শোষিত হচ্ছে, সে আবার সুযোগ পেলেই অন্যকে শোষণ করছে। শোষণ যে শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবে হচ্ছে তা নয়, মানসিকভাবেও হচ্ছে। শোষিতেরাও একজোট হতে পারছে না। একটা বিচ্ছিন্নতা বোধ তৈরি হচ্ছে, রাষ্ট্রের সুচতুর প্রচার কৌশল, প্রলোভনমূলক নানা পরিকল্পনা মানুষকে নিজের চতুর্দিকে গণ্ডী টানতে বাধ্য করাচ্ছে। তাই সভ্যতা ধ্বংসের মুখে পতিত হচ্ছে।

এই মুহূর্তে বাঁচবার একটিই পথ, সমস্ত কল্যাণকামী মানুষের দ্বারা সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হয়ে সচেতনভাবে একাধিক জ্ঞানবিজ্ঞান-সম্মত 'সমাজ-একক' গঠন এবং তাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন।

○ সমাজ-এককের গঠন-প্রক্রিয়া কেমন হবে?

—প্রাথমিকভাবে ৩০-৪০টি পরিবার মিলে একটি করে সমাজ-একক গঠন করতে পারে। পরিবার সংখ্যা খুব বেশি হলে যৌথ পরিচালনায় সমস্যা হবে, আবার খুব কম হলে সামাজিক ভোগোৎপাদন বিষয়টি ভালোভাবে ধরা পড়বে না। তাই আপাততঃ ঐ সংখ্যাটি ভাবা হয়েছে। ভৌগোলিক পরিবেশ অনুযায়ী পরিবার সংখ্যা এবং আয়তন কম বেশি হতে পারে। সঠিক সংখ্যাটি সমাজ-একক প্রতিষ্ঠিত হলেই নির্ণয় করা সম্ভব হবে। সমাজ-এককের নামকরণ করা হয়েছে 'জনপল্লী'। প্রস্তাবিত জনপল্লীর ব্যবস্থাপনা নিম্নরূপ।

একটি পল্লির মধ্যেই কাছাকাছি অবস্থিত—

১। স্বামী-স্ত্রী ও ছোটশিশুর জন্য আলাদা ঘর, কুটির বা ফ্ল্যাট।

২। বড় ছেলেদের এবং মেয়েদের আলাদা আলাদা হোস্টেল।

৩। বৃদ্ধবৃদ্ধাদের জন্য আলাদা আবাস বা হাসপাতাল সংলগ্ন হবে।

৪। কাজের সময় শিশুদের রক্ষণাবেক্ষনের জন্য শিশু-আবাস বা ক্রেশ।

হাসপাতাল, কমিউনিটি হল, লাইব্রেরী, কারখানা, সাধারণ রান্নাঘর ও খাওয়ার জায়গা, অতিথিশালা, প্রশিক্ষণগৃহ, বিদ্যালয়ভবন, চাষবাসের জমি, খেলার মাঠ, ফুলের বাগান, মাছের জন্য পুকুর, পশুপালনের জন্য ঘেরা জায়গা। (প্রয়োজনে থাকার জন্য তিনচারতলা Housing Complex-এ করা যায়, তাহলে জমি অনেকটা বাঁচানো যাবে।)

○ 'গণপল্লির কার্যরীতি কেমন হবে?

১। মূলনীতি হ'ল যৌথ পরিচালনার মাধ্যমে যৌথ ভোগ এবং উৎপাদন।

২। পরিবার ভিত্তিক উত্তরাধিকার প্রথা থাকবে না, গণপল্লির জমি বিক্রয়যোগ্য হবে না, বসবাসকারীরা সমবেতভাবে ভোগ করবেন।

৩। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্ত হবে না, কিন্তু সে জিনিষ হবে একান্তভাবে ব্যবহার-ভিত্তিক। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি তাঁর জীবদ্দশায় কোন জিনিষের মালিক হবেন। কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁর সন্তানই যে জিনিষটি পাবেন, তার কোন মানে নেই, ব্যবহার করলে পাবেন সন্তুষ্ট যিনি ব্যবহার করবেন তিনিই পাবেন। এমনি করে ব্যবহারভিত্তিক ব্যক্তিগত সম্পত্তি গঠন করার দায়িত্ব সমষ্টিরই থাকবে। এই পদ্ধতিতে সামাজিক নিরাপত্তার এবং প্রতিভা অনুযায়ী ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্খা পূরণের সম্ভাবনা এত বেশি থাকবে যে ছোটখাটো বিষয়ে মনান্তর কমে যাবে।

৪। যৌথ রন্ধনশালা এবং খাবার ঘরে সকলের রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা হবে ; এতে শ্রমঘণ্টা অনেক বাঁচানো যাবে। সকলের মত নিয়ে খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করতে হবে যাতে নানারকম পুষ্টিকর খাবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খাওয়া যায়। এ ছাড়াও শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রস্তুত করার একটি বিকল্প ব্যবস্থা বাবা-মা তাঁদের ঘরেও রেখে দিতে পারেন।

৫। প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী কৃষি, পশুপালন, শিল্পজাত সামগ্রীর উৎপাদন হবে গণপল্লির যৌথ মালিকানায়। নিজেদের ব্যবহারের জিনিষগুলোর সরাসরি গঠন হবে। তার বিনিময়ে প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কিছু শ্রমঘণ্টা দিতে হবে। অক্ষম এবং শিশুদের দায়িত্ব গণপল্লি নেবে। ছাত্রছাত্রীদের সাধারণ পড়াশুনার তাঁকে তাঁকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিছু উৎপাদন করানো যেতে পারে। বাড়তি কাজের জন্য মজুরী দেওয়া হবে যা থেকে নিজের ইচ্ছামত পণ্য ক্রয় করার (সমবায় বা বাইরে থেকে) অধিকার থাকবে। তবে দেখা হবে ব্যক্তিগত ভোগের মান যেন গণপল্লির নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে ব্যাহত না করে। যেমন, লিপস্টিক কেনা যেতে পারে কিন্তু মদ বা হেরোইনের কেনা চলবে না, ইত্যাদি। কোন জিনিষ সকলের জন্য প্রয়োজনীয় মনে হলে সামাজিকভাবেই তার উৎপাদন হবে। ভৌগোলিক কারণে একই জায়গায় সব কিছুর উৎপাদন নাও হতে পারে, বা একটি গণপল্লিতে সব কিছুতেই দক্ষ মানুষ নাও থাকতে পারেন। তাই একটি গণপল্লি কখনও স্বয়ং-সম্পূর্ণ হতে পারে না। যে জিনিষটির উৎপাদন সম্ভব হবে, তা কিছু বেশি করে অপর গণপল্লির সঙ্গে বিনিময় করা যাবে বা গণপল্লির বাইরে বাজারে বিক্রি করে অন্য জিনিষ কিনতে হবে। বিভিন্ন গণপল্লির উৎপাদিত বস্তু বিনিময়ের জন্য মূল্য হিসেবে 'Labour Density' নামে একটি নতুন একক চালু করা হবে। নির্দিষ্ট পরিমাণ বিভিন্ন বস্তু উৎপাদন করতে হলে কতটা শ্রম-ঘণ্টা লাগে, তার ওপর ভিত্তি করে এবং আপেক্ষিকতার জন্য দু'একটি factor গুণভাগ করে এর হিসাব বের হবে। এই মূল্য কখনও খুশিমত ইচ্ছার দ্বারা স্থির করা হবে না। প্রয়োজন হলে বিনিময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ মূল্যব্যবস্থা বা নির্দেশনামা চালু করা যায়। কিন্তু বাইরের বাজারের সঙ্গে বেনাবেচার ক্ষেত্রে লাভ রেখে বিক্রী করতে হবে কারণ সেক্ষেত্রে বেশিদামে জিনিষ কিনতে হবে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পাশাপাশি পুঁজিবাদ ব্যবস্থারও বিকাশ সাধন করতে হবে। কিন্তু জীবন যাত্রার মানের ক্ষেত্রে খুব বেশি তারতম্য থাকবে না। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা যে একটা গরীবী ব্যবস্থা, একথা তাবার কোন অবকাশ নেই। কোন জিনিষ ভোগ বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে গণপল্লির অধিবাসীরা কম যাবেন না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে মূলধনী বা মালিকানার। 'গণপল্লির'-র মধ্যে সর্বজনভোগ্য এবং অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের ভোগোৎপাদনের সমন্বয়ন হবে কিন্তু ব্যক্তিমালিকানার ক্ষেত্রে এবং খুশিমত জিনিষ কেনার জন্য ব্যক্তিগত আয়েরও ব্যবস্থা থাকবে। অন্যান্য সৃষ্টিশীল মানুষের জন্য ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা একটু বেশিই থাকবে। যিনি যে বিষয়ে গবেষণা করতে চান, তার জন্য সমস্ত উপকরণের ব্যবস্থা করা হবে এবং তাঁর গবেষণার ফলকে প্রয়োগ করারও ক্ষেত্রে দেওয়া হবে এবং সেই গবেষণার মাধ্যমে সমষ্টিও উপকৃত হবে। সুতরাং গণপল্লির সুরক্ষা এবং বৈচিত্রের জন্য সমবায়ের পাশাপাশি ব্যক্তিমালিকানারও ভূমিকা থাকবে। বিপরীত ধর্মী পদ্ধতির মধ্যে দ্বান্দ্বিক সুসম্পর্ক তৈরি করা হবে (Non-Antagonistic Contradiction)। কিন্তু পুরো ব্যাপারটিই হবে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে, খাপছাড়াভাবে নয়। ব্যষ্টি-সমষ্টির সার্থক সামঞ্জস্যই একটি গণপল্লিকে টিকিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু গণপল্লির সংখ্যা একটা নির্দিষ্ট মাত্রা (Critical Value) অতিক্রম করলেই পাশাপাশি প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে এবং সবকিছুই গণপল্লি নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে। এভাবেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভাঙবে। আর কিছুতে নয়।

৬। শ্রমবিভাজন :- (ক) মূলতঃ কায়িক শ্রম (Physical labour) (খ) মূলতঃ মানসিক শ্রম (Mental) এবং (গ) পরিচালনার কাজ (Managerial job).

সব চাষীতে ভালো প্রতিটি সবসাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবধরণের কাজের সুযোগ দেওয়া। তাহলে সামগ্রিক কাজ সম্বন্ধে প্রত্যেকের ধারণা থাকার জন্য ভুল বোঝাবুঝি কম হবে। কাজের অভাবে কোন কাজ থেমে থাকবে না এবং কোন ব্যক্তি-বিশেষের হাতে ক্ষমাগত ওপরওয়ালির ভার না থাকার জন্য বিশেষ কোন ক্ষমতা ফলানোর ক্ষেত্র কমে যাবে। 'গণপল্লি' প্রতিষ্ঠানটি খুব বড় নয় বলে, এবং প্রত্যেকের সঙ্গে পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক আন্তরিকতাপূর্ণ হওয়ার জন্য সবাইকে সব কাজে লিপ্ত করা কঠিন হবে না।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা অন্যত্র করা হবে। প্রতিটি বিষয়ই হবে স্বতঃস্ফূর্ত যা প্রতি সন্ধ্যার মিলন-সভায় উৎসারিত হবে।

○ গণপল্লির পরিচালনরীতি কেমন হবে?

প্রতিটি গণপল্লিই একটি করে সার্থক গণতন্ত্রের পীঠস্থান হবে। এর ভিত্তি হবে প্রকৃতিবিজ্ঞান। গণপল্লির সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে গঠিত হবে মোহনসী সভা। সমস্ত বিষয়ই সাধারণ সভায় মতামতের স্থির হবে। সভা-পরিচালনার জন্য একজন সংযোজক থাকবেন। যিনি কোন বিশেষ

ব্যক্তি হবেন না। সাধারণ সভ্যরাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই দায়িত্ব পালন করবেন। তবে এই পর্যায়ে আসার আগে প্রত্যেক গ্রুপ বয়স্ক সমস্যাকে একটীয় বিজ্ঞান আয়ত্ত করে নিতে হবে। এর তাত্ত্বিক বিষয়ে জটিলতা থাকলেও ব্যবহারিক দিকটা খুবই সরল, যা সাধারণ নিরক্ষর ব্যক্তিও বুঝতে পারেন। জগতের যে কোন সত্যই সরল। গণতন্ত্রের মূল বিষয় হ'ল বুদ্ধি-নির্ভর যৌথ পরিচালনা। Representative Democracy আসলে Dictatorship-এরই নামান্তর। যৌথ পরিচালনা করতে গেলে পরস্পরের মধ্যে একেবারে নির্ভেজাল ভাব আদান-প্রদান, কথাবার্তার জটিলতা বর্জন অত্যন্ত জরুরী তাই কিছু বিজ্ঞান-সম্মত আচার আচরণ স্থির করে নেওয়া হবে যেগুলো না হলে যৌথভাবনার বিকাশ হবে না।

যেমন—

পরস্পরের মধ্যে—

১। কথা, শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য রক্ষা করা।

২। প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে যে কোন বিষয়কে সঠিকভাবে উপস্থাপনা করা, কল্পনার আশ্রয় বা রঙচড়ানো বর্জন করা। (এক কথায় 'কোপাল'কে 'কোপাল' বলা।)

৩। তাৎক্ষণিক সুবিধা থেকেও 'গণপল্লির' আদর্শকে গুরুত্বিক গুরুত্ব দেওয়া।

৪। নিজেদের পারিপার্শ্ব যথাযথভাবে পালনে সচেষ্ট থাকা।

৫। নিজেদের ভুলত্রুটি জনসমক্ষে ঘোষণা করা এবং তারজন্য বারবার ক্ষমাপ্রার্থনা করা, অপরের ভুল ত্রুটি নজরে এলেও তা সভায় উল্লেখ করা। নিছক, 'কি মনে করবেন' ভেবে বসে থাকা উচিৎ নয়। অহমিকা ত্যাগ করে, ভুল ধরিয়ে দেওয়াটাকে গঠনমূলক বলে গ্রহণ করতে হবে।

৬। যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছে বা খেয়াল থেকেও গুরুত্ব পাবে বিষয়টি কি কি শর্ত দাবী করে। সেই শর্তগুলোকে নিয়েই আলোচনা হবে। সেই হিসেবে বিভিন্ন প্রস্তাব পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে প্রতিটি সদস্যই দিতে পারেন, প্রতিটি প্রস্তাবেরই সম্ভাব্য Positive এবং Negative দিক ভেবে নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে হবে। প্রয়োজন হলে সামনে কোন বোর্ডে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো লেখা হবে। খুব বেশি মতান্তর দেখা দিলে ভোটাভুটি পর্যন্ত সমর্থিত হওয়া গেছে তাই ধরে এগোতে হবে।

৭। বিভিন্ন বিষয়গুলোকে খুব সচেতনভাবে গবেষণার মত প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে সময় সুযোগ অনুযায়ী। মতান্তরের ক্ষেত্রেও সর্বজনগ্রাহ্য কিছু প্রক্রিয়া আগেই স্থির করে নিতে হবে যার ফলে মনান্তর হওয়ার সুযোগ থাকবে না।

কিন্তু বিভিন্ন গণপল্লির সংযোগমূলক কোন কমিটিতে প্রতি গণপল্লি থেকে একজন বা দু'জন প্রতিনিধি নিতেই হবে। উক্ত সংযোগমূলক কমিটির নামকরণ করা হয়েছে 'মেহনতী পরিষদ' যা নূতন গণপল্লি স্থাপনেও অগ্রণী ভূমিকা নেবে। মেহনতী পরিষদে আলোচ্য বিষয়গুলো সদস্যদের নিজ নিজ গণপল্লিতে আলোচিত সমস্যাগুলি নিয়েই হবে এবং মেহনতী সভার অনুমোদিত হয়ে তা পরবর্তী মেহনতী পরিষদের সভায় অনুমোদিত হবে। সমস্ত প্রক্রিয়া খুব দ্রুত সেরে নেওয়া যায়। এইভাবে বৃহত্তর ক্ষেত্রেও গণপল্লির প্রতিটি সদস্যের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের শরীরে সিদ্ধান্ত নেয় মস্তিষ্ক, কিন্তু সেটা গড়ে ওঠে সামগ্রিক স্নায়ুতন্ত্রের যথার্থ সমন্বয়ের ওপর। একটি অংশে ভুল হলেই মস্তিষ্ক সঠিক নির্দেশ দিতে পারে না। কোন বিষয়ে দ্রুত সাফল্য হলেই যে ভালো, তার কোন মানে নেই যদি পদ্ধতি সঠিক না হয়। পদ্ধতি ঠিক থাকলে বিলম্বিত সাফল্যেরও একটা সুদূরপ্রসারী ফল আছে। কোন হঠকারিতা পদ্ধতি যতই লোভনীয় মনে হোক না কেন, কালের প্রভাবে তা অসার বলে প্রতিপন্ন হয়। রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোতে ব্যক্তি-সর্বস্বতা এবং পারিবারিক বিচ্ছিন্নতার যুগে সার্থক গণতন্ত্রচর্চা আদৌ সম্ভব নয়। তার জন্য 'গণপল্লিই' আদর্শ স্থান।

○ গণপল্লি কিভাবে গঠন করা সম্ভব?

প্রথম গণপল্লিটি হবে পথনির্দেশক। তাই এটি যথা সম্ভব নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন। শহর থেকে দূরে ফাঁকা জায়গায় ৩০-৪০টি ভূমিহীন পরিবার বসিয়ে এটা শুরু করতে হবে। বিভিন্ন পরিবার বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আনা উচিৎ এবং বিভিন্ন ধর্মমতের মানুষ গণপল্লির সদস্য হবেন। তাহলে প্রথম থেকেই প্রাদেশিকতা এবং ধর্মান্ধতা দূর হবে। সম্পূর্ণ নতুন বসতি হলে নতুন নিয়ম চালু করা সহজ হবে। প্রচলিত গ্রামে পুরনো রীতিকে পালটানো সহজ নয়। তবে একবার গণপল্লির উপযোগিতা দেখা গেলে পরবর্তী ধাপে অন্যান্য জনপদেও তা চালু করা যায়। যাই হোক বিভিন্ন প্রদেশের বৈচিত্র্য গ্রহণ করে একটি 'ভারতবর্ষীয়' রীতি গড়ে উঠতে পারে প্রথম গণপল্লিটিতে। কোন একটি বা একাধিক প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানগুলি সরকার উদ্যোগগুলকভাবে প্রথম গণপল্লির সৃষ্টি করবে। প্রথমে ৩-৪ খানা পরিবারের জন্য ঘরবাড়ি জমি তৈরি করা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, জলাধারটির ব্যবস্থা করা, কৃষি ও শিল্পের জন্য টাকা খরচ হবে। বাকি পরিবারগুলো পর্যায়ক্রমে আসবে। ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সব পরিবারগুলো এসে যাবে। প্রথমিকভাবে কৃষি এবং শিল্পের ব্যবস্থাপনা সমস্ত সদস্যকে কেন্দ্র করেই রচিত হবে। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি মাথায় রেখেই প্রাথমিক কাজগুলো পরিচালিত হবে। প্রথম ৬-৮ মাস সকলের ভরণ পোষণের ভার সংস্থাকেই নিতে হবে। তারপর থেকে নিজস্ব গতিতে গণপল্লি চলতে পারবে বলে আশা করা যায়। ইতিমধ্যে অন্য সংস্থা এইভাবে তাঁকা জায়গায় একাধিক গণপল্লি তৈরি শুরু করলে বিভিন্ন গণপল্লির মধ্যে প্রয়োজনমত পণ্যদ্রব্যের, বস্তু বা অর্থও বিনিময় করা সম্ভব।

কিছু আদর্শ গণপল্লি স্থাপিত হলে এর প্রভাবে অধুনা প্রচলিত আশ্রমগুলো বা আবাসিত বিদ্যালয়-গুলোও গণপল্লিতে রূপান্তরিত হবে। তারপর কোন বসতিতেও সমবায় গঠন করে ঘরবাড়ির ব্যবস্থানের সামান্য ব্যবধান রেখেও এই পদ্ধতি চলবে। এইভাবে গণপল্লি বা সমাজ একের পর এক পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়তে পারে। গণপল্লি-পদ্ধতি চালু হলে দু'দেশের সীমারেখা উঠে যাবে এবং রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজন থাকবে না। পরে রাস্তা, নাবারি এবং ভারিশিল্প, বিদ্যুৎ, ক্রয়শক্তি, পরিবহন ইত্যাদি ব্যবস্থা ভিন্নিয়ও গণপল্লি সমূহের (অনেকগুলি গণপল্লি নিয়ে গঠিত Cluster of social units বা একাধিক cluster নিয়ে গঠিত Federation of social units) আয়ত্বে আসবে। সেক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণের প্রয়োজন হবে, কিন্তু সেই প্রতিনিধিকে গণপল্লির মেহনতী সভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত মেহনতী সভার সঙ্গে সংযোগ রেখে চলতে হবে। মেহনতী সভার সদস্যরা যখন খুশি প্রতিনিধি পরিবর্তন করতে পারবেন। তারজন্য পাঁচবছর অপেক্ষা করতে হবে না। তবে যতদিন না পর্যন্ত যথেষ্ট সংখ্যক গণপল্লি গঠিত হচ্ছে, ততদিন রাষ্ট্রব্যবস্থা পুরোপুরি নির্মূল করা যাবে না। কিন্তু গণপল্লিগুলো রাষ্ট্রীয় প্রভাব থেকে অনেকাংশে মুক্ত থাকতে পারবে। 'গণপল্লির' বাইরে কোন জিনিষের দাম বেশি হয়ে গেলেও গণপল্লির ভেতরে সদস্যদের জন্য দাম কম থাকবে, একটা স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে, প্রতিটি জিনিষই ভেজাল মুক্ত হবে। এই পার্থক্যের জন্য গণপল্লি ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এবং ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলবে।

এখন আমরা দেখবো, একটি আদর্শ গণপল্লি পদ্ধতি কিভাবে আজকে 'খুচরো প্রশ্নের' সমাধান করে—

১। বেকারত্ব ঃ— এই পদ্ধতিতে একজনও বেকার থাকবেন না, প্রত্যেকেই তাঁর সামর্থ্যমত কোন না কোন কাজে লিপ্ত থাকবেন।

২। বিচ্ছিন্নতা ঃ— গণপল্লির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা উঠে যাবে, পরস্পরের মধ্যে সার্বিক পরিপূরকতার সম্পর্ক গড়ে উঠবে। কর্মবিভাজনের সঙ্গে সামাজিক সম্মানের কোন সম্পর্ক থাকবে না। প্রত্যেকেই সমান সামাজিক মর্যাদা পাবেন।

। নারী নির্যাতন ঃ— গণপল্লি নারীমুক্তির এক আদর্শ স্থান। হেঁসেলমুক্তির সাথে সাথে নারী তাঁর নিজস্ব পারিবারিক সত্তা ছাড়াও এক সামাজিক সত্তা অর্জন করবেন বারফলে সন্তান-হীনাদেরও কোন অতৃপ্তি থাকবে না। গণপল্লির সমস্ত শিশুকে নিজের সন্তানরূপে দেখার সুযোগ তৈরি হবে। সামাজিক নিরাপত্তা থাকার জন্য পণপ্রথারও কোন প্রয়োজন হবে না। নারীরা ভোগের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে পূর্ণ সামাজিক মর্যাদা পাবেন।

। প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা ঃ— এগুলো খুব দ্রুত বিদায় নেবে। কৃষ্টিসংস্কৃতি এবং ঐক্যই মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

৫। মানসিক রোগ ঃ— নিরাপত্তাহীনতা, সন্তানের জন্য উদ্বেগ, আর্থিক অনটন, কর্মের অভাব, বাসস্থান সমস্যা ইত্যাদি হাজার মানসিক চাপ গণপল্লিতে থাকবে না। সকলেই মানুষ হিসেবে মূল্য পাবেন। তাই মানসিক রোগ গণপল্লির কারুর থাকবে না বললেই চলে।

। চিকিৎসাবিভ্রাট ঃ— নিয়মিত শরীরচর্চা ধ্যান ও যোগাভ্যাস, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যসম্মত আচার আচরণ সকলকে নিরোগ রাখতে সাহায্য করবে, এ ছাড়াও এলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, আকুপ্রেসার, রাজযোগ, আয়ুর্বেদ এবং অন্যান্য পদ্ধতির সমন্বয়ে এক সার্বিক আরোগ্য বিজ্ঞান (Unified therapeutics) গড়ে উঠবে যার প্রয়োগে দ্রুত আরোগ্যের পথ সুগম হবে। কারুর অসুস্থতাকে সামাজিক ক্ষতি হিসেবে দেখা হবে এবং তাঁকে সুস্থ করার দায়িত্ব গণপল্লিই নেবে।

৭। নেশায় আসক্তি ঃ— প্রতিদিন পারস্পরিক মেলামেশা, খোঁজখবর, কাজের সুযোগ, কম মানসিক চাপের জন্য নেশার আসক্তি কম থাকতে পারে।

৮। আইনশৃঙ্খলা সমস্যা ঃ— পরস্পরের মধ্যে বিবাদের ক্ষেত্রেই সংকুচিত হয়ে যাবে। যে কোন ধরনের ছোটখাটো সমস্যা মেহনতী সভাতেই মিটিয়ে ফেলা যাবে।

৯। জনসংখ্যাবৃদ্ধি ঃ— গণপল্লি হল প্রকৃতিক জননিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্র। দেখা গেছে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, পুষ্টিকর খাদ্যের সঙ্গে সন্তান সংখ্যার সম্পর্ক বিপরীত। (অন্য জননিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ না করলেও।)

১০। অবৈধ সন্তান ঃ— যেহেতু সব সন্তানই সমাজের, সুতরাং অবৈধ সন্তান বলে কোন কথা থাকবে না।

১১। বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ ঃ— মেহনতীসভাকে জানিয়ে যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে বিয়ে করতে পারে এবং প্রয়োজনে বিয়ে ভাঙতেও পারে, এজন্য কোন জটিল পদ্ধতি থাকবে না। বিয়ের সাথে সাথে দম্পতির জন্য ঘর তৈরি করা বা চালু ঘর ব্যবস্থার ইত্যাদির বিষয়ে সভার ভূমিকা থাকে, তাই মতামতের প্রশ্নটি জড়িয়ে থাকে। গণপল্লি আবার পুরোন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতেও পারে। সামাজিক উৎপাদন এবং সম্পর্ক গণপল্লিতে গুরুত্ব পাওয়ার জন্য সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিচার কমে যাবে। প্রত্যেকের আচার আচরণের ওপর একটি প্রচ্ছন্ন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থাকবে যার ফলে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ স্পষ্টে মনে হয়, তাটা থাকবে না। বরং বর্তমান সমাজব্যবস্থার নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি আকর্ষণ অধিকতর তীব্র। বিবরণগুলোতে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় বলে সব সময় জানা যায় না, কিন্তু ভূক্তভোগীরা সবাই জানেন।

১২। পরিবেশ দূষণ ঃ— গণপল্লি যেহেতু একটি সুপরিকল্পিত এবং সুসংহত প্রতিষ্ঠান, সুতরাং পরিবেশ দূষণ-মুক্তির জন্য যেকোন ধরণের পদক্ষেপ নিতে কোন অসুবিধা হবে না। বর্তমানে ভূমির ব্যক্তি মালিকানা অনেকক্ষেত্রে কর্মী পদার্থ নিষ্কাশনের বৈরী হয়ে দাঁড়ায়। সেই সম্ভাবনা এখানে থাকবে না।

১৩। শিক্ষা সমস্যা ঃ— গণপল্লির আদর্শ অনুযায়ী বিজ্ঞানসম্মত এবং বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা নতুন করে তৈরি করা হবে। অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে।

১৪। সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ঃ— প্রতিসন্ধ্যার মিলনসভা সংস্কৃতি চর্চার ধারাটি পালটে দেবে।

১৫। শিশু-মানসিক প্রশ্ন, পরিচালকমণ্ডলী ঃ— এই ধরনের কোন বিষয় গণপল্লিতে থাকবে না। অভিভাবকদের পুরো দায়িত্ব গণপল্লিই নেবে।

—এই ধরনের নানা সমস্যা গণপল্লি পদ্ধতিতে এক কোপে কাটা যাবে, তারফলে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলাদা করে ভাবার কোন প্রয়োজন হবে না।

○ গণপল্লি কারা গঠন করবে? ঃ—

কিছু সচেতন মানুষ একযোগে গণপল্লি গঠন করতে পারেন। কোন রেজিস্ট্রীকৃত বা অরেজিস্ট্রীকৃত সংস্থা অথবা কোন N. G. O কিছু জমির ব্যবস্থা করতে পারলে গণপল্লি তৈরি করতে পারে। কোন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় রাজনৈতিক দল বা সংবাদপত্র অফিসও এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলোর জানা থাকা প্রয়োজন একমাত্র রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলেই সবকিছুর সমাধান হয়না। গণপল্লি গঠন করার মাধ্যমেও মানুষের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা যায়। এর জন্য কোন কুটিল এবং জটিল পথের প্রয়োজন হয় না বা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামেরও প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন শুধু শুভবোধের। সর্বোপরি সরকারী ব্যবস্থাপনাতেও গণপল্লি গঠন করা সম্ভব, যেমন, ভূমিসংস্কার পদ্ধতির রদবদল ঘটিয়ে, অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভূমি কন্টনের বদলে গণপল্লি গঠন করে তাতে একসঙ্গে একাধিক পরিবারের পুনর্বাসন করে, বা গবেষণা-মূলকভাবে প্রতি পঞ্চায়েত এলাকায় 'Ganapalli Directorate' গঠন করে সরকারীভাবেই গণপল্লি গঠন করে। (প্রকল্পের বিবরণ তৈরি আছে।)

○ গণপল্লি সৃষ্টিতে বাধা কোথায় ? ঃ—

বিচ্ছিন্নতাবোধ, মূল্যবোধের সমস্যা বা জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে দোদুল্যমানতাই প্রধান বাধা। সামাজিক পরিস্থিতি বা শ্রেণী-বিদেশী এগুলি শক্তি কিছুই নয়। সমস্যা নিজের মনে, তাই মানসিক বিপ্লবের প্রয়োজন আগে যা না হলে সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। এই আত্মিক পুনর্গঠনকে যদি Spiritual Development বলা যায়, ক্ষতি কি?

। বিশদ বিবরণের জন্য ডঃ সুধীন্দ্রনাথ মাইতি, সংযোজক, 'ইন্সটিটিউট অফ সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট থ্রু ইউনিট্যাল সায়েন্স অর ডায়ালেকটিক্স, পোঃ-সাহাগঞ্জ, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১০৪। যা এই প্রবন্ধের লেখক ডাঃ কল্যাণ আচার্য ৯'পাড়া, পোঃ-হাতিয়াড়া সুলিয়া-৭০০ ০৫৯, ফোন-৫৭১-০৬৭০ তে যোগাযোগ করা যাবে।]

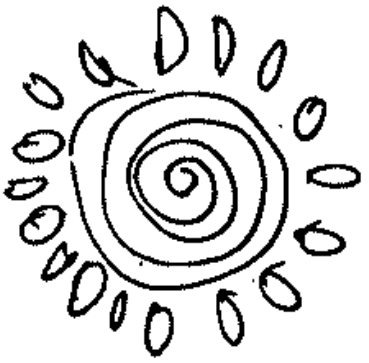

বাল্মীকি রামায়ণে 'বানর'

ম ণি রা য়

[বাল্মীকি রামায়ণের শ্রী হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কৃত অনুবাদ 'ভারবী প্রাচীন সাহিত্য) এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে।]

সমস্ত ভারতবর্ষে, বাংলা দেশ, ইন্দোনেশিয়া, বিশেষ করে বালী, কম্বোডিয়া এবং থাইল্যাণ্ডে 'রামায়ণ' এক বহু পরিচিত গ্রন্থ। রামায়ণের গল্প বহুজন বন্দিত। বাল্মীকি কৃত রামায়ণই সমস্ত-গল্প-গান-নৃত্য ইত্যাদির মূলে। হিন্দীতে তুলসীদাস, বঙ্গদেশে কৃত্তিবাস, তামিল ভাষায় কম্বন, তেলেগুতে রঙ্গনাথ, কাশ্মীরিতে দিবাকর ভট্ট কৃত রামায়ণ বিশেষ আদৃত। ওড়িয়া, অসম, নেপালী ভাষাতেও রামায়ণ আছে। আধ্যাত্মিক, অদ্ভুত, দুরন্ত, মোল্লা রামায়ণের কথাও শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে রামায়ণই কেউ পাঠ করবেন, তাতে দেখতে পাবেন, সীতা উদ্ধার কার্যে যারা প্রত্যক্ষভাবে রামকে সাহায্য করেছিলেন তারা 'বানর'। অর্থাৎ পশু মাত্র। অথচ ওটাকে পশুশ্রেণীর কোন জীব ছিল না, তারা ছিল আমাদেরই মত সাধারণ মানুষ, তাই এ ক্ষুদ্র নিবন্ধের বক্তব্য।

সীতা হরণের পর রাম দুই পাখি জটায়ু ও সম্পাতি, বহু বানর, এক ভল্লুক (জাম্বুবান) এবং অসংখ্য কাঠবেড়ালীর সঙ্গ লাভ করেন। তাঁরা সকলেই রামকে সীতাঅন্বেষণে অথবা পুনরুদ্ধারে সাহায্য করেন। তাঁরা সবাই ছিলেন মানুষ ; পাখি, বানর, ভল্লুক ও কাঠবেড়ালী ছিল তাঁদের টোটেম (Totem)।

এই আলোচনাতে আলোচ্য উদাহরণগুলি আমরা বাল্মীকি রচিত রামায়ণে সীমাবদ্ধ রাখব। বানর শ্রেষ্ঠ হনুমান কে নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গে রামলক্ষ্মণকে ঋষ্যমূক পর্বতের নিকটবর্তী হতে দেখে, এরা বালী প্রেরিত গুপ্তচর ভেবে সুগ্রীব অত্যন্ত শঙ্কিত হলেন। সুগ্রীবকে প্রবোধ দিয়ে হনুমান বললেন, "বীর তুমি ভীত হইওনা, ইহা ঋষ্যমূক পর্বত, এখানে বালী হইতে কোনরূপ ভয়-সম্ভাবনা নাই।... সুতরাং তুমি কেন এত ভীত হইয়াছ বুঝিতেছিনা। আশ্চর্য, তোমার বানরত্ব সুস্পষ্টই প্রকাশ হইতেছে।

যেখ নির্বোধ রাজা কখনই লোক শাসন করিতে পারেন না। তারপর সুগ্রীবের অনুরোধে হনুমান বানর রূপ পরিহার পূর্বক ভিক্ষুরূপ ধারণ করিলেন ; বিনীতের ন্যায় উহাদের সন্নিহিত হইয়া পূজা ও স্তুতিবাদ পূর্বক মধুর ও কোমল বাক্যে কহিতে লাগিলেন। স্বাভাবিক এখানে হনুমানের

বক্তব্য দেওয়া হল না। কিন্তু উত্তরে রাম কী বলেন তা বিশেষভাবে অনুধাবন যোগ্য। ঃ—অনন্তর শ্রীমান রাম হনুমানের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুলকিত মনে পার্শ্বস্থ ভ্রাতা লক্ষ্মণ কে কহিলেন, বৎস, আমি কপিরাজ সুগ্রীবের অন্বেষণ করিতেছিলাম, এক্ষণে তাঁহারই এই মন্ত্রী আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই বানব বীর ও বক্তা, তুমি সস্নেহে মধুর বাক্যে ইঁহার সহিত আলাপ কর। ইনি যেরূপ কহিলেন, ঋক্, যজু ও সামবেদে [অনার্য সংস্কৃতি পুষ্ট চতুর্থ বেদ-অথর্ব বা অথর্বাদি রস গুথনও উদ্ভূত হয়নি] যাহার প্রবেশ নাই, তিনি এরূপ বলিতে পারেন না। ইনি অনেক বার সমগ্র ব্যাকরণ শুনিয়া থাকিবেন। বেদ, বিস্তর কথা কহিলেন, কিন্তু একটিও অপশব্দ ইঁহার ওষ্ঠ হইতে নির্গত হয় নাই। ইঁহার কথাগুলি কেমন সুস্পষ্ট সরল ও মধুর, উহা বক্ষ, কণ্ঠ তালু হইতে মধ্যম স্বরে কেমন সুশোভিত নিঃসৃত হইল, যে পদ অগ্রে প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক ইহাতে তাহা উপেক্ষিত হয় নাই এবং ইহা প্রত্যেক পদের অর্থ হৃদ্বোধ করাইয়া বিষয়জ্ঞানে সমর্থ করিল।.....ফলতঃ এতাদৃশ গুণবান লোক যাঁহার উত্তর সাধে, তাঁহার সকল কার্যই কেবল ইহার বাক্যগুণে সফল হইয়া থাকে।"

ভূয়োদর্শী রাম হনুমান সম্বন্ধে যে সব কথা বললেন, তা শুনে কি মনে হয় যে হনুমান সামান্য শাখামৃগ অথবা তিনি পরম পন্ডিত বুদ্ধিমান, অসাধারণ গুণ সম্পন্ন এক মনুষ্য সন্তান।

হনুমান যখন বুঝলেন এঁদের উপস্থিতিতে রাজ্যচ্যুত সুগ্রীবের আবার রাজ্যলাভের এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়েছে ; তখন তিনি আগন্তুকদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। পরিচয় পাওয়ার পর পুলকিত হয়ে বললেন, "তোমরা বুদ্ধিমান, শাস্ত্রজ্ঞভাব ও জিতেন্দ্রিয়.....। সুগ্রীব বানর গণকে লইয়া সীতার অন্বেষণ কার্যে তোমাদের সাহায্য করিবেন।" অনন্তর বিচক্ষণ হনুমান রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া সুগ্রীবের নিকট গমন করিতে স্বীকার করিয়া...তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পরে আমরা জানতে পারি হনুমান ছিলেন সুগ্রীবের প্রধান মন্ত্রী। এক বানর যখনও ভিক্ষুরূপ ধারণ করতে পারে না, কিন্তু একজন মানুষ ভিক্ষু অথবা বানর—দুই রূপই ধরতে পারে। মধ্য প্রদেশের কিছু আদিবাসী যাদের টোটেম গরু তারা এখনও শ্রাদ্ধায় শিং মিত্রে উৎসবে নাচ গান করেন। সম্ভবত বানর যাদের টোটেম তাঁরা বিশেষ সময়ে সেজ পরে নিতেন এবং হয়তো বানরের মুখোশও পরতেন।

বালী ছিলেন অসাধারণ বীর ও পন্ডিত। অন্যায়ভাবে রামের শরাঘাতে পতিত বালী রামকে বলেছিলেন, "তুমি আমার বিনাপরাধে বিনাশ করিয়া সাধুগণের মধ্যে কি বলিবে। রাজ হন্তা, ব্রহ্মঘাতক, গোঘ্ন, চৌর, লোকনাশক, নাস্তিক পরিবেত্তা, খল, কদর্য, মিথ্যা ও শুল্কদায় পাপী—ইহারা নরকস্থ হইয়া থাকে। আমি বানরগণের রাজা, সুতরাং আমাকে বধ করাতে তোমায় অবশ্যই পাপ স্পর্শিবে। এসব কথা কি কোন বিশ্বস্থিত কবি কোন পশুর মুখে শুনে দিতে পারেন। বালী তারপর রামকে ধূর্ত শঠ ও ক্ষুদ্র (mean) বলে তিরস্কার করলেন। রাম তাঁহার 'ধর্মার্থ পূর্ণ বিনীত হিতকর ও কঠোর বাক্যে তিরস্কৃত হইয়া' যে সব কথা বললেন তাতে রয়েছে বালী ধর্ম ভ্রষ্ট ও স্বেচ্ছাচারী। 'তুমি সনাতন ধর্ম উল্লঙ্ঘন পূর্বক ভ্রাতৃজায়া রুমাকে গ্রহন করিয়াছ ; সুগ্রীব জীবিত আছেন ইহার পত্নী রুমা শাস্ত্রানুসারে তোমার পুত্রবধূ, তাঁহাকে অধিকার করিয়া তোমার পাপ জন্মিয়াছে। তুমি ধর্মভ্রষ্ট ও স্বেচ্ছাচারী, এই জন্যই আমি তোমাকে দন্ড প্রদান করিলাম। যে ব্যক্তি লোক বিরুদ্ধ ও লোক মর্যাদার অতীত, বধদন্ড ব্যতীত তাহার অন্য কোনরূপ নিগ্রহ দেখিতে পাইনা। আমি সম্বৎসীয়, ক্ষত্রিয়, কিরূপে তোমার পাপ উপেক্ষা করতে পারি? ইত্যাদি।

এখানে রাম বা বালীর দোষগুণ বিচার্য নয়। কিন্তু পরিষ্কার বোঝা গেল বালী ছিলেন সনাতন (হিন্দু) ধর্মের লোক। কোন জন্মেই পশু নন। "মনু সংহিতায়ছেন, মনুষ্যেরা পাপাচরণ পূর্বক রাজদন্ড ভোগ করিলে নীতপাপ হয় এবং পুণ্যশীল সাধুর ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। যাঁর সঙ্গে ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য, দন্ডবিধি এবং মনুশ্লোক নিয়ে রাম আলোচনা করেন, তিনি যে পশু নহেন, বরঞ্চ একজন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান মানুষ-এ বিষয়ে পাঠকের কোন সন্দেহ থাকতে পারে না, পশু পাপ করে না। পাপের জন্য পশু ভোগ করে না। অতএব স্বর্গ বা নরকে যাওয়ার প্রশ্নও থাকে না। তার সঙ্গে এ নিয়ে কোন তর্কও চলতে পারে না। তাই তর্কচ্ছলে রাম নিজদোষ খন্ডনের জন্য জানালেন, "আমি ভূল ধর্ম পালন করিলাম। কিন্তু তুমি ধর্ম না বুঝিয়া কেবল ক্রোধ ভরে আমার অবমাননা করিতেছ"।

বালীর মৃত্যুতে তার স্ত্রী শোক বিহ্বলা তারা সতী হতে চেয়েছিলেন। তখন তারা তর্কশোকে নিতান্ত কাতরা হইয়া কহিলেন,. নাথ, তুমি আমার সুহৃৎ, পতি ও গুরুতুই ছিল। যে নারী পতিহীনা সে পুত্রবতী বা ধনধান্যে সুসমৃদ্ধ হইলেও পন্ডিতেরা তাহাকে বিধবা বলিয়া থাকেন। এক্ষণে এই মৃত বীরের সহমরণই আমার শ্রেয় বোধ হইতেছে"। পরে রামের প্রবোধ বাক্যে তিনি শোক তাপ পরিত্যাগ করেন। বালীর মৃত্যুর পর সুগ্রীব রামকে বলেছিলেন, রাজন্, তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হইল। আমি রাজ্য পাইলাম এবং বালী বিনষ্ট হইলেন। কিন্তু আজ এই হতভাগ্যের মন ভোগে একান্তই উদাস।

স্বামীর মৃত্যুতে পত্নীর সহমরণের ইচ্ছা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুতে কনিষ্ঠের এই উদাসী মন, আদিকবির সৃষ্ট এ নিপুন সমাজচিত্র, মনুষ্য সমাজেরই বটে পশু সমাজের নয়।

তারপর অঙ্গদ সুগ্রীবের সাহায্যে সজল নয়নে পিতাকে চিতার উপর শয়ন করাইলেন এবং বিধানানুসারে অগ্নি প্রদান করিয়া ব্যাকুলমনে ঐ সুদূর প্রসারিত মহাবীরকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বানরগন বিধি পূর্বক বালীর অগ্নি সংস্কার করিয়া পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতীতে তর্পনার্থ গমন করিল এবং অঙ্গদকে অগ্রে রাখিয়া সুগ্রীবও তারার সহিত তর্পন করিতে লাগিল। এইরূপে মহাবল রাম সুগ্রীবের ন্যায় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বালীর অগ্নিসংস্কার প্রভৃতি সমস্ত প্রেতকার্য সমাপন করাইলেন।

ধর্ম বুদ্ধি সম্পন্ন রামের নেতৃত্বে যে অগ্নি সংস্কার ও সমস্ত প্রেতকার্য সম্পন্ন হল তা আর্য সংস্কার জন্য এক সমাজের—যে সমাজ তাদের টোটেম ছাড়তে পারে নি কিন্তু আগন্তুক সমাজের সংস্কারগুলি ধীরে ধীরে গ্রহণ করছে। যে সমাজে তৃণ প্রেক্ত মনুসংহিতা বা মানবধর্ম প্রচলিত ছিল। এবং সম্ভবত গৃহ্যসূত্র নির্দেশিত দশ সংস্কারও মানা হত।

বাল্মীকি রামায়ণে আমরা বার বার এই 'বানর' দের দুই রূপ দেখতে পাই। মনুষ্যরূপী এবং বানর রূপী। যেমন, জানকী উদ্ধারের পর সবান্ধব রাম যখন অযোধ্যায় ফিরে এলেন। তখন 'মনুষ্যরূপী বানররা পুলকিত মনে সুগ্রীবকে কুশল জিজ্ঞাসা করিল। অর্থাৎ অযোধ্যাতেও তাদের অনেক লোক ছিল এবং সেখানে বানররূপ ধারণ করবার বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না। রাম বনবাস অন্তে জটামুট মুণ্ডন করেন। 'ইন্দ্রের ন্যায় সুকান্তি সুগ্রীব ও হনুমান কৃতস্নান হইয়া রুচির বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট কুণ্ডল ধারণ পূর্বক চলিলেন। সুগ্রীবের পত্নীগণও সীতা অযোধ্যা দর্শনে সুবেশে যাত্রা করিলেন।' অন্যত্র 'বানর গণ মনুষ্য মূর্তিতে নানারূপ আভরণ ধারণ পূর্বক বৃষ্টিপৃষ্ঠে উঠিয়াছে'।

রামের রাজ্যাভিষেকের পর রাম সুগ্রীবকে সূর্যরশ্মিবৎ উজ্জ্বল স্বর্ণহার, অঙ্গদকে বৈদূর্যখচিত জ্যোৎস্না নির্মল দুই অঙ্গদ দান করেন। জানকী রামের দেওয়া মনি-মন্ডিত জ্যোৎস্না ধবল মুক্তাহার হনুমানকে দেন। আশ্চর্যের সকলেই স্বীকার করেছেন মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম ও বুদ্ধিমতী জানকী নিতান্ত বানরের গলায় মুক্তার হার দেন নি। গুণগ্রাহিতার তারা এই সমস্ত অলঙ্কার উপহার দিয়েছিলেন। অরণ্য অঞ্চলে আদিবাসী, অর্ধসভ্যতার সংস্পর্শে সংস্কৃত ভাষা-আর্য, মনু এবং পুণ্যসূত্র অনুপ্রাণিত এক মানব সমাজকে কোন জন্মেই পশুজগতী তুল্য করা যায় না ; তাঁরা ছিলেন আমাদের মতই মানুষ।

গভীর ঘুমের মাঝে

মনোরঞ্জন পুরকাইত

শ্যামলী বৌদিকে বলেছিলাম
তার খোঁজ রেখো সকাল সাঁঝে
সে কেমন থাকে—চিঠি লিখো মাঝে মাঝে
খানিক অবসর পেলে সংসার কাজে।

জানি না, কেমন আছে মাতলা
বহুদিন বৌদি লেখেনি চিঠি
জানি অভাবের সংসারে লেগে আছে
অসুখ হেতুহীন খিটিমিটি,

দিন পোড়ে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়
রাত চলে যায় বিনিদ্রায় মধুরে
সেও আসে জোয়ার ভাঁটায়
প্রাত্যহিকি লেখা হয় ধুসোট পাতার অন্তরে।

চিঠি আসে না, শ্যামলী বৌদির মুখ
ঢেউ-এ ঢেউ-এ ভেঙ্গে হয় খানখান
অকথিত থেকে যায় গেরুয়া বেলার গান
রোদ ছায়ায় সুরে সুরে ভাসে না আসমান।

দূরে চলে যায় আরো দূরে ঠিকানায়
মুখ হয় ছবি, তারপর শুরু হয় ভাঙ্গা
গভীর ঘুমের মাঝে দেখি
মাতলার নীল জলে হাঁটে দুটোপা—আলতার রাঙা।

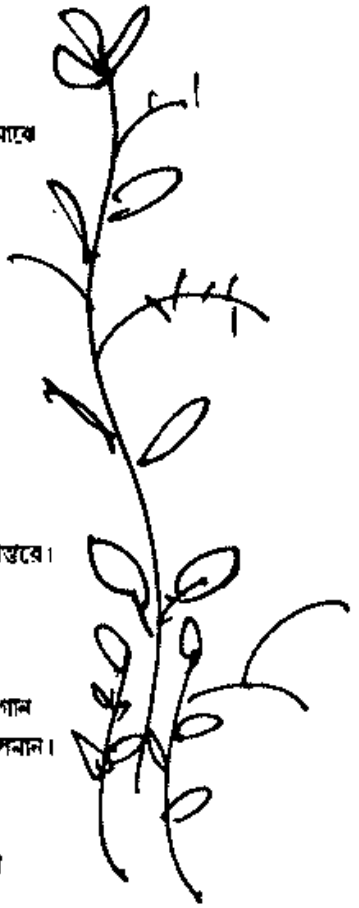

সময় শরীর

বিরূপাক্ষ পাণ্ডা

আমি ক্ষমে যাবো
আমার ব্যক্তিগত উল্লাসের প্রমে
তবুও আমার শুখপিণ্ডে
কালো পীচ ঢেলে দেবো
এ সভ্যতার অহংকার।

এভাবে সম্পর্কের জাল নোটি ঘড়িয়ে
দুরারোগ্য অসুখে মগ্ন
এই সময় শরীর।

আবার বছর কুড়ি পর

শিবব্রত দে

আবার বছর কুড়ি পর
তার সাথে দেখা হ'ল—
মুখোমুখি—পথে, রাস্তার ধার ঘেঁষে
যেতে যেতে, কলকাতার ব্যস্ত রাস্তায়।
আবার বছর কুড়ি পর
তার সাথে দেখা হ'ল
হাতিবাগানের চলমান জনস্রোতে
উদাসীন ব্যস্ততায় পরস্পর
বিপরীতে অতিক্রান্ত আমরা,
ধ্রাস্কেপহীন—কেমন স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক
যেন কোনো কালে ছিল না পরিচয়,
হার্দ লেনদেন। উপেক্ষার অভিনয়ে
কোনো জড়তা ছিল না; অথবা এ
অভিনয় নয়।

তোমার শরীরে যৌবন উল্লাস এখন
স্ফীত কালবর,
রূপ-ছন্দবহ পদচারণা;
চোখের দৃষ্টি তোমার ঠিক আছে তো,
বিস্মৃতির মেদ।

তোমাকে পার হয়ে দুটিন পা এসে
ফিরে দাঁড়ালুন :
তুমি তো চলেই গেলে নির্বিকার
আবার বছর কুড়ি পর
দেখা হ'ল তোমার আমার।

যৌবন

কৃষ্ণচন্দ্র বক্সই

মধ্যযৌবনে রাত ভেঙে লুঠো রোদ্দুর
আমার সূর্য-শপথ দুটি উর্বর হাত
বাড়ালাম ; কচি খোঁড়ের মতো
তাজা তাজা যুবক কুয়াশার মেঘ ছুঁয়ে
বিমুখ চেয়ে রইল...

এই মধ্যযৌবনে আমার দুটি উর্বর হাত
কোথায় রাখি। পতিত থেকে যাবে?
এই উর্বর হাত ঠিক হাত নয়—সহস্র অশ্রুভেজা চোখের

রুমাল
এই উর্বর হাত ঠিক হাত নয়—সহস্র মুকের
ভাষা
এই উর্বর হাত ঠিক হাত নয়—সহস্র বুভুক্ষুর
অন্ন
এই উর্বর হাত ঠিক হাত নয়—কাঙ্ক্ষিত সমাজের
হাতিয়ার

মানুষের বুকে ও মুখে চলকে উঠছে মেঘ
ক্রমশ
নগরে ও গ্রামে আগ্নেয় প্রসব করছে
অবিরত
এই বন্ধ্যা সময়ের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে
যৌবন
আর আমি
মধ্যযৌবনে রাত ভেঙে মুঠো রোদ্দুর
আনার সূর্য-শপথ আমার দু'টি উর্বর হাত
কোথায় বুনি।

বন্দীত্বে

দিলীপ সামন্ত

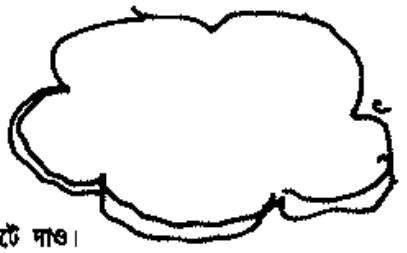

বৃহন্নলা সুখের সুতোগুলো কেটে দাও।
আমি আকাশ ছুঁতে যাবো
ছুঁয়ে দেখব চন্দ্রিমা আবেশ,
লক্ষ, কোটি অগ্নুৎপাতের মতো সূর্যের শিখাগুলি।
কেননা তারই সান্নিধ্যে নীচে
অকল্পনীয় মাধ্যাকর্ষণে
নীতল সমুদ্রের সুতীব্র হাতছানি।

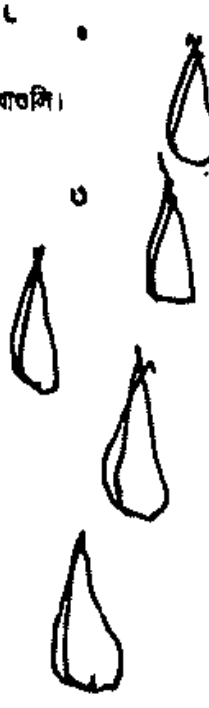

গৃহস্থ কাউকেই দেয় না ফিরিয়ে
রাজা-উজির, কিম্বা ভিখারী
শাঁখের করাতে বিনা রক্তপাতে
গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে শিরস্তান
কিম্বা পাঁজরের স্বপ্ন
হিমস্রোবিন-হীন।

বৃহন্নলা স্বপ্নের ঘুমে
হায় হাতে হাতে অনন্ত জাগরণের লাটাই
পেঁাত যাচ্ছে বারবার
একান্ত মনন-ঐকান্তিক খুড়ি;
ঘরেরা মরে রয়েছে কবেই
বন্ধ দরোজায় মাথা খুঁটে খুঁটে,
স্বপ্ন দেখার অনুভূতিগুলোও মাথা নত যেন ;
এক নদী শোকেও কোনো নারী কাঁদেনি বলেই!

আজ আর হাতছানি দিয়ে ডাকে না বৈজ্ঞানিক মাধ্যাকর্ষণ
অফুরন্ত সুখের মাঞ্জা জড়ানো সুতো ভিজে একাকার
ভোঁতা চপার তবু রণক্লান্ত রক্তাক্ত আমি
বর্ষণহীন শ্রাবণ আজ।

তুমি আলো হয়ে ফোটো

কিঙ্কি চট্টোপাধ্যায়

ঝিরি ঝিরি নারকেলপাতায় যে বাঁশি বাজে
তুমি শোনো না—ব্যস্ত হাজার কাজে।
ভাবের জলের মতো শুষে খায় তোমাকে সংসার
সারাদিন অবিশ্রান্ত অর্ঘপাঠ-অপরাহ্নে আহার
করে যাওয়া পথে মাগো হেজে যাওয়া পায়
সংসার সচল রাখো সকাল সন্ধ্যায়।
কি ক্ষতি আজকে যদি ঘুম ভেঙে ওঠো?
শুধু মা নও, তুমি আলো হয়ে ফোটো।

প্রতি সন্ধ্যায় নীল ধ্রুবতারা ডাকে
দেখতে পাওনা হাজার কাজের ফাঁকে।
অশ্রুসজল ছোট্ট কিশোর চোখ
মায়ের কাছেই যত আবদার রোখ।
ছুটতে গেলেই দাসত্ব বেড়ি ঝনঝন বেজে ওঠে
প্রত্যাশা কাঁটা তীক্ষ্ণের মতো ফোটে।
এবার তাহলে ইচ্ছে পিষেই অনিচ্ছের মাথা কাটো।
শুধু দাসী নও তুমি নারী হয়ে ওঠো।

৬ই আগষ্ট

অশোক বেরা

মধ্যকালের নিয়মে
তুমি তো আসবেই পৃথিবীর বুকে প্রতি বছর
কিন্তু হিরোশিমার সকালবেলার
হাজার সূর্যের স্মৃতি নিয়ে নয়
এই গৃহহীন, ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত
অমৃতের পুত্রদের বিশ্বস্ত বাসভূমে
তোমার ভয়ংকরতার পৈশাচিক আনন্দে
যুদ্ধবাজদের মস্তিষ্ক বিকৃত

উন্মত্ত তারা
এই সুন্দর পৃথিবীকে ধ্বংসে করার যজ্ঞে
ওই আগন্তু
তুমি ইতিহাস হয়ে যাও
জানে লও পৃথিবীর সমস্ত যাদুঘরে
পৃথিবীর ভবিষ্যত প্রজন্মকে
সঠিক শিক্ষা দেওয়ার অঙ্গীকার

একটু সবুর করো

তপনকুমার দাস

একটু সবুর করো--সব দেব
ফুল ভালবাসা রোদ নিকানো উঠোন
শিশুর ঘুনসী—কাপো বাঁধানো ঝুমুর
তবু রোখার হোথক ছাতা হাত পাখা
ঘুঠো মুঠো আকাশ বাতাস বাউলের গান
নকশী কাঁথার অহংকার শাড়ি—সব দেব।

একটু সবুর করো—সামনে চৈত্র মাস
দোকানের দরজা খোলাবে মেলের নোটিশ
হাঁকবে, 'আসুন দাদা কিনুন সস্তা
শাড়ি গাড়ি গয়না সুখের চাবি যা ইচ্ছা।'

এবার চৈত্রে কিনে দেব মাটি রঙা ধান—
নোসক দোলানো জবা ফুল
জমিতে রোদের নিকানো উঠোন
লাউ গাছ শিশুর ফোকলা হাসি
ভালবাসার পলাশ টকটকে চোখ
খোলসহীন বেদনা সব এঁকে নিও।

একটু না হয় সবুর করলে
শারীরিক লজ্জা ঢাকলে আঁধার জড়িয়ে।

সবুরে মেওয়া ফলে—
একটু সবুর কর—সব দেব, সব দেব, সব...

সূর্যের মায়া

তপন কুমার বৈরাগ্য

তুমি এসেছো
এই পথ ধরে এগিয়ে চলো
বিকেল কয়েলা কোথায় এসেছো
এখানে পথ বন্ধুর
তবুও জীবন সংগ্রামী।
জীবনের মানে অনেক
এক একটা প্রহারে সাজানো ঘর
সব ভেদাভিন্নের মন্ত্র
ঘরোঁয়া ভংগোধা
সৌরভে বিকশিত ফুল!
আমাদের চোখের সামনে
খোলানো কতকগুলো বিউটিবিন
আমাদের জীবনকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়
খুরিয়ে ফেলি পুরুষত্বকে।
এখানে এসেছো
এগিয়ে চলো সামনে
শিশুর সবুজ গা
দুর্বাঘাসের ছোঁয়া
সূর্যের অখিত মায়া।

ফুলের বাগানে শয়তান

প্রাণতোষ বিশ্বাস

ফুলের বাগানটা
আগাছায় ভরে গেল।
একদিন যেখানে
শিউলীর গন্ধিচায়
মাটি ভিজা ঘাস
কিছুই চোখে পড়তো না—
আজ সেখানে
ঈর্ষা আগাছার দাপাদাপি।
একদিন যেখানে
দূর্বার আগায়
শিশির বিন্দু
সূর্যকে বন্দী করতো—
আজ সেখানে
পা ফেলবার জায়গা নেই।
একদিন গন্ধে
অন্ধ হয়ে ছুটে যেতো
কতোজন।
আজ দুর্গন্ধে
সযত্নে এড়িয়ে চলে সবাই।
একদা ফুলের বাগান
অযত্নে অবহেলায় আজ
শয়তানের আড্ডাখানা।

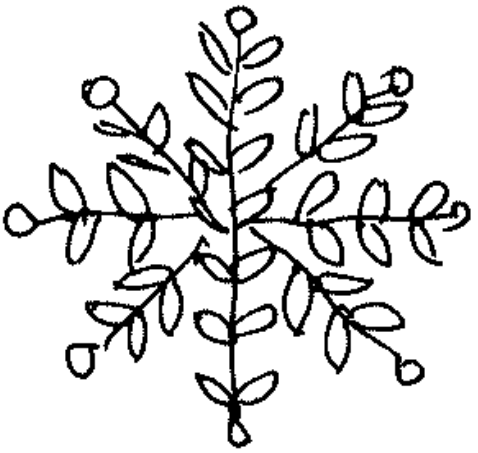

মহাভারত-এর ভারতবর্ষ

(আদি ও সভাপর্বদ্বয়ের বিবরণ)

গো পে ন ভ ঞ্জ

"শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে, কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের স্রোত ভারতবর্ষে আর লেশমাত্র শুষ্ক হইতেছে না।....ধন্য সেই কবি-যুগলকে, কালের মহাপ্রান্তরের মধ্যে যাহাদের নাম হারাইয়া গেছে, কিন্তু যাহাদের বাণী কত কোটি নরনারীর দ্বারে দ্বারে আজিও অজস্র ধারায় শক্তি ও শান্তি বহন করিতেছে..."—রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে সেই কবি যুগলের নিজস্ব বাণী ঠিক কি ছিল, সেটির তথা কেহই বিবেচনা করে দেখেন না। পরিবর্তে রামায়ণ-মহাভারতের বর্ণিত ঘটনাগুলি কেন্দ্র করে পৌরাণিক কাহিনীগুলিই সকলে কবিযুগলের নিজ নিজ বাণী বলে বিশ্বাস করে। গবেষকদের ধারণা যে ভারতবর্ষে পৌরাণিক কাহিনী রচিত হতে শুরু হয় ৪র্থ খৃস্টাব্দ থেকে।

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত মহাভারতের আদিপর্বের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে বলা হয়েছে যে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে ব্যাসদেব বলছেন, "ভগবন্! আমি এক অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছি; তাহাতে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ এই সকলের সার-সঙ্কলন ; ইতিহাস ও পুরাণের অনুসরণ করিয়াছি।" (কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক বাঙলা ভাষায় অনুবাদিত ও প. ব. নিরক্ষরতা সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত)।

অনুরূপ, বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের ২য় সর্গে বলা হয়েছে যে ভূতভাবন ভগবান ব্রহ্মা মহর্ষি বাল্মীকিকে বলছেন, "তপোধন! তোমার কণ্ঠ হইতে যে বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে তাহা শ্লোক বলিয়াই বিখ্যাত হইবে...। তুমি দেবর্ষি নারদের নিকট যেরূপ শুনিয়াছ, তদনুসারে সেই ধর্মশীল গম্ভীরস্বভাব বুদ্ধিমান রামের এবং লক্ষ্মণ, সীতা ও রাক্ষসদিগের বিদিত ও অবিদিত সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্তন কর।

নারদ যাহা কহেন নাই রচনাকালে তাহাও তোমার স্মৃতি পাইবে।" (হেমেন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক বাঙলা ভাষায় অনুবাদিত ও ভারবি কর্তৃক প্রকাশিত)। উদ্ধৃতাংশ লক্ষ্য করুন গ্রন্থকার নির্দেশমতই বাল্মীকি রচিত কথা-কাহিনীটি রচনা করেছিলেন। টি.ভি.-তে রামায়ণ-মহাভারত মূল রচনার বিকৃতিমাত্র।

বস্তুবাদী গবেষকদের ধারা অনুসরণ করে মহাভারতের দুইটি মাত্র পর্ব, আদি ও সভাপর্বের বিবরণ এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সংক্ষিপ্তভাবে। হাজার হাজার বছর ধরে শিষ্য পরম্পরায় মহাকাব্যগুলি মুখে মুখে প্রচার করা হয়েছে এবং প্রজন্মের ব্যবধানে বহু অংশের পরিবর্তন, সংযোজন এবং কিছু কিছু অংশ সম্ভবতঃ বিস্মৃতির কবলে পড়েছে। সুতরাং, বর্তমানকালের লিখিত ভাষাটি আদি রচনার সঙ্গে কতটা পার্থক্য সৃষ্টি করেছে সেটি নির্ণয় করা একেবারেই অসম্ভব। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত অবলম্বনে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথমেই কাহিনী রূপান্তরের কিছু উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। (১) আদিপর্বের ৮ম অধ্যায়তে বলা হয়েছে যে পূর্বকালে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর সংযোগে অপ্সরা মেনকা গর্ভবতী হয়ে মহর্ষি স্থূলকেশের আশ্রমে গোপনে একটি কন্যা প্রসব করে নদীতীরে পলায়ন করে। স্থূলকেশ সেই পরিত্যক্তা কন্যাকে লালনপালন করতে থাকেন এবং নাম রাখেন প্রমদ্বরা। ভৃগুনন্দন চ্যবনের পুত্র প্রমতি ও অপ্সরা ঘৃতাচীর পুত্র রুরু আশ্রমবাসিনী প্রমদ্বরাকে দেখে মুগ্ধ হয় এবং বিবাহ করে। আবার আদিপর্বের ৭১ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ক্ষত্রিয় রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, মহর্ষি বশিষ্ঠের শতপুত্রকে হত্যা করার পর কঠোর তপস্যা করার সময় অপ্সরা মেনকা তার তপস্যা ভঙ্গ করে এবং তারই ঔরসজাত কন্যাকে হিমালয়প্রান্তে মালিনী নদীর তীরে ফেলে পালিয়ে যায়। কণ্বমুনি সেই পরিত্যক্তা কন্যাকে লালনপালন করেন এবং নাম রাখেন শকুন্তলা, যে শকুন্ত, অর্থাৎ পক্ষীদ্বারা রক্ষিত হয়েছিল। পরে রাজা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার গোপন মিলনের ফলে ভরত-এর জন্ম হয়। যার থেকেই দেশের নাম হয় ভারতবর্ষ। (২) আদিপর্বের ৫৮ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে জনমেজয়ের সর্পসত্র যজ্ঞে পুরোহিতদের মন্ত্রবলে হোমানলে ইন্দ্রপরিত্যক্ত নাগরাজ তক্ষক পতিত হল না মহর্ষি আস্তীক তিনবার 'তিষ্ঠ' বলতে। আবার রাঘব প্রচলিত কাহিনী হচ্ছে যে ত্রিশঙ্কু শূন্যে অবস্থান করতে থাকেন রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তিনবার 'তিষ্ঠ' বলায়। (৩) আদিপর্বের ৯৯ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে দ্যু-নামক এক বসু তার পত্নীর ইচ্ছাপূরণের জন্য মহর্ষি বশিষ্ঠের বড়পালনওয়ালা-দোহনকালে শান্তভাবাপন্ন দীর্ঘপুচ্ছা হোমধেনু সুরভি-কে অপহরণ করেন। আবার আদিপর্বের ১৭৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে বিশ্বামিত্র বলপূর্বক বশিষ্ঠের কামধেনু গরুটি অপহরণ করেন।

নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনিকের ১২শ বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠিত যজ্ঞের সময় লোমহর্ষণ-পুত্র পৌরাণিক সৌতি মহাকাব্যটি শোনান, যিনি পূর্বে এটি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের সময় বেদব্যাস শিষ্য বৈশম্পায়নের মুখে শুনেছিলেন। মহাভারত-রচয়িতা ব্যাসদেব যমুনা নদীর একটি দ্বীপে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, বর্ণ ছিল কৃষ্ণ এবং ইনি বেদের স্থায়িত্ব ও ব্রাহ্মণগণের সমর্থক বেদের বিভাগ করেছিলেন বলে এর পুরো নামটি হয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। মহাভারতের সব চরিত্রগুলি ইতিহাসগ্রাহ্য বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, তাদের আবাসস্থল প্রাচীন যুগে প্রকৃতপক্ষে ছিল। কিন্তু মুনিঋষিদের নামে পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যসাহিত্য রচিত হয়েছিল। আবার কয়েকজনের পরম্পরা ছেদের ফলে মহাজাগতিক বস্তু বলে পরিচিত হয়েছিলেন, যেমন সপ্তর্ষিমণ্ডল।

সুপ্রাচীন যুগের বিভিন্ন উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলির অন্তর্ভুক্ত অষ্ট্রলয়েড প্রজাতির রাক্ষস, পিশাচ, অসুর, দস্যু, যক্ষ প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলি হিমালয়, গন্ধমাদন, কৈলাস পর্বতসমূহ এবং অধুনালুপ্ত সরস্বতী নদীর তীরের বসিন্দা ছিল (ডঃ মমতা চৌধুরীর 'হাইব'স অফ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া'—ভারতীয় জাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত)। গবেষকদের মত যে প্রাচীন সরস্বতী নদীটি রাজিস্থানতে প্রবাহিত হয়ে লুপ্ত হয়ে যায়। বিরোধীপক্ষের দ্বারা পরাজিত হয়ে ঐসব অষ্ট্রলয়েড গোষ্ঠীগুলি দুর্গম পাহাড়-জঙ্গলে চলে যেতে বাধ্য হয়। মহাভারতে বলা হয়েছে, "পূর্বে দেবশত্রু অসুরগণের আলয়ভূত ও ভয়ঙ্কর খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করা হয় "(২২৩ অধ্যায়—আদি)। দীর্ঘকাল ধরে গোষ্ঠীগুলির দৈনন্দিন জীবন থেকে এরা সরে গিয়ে এক সময় বিস্মৃত হয়ে যায় এবং অন্যদের কাছে রহস্যময় শক্তি বলে পরিগণিত হয়। তবুও মাঝেমধ্যে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে অস্থায়ী মৈত্রী স্থাপিত হতো, যৌন সম্পর্কও গড়ে উঠত (ভীম-হিড়িম্বা কাহিনী)। অনুরূপ ঘটনা ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশের ফলে আদিম নেগরয়েড শিকারী গোষ্ঠীটি গভীর জঙ্গলে চলে যায় এবং পরিশেষে জঙ্গলের রহস্যময় প্রেতশক্তি বলে চিহ্নিত হয়। এদের মধ্যেও সময় সময় অস্থায়ী মৈত্রী ও যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হতো। লক্ষ করা যায় যে ভারতে খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দেই রাক্ষস, পিশাচ গোষ্ঠীগুলি অমানবিক শক্তি বলে বর্ণিত হতো (কৌটিল্য'র অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ আছে)।

মহাভারত গ্রন্থে বেদ উপনিষদপন্থী ব্রাহ্মণ্যধর্মের এবং প্রধানত কুরুবংশের (পাণ্ডবরা এটির শাখা) জয়গান করা হয়েছে। স্বভাবতই ব্রাহ্মণ্যধর্মবিরোধী গোষ্ঠীগুলিকে হীন অর্থে রাক্ষস, অসুর, দানব ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছে। তদ্রূপ ভাগীরথীর উত্তর তীরের আদি বসিন্দা নাগগোষ্ঠীকে সর্প, তক্ষক ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছে।

বস্তুবাদী গবেষকরা অনুমান করেন যে বহিরাগত আর্য-উপজাতি গোষ্ঠী অনুমানিক খৃঃ পূঃ ২০০০-১৭০০ অব্দে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে। তৎকালীন ভাষাতে আর্য-শব্দের অর্থ ছিল 'তাঁবুতে কালযাপনকারী যাযাবর গোষ্ঠী' এবং দাস বা দাশ শব্দের অর্থ ছিল 'দাতা' (অধ্যাপক কোশাম্বী)। এই দাস রাজারা ভারতের প্রাচীন বংশভূত (যেমন সুদাস, দিবোদাস ইত্যাদি)। পরবর্তীকালে আর্য ও দাস শব্দ দুইটির অর্থান্তর ঘটে যায়। আর্য যুদ্ধনেতা ইন্দ্রকে বলা হয়েছে পুরন্দর অর্থাৎ পুর-ধ্বংসকারী। পরে, জীবিকার তাগিদে আর্যরা উত্তর ও মধ্য ভারতে চলে আসে। ইতিমধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায় ও আর্যদের

সম্পূর্ণ ভারতীয়করণ প্রক্রিয়াও প্রায় সমাপ্ত হয়ে যায়। ফলে এটি মিশ্র সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। মহাভারত রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাসের পিতা ছিলেন পরাশর মুনি এবং মাতা ছিলেন ধীবর কন্যা (জেলে) মৎস্যগন্ধা বা সত্যবতী। ব্রাহ্মণ্যধর্মী মুনিঋষি ও রাজারা মিশ্র প্রজাতির বলেই পরিচয় পাওয়া যায়।

পৃথিবীর সব প্রান্তের মতই প্রাচীন ভারতে রাজতন্ত্র ও পুরোহিত গোষ্ঠী পরস্পরের স্বার্থরক্ষা করে চলত। ব্রাহ্মণ বলছেন, "ন্যায়পরায়ণ রাজা যদি কদাচিৎ কোন অপরাধ করেন, তাহা আমাদের অবশ্যই সহ্য করা উচিত। ধর্মপরায়ণ ভূপতিগণ আমাদিগকে রক্ষা করেন বলিয়াই আমরা বিপুল ধর্ম উপার্জন করিতেছি" এবং মনু বলিয়াছেন, "রাজা মনুষ্যদিগের বিধাতাস্বরূপ ও দশ প্রোক্রিয়ের সমান" (উভয়ই ৪১ অধ্যায়—শান্তিপর্ব)।

বস্তুবাদী আলোচনা করার সময় স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা করা প্রয়োজন।

স্থান

প্রাকৃতিক নিয়মেই নদী তার গতি পরিবর্তন করে, সমকালে কিছু নদী বিলুপ্ত হয়ে যায়, যেমন প্রাচীন সরস্বতী নদী। শতদ্রু ও সরস্বতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলটি পুরুবংশীয়রা অধিকার করেছিল। পুরু রাজার এক পুত্র কুরু ঐ অঞ্চল থেকে চলে আসেন কুরুজাঙ্গল অঞ্চলে, যেটিকে পরবর্তীকালে কুরুক্ষেত্র বলা হয়েছে (বর্তমান হরিয়ানা প্রদেশ)। কুরু রাজার প্রধান পুরোহিত ছিলেন বশিষ্ঠ মুনি যিনি গিরিবর সুমেরু সন্নিহিত এক রমণীয় আশ্রমে বাস করতেন। "মহর্ষি বশিষ্ঠ দেখিলেন এক স্রোতস্বতী বর্ষাপ্রভাবে অতি বেগবতী ও বারিপূর্ণা হইয়া তীরস্থিত বৃক্ষবৃন্দ উৎপাটনপূর্বক লইয়া যাইতেছে। তিনি সেই নদীর নাম রাখিলেন 'বিপাশা'। এবং ভীষণ কুম্ভীরাকীর্ণ হৈমবতী নামে স্রোতস্বতীর নাম রাখিলেন 'শতদ্রু' (১৭৭ অধ্যায়—আদি)। পঞ্চনদের অপর তিনটি নদী—উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিতস্তা, চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী, কোন উল্লেখ নেই। অনুমান করা চলে যে দীর্ঘ অবস্থানের ফলে কুরুর রাজত্বকালে সিন্ধু ও সেটির শাখা নদী সংলগ্ন অঞ্চল বিস্মৃতির কবলে পড়ে গিয়েছিল। আরও বলা হয়েছে, "কৈলাসের উত্তরাংশে মৈনাক সন্নিধানে একটি পর্বতে রমণীয় বিন্দু-সরোবর। এখানে দানরাজ বৃষপর্বা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। এই স্থানেই রাজা ভগীরথ ভাগীরথীর দর্শনমানসে বহুকাল অবস্থান করেন" (৩য় অধ্যায়—সভা)। আদিপর্বের ১৬২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে "পূর্বকালে গঙ্গা হিমালয়ের হেমময় উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে নিঃসৃতা হইয়া গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, রথস্থা, সরযূ, গোমতী ও গণ্ডকী এই সপ্ত নদীরূপে সমুদ্র জলে মিলিত হইয়েন।" (ভগীরথের গঙ্গাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসা এবং সাগরদ্বীপের কপিলমুনির আশ্রমের কোন ইঙ্গিত নেই)। কুরুর রাজত্বকালে ভাগীরথী বা গঙ্গার নিকটবর্তী অঞ্চলে এই গোষ্ঠীটি আসেনি বলে অনুমান করা চলে। মহাভারতে বর্ণিত বংশ তালিকা থেকে লক্ষ্য করা যায় যে শকুন্তলা-দুষ্মন্তের পুত্র ভরতের নাতি সুহোত্র ইক্ষাকুবংশীয় (রামের বংশ) সুবর্ণাকে বিবাহ করেন এবং এদের পুত্রের নাম হস্তী। তৎকালীন সরস্বতী নদীর তীরে তার স্থাপিত নগরটির নাম হস্তিনাপুর। এই নগরটি পরবর্তীকালে নদীগর্ভে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। শান্তনুর উত্তরপুরুষ পাণ্ডুর রাজত্বকালের পূর্বেই শান্তনু ও ভরতের যশোজ্জ্বলিত নাম বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল (১১৩ অধ্যায়—আদি)। খৃঃ পূঃ ৪০০ অব্দের আনুমানিক মানচিত্র থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, বিতস্তা চন্দ্রভাগার মধ্যবর্তী অঞ্চলটি ছিল গন্ধার (গান্ধারীর জন্মস্থান, বৈয়াকরণবিদ পানিনির জন্মস্থান, যিনি ছিলেন খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দের মানুষ এবং তখন গন্ধার ছিল পারস্য রাজ্যের প্রজা) ; বিপাশা ও শতদ্রুর মধ্যবর্তী অঞ্চলটি ছিল মদ্র (মাদ্রীর জন্মস্থান); শতদ্রু ও সরস্বতীর মধ্যবর্তী অঞ্চলটি ছিল পুরুবংশের অধিকৃত ; এটি দক্ষিণে কুরু অঞ্চল (গবেষকদের অনুমান যে কুরুগোষ্ঠীর আদি বাসস্থান ছিল মধ্য এশিয়ার রুশি-নামক অঞ্চলে); গঙ্গার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলটি ছিল পঞ্চাল; অহিচ্ছত্র ও সরযূর মধ্যবর্তী অঞ্চল ছিল কোশল ; সরযূ ও গঙ্গার মধ্যবর্তী অঞ্চলটি ছিল বৎস এবং যমুনা ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলটি ছিল চেদী। আদিপর্বের ৯৪ অধ্যায় বলা হয়েছে, "পুরুবংশীয় সংবরণের রাজ্যশাসনকালে দেশে ১২ বছর ধরে অনাবৃষ্টি ও ব্যাধিতে বহু মানুষ মারা গেল। এই সময় পঞ্চালরাজ, সংবরণকে আক্রমণ ও পরাজিত করে। সংবরণ পালিয়ে যান সিন্ধুনদীর তীরবর্তী এক নিকুঞ্জে যেটি পর্বতসমীপ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থলে এক দুর্গমধ্যে তিনি বসবাস করতে থাকেন।" এইসব বিবরণ থেকে অনুমান করা চলে যে মহাভারতের প্রথম পর্বের ঘটনাস্থল ছিল ভাগীরথী বা গঙ্গা নদীর পশ্চিম-প্রান্তে এবং দ্বিতীয় পর্বের ঘটনাস্থল ছিল গঙ্গা-যমুনার অববাহিকা ও পূর্বাঞ্চল।

কাল

গবেষকদের অনুমান খৃঃ পূঃ ১০০০-৮০০ অব্দের মধ্যে ভারতে কৃষি সম্পর্কিভিত্তিক সমাজ গঠিত হয়েছিল (যজুর্বেদের কাল)। এবং খৃঃ পূঃ ৮০০-৭০০ অব্দে উত্তর ভারতে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং নগর সভ্যতার সূচনা হয়। এর প্রায় ২০০ বছর পূর্বেই লৌহের ব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই যুগে নগরজীবনের কাজকর্ম ব্যবসাবাণিজ্যের সূচনা ও মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়ে যায়। বিখ্যাত ১৬টি 'জনপদ' গড়ে ওঠে। মহাভারতে উল্লেখ আছে, "দুষ্মন্তের মৃগয়ার্থ মহাবন যাত্রাকালে নগরবাসিনী মহিলাগণ অট্টালিকার শিখরদেশে আরোহণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন..." (৬৯ অধ্যায়—আদি) দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভার বর্ণনা, দ্বারকার নিকট রৈবতক পর্বতে অন্ধক ও যদুবংশীয়দের মহান উৎসবের বর্ণনা, যুধিষ্ঠির জরাসন্ধ প্রভৃতিদের রাজসভার বর্ণনা থেকে লক্ষ্য করা যায় উন্নত নগর সভ্যতার চিহ্নসমূহ। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে গ্রীক আলেকজাণ্ডার ভারতে আসেন খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে শকগুপ্ত গোষ্ঠীগুলি অনুপ্রবেশ করে খৃঃ পূঃ ২০০-১০০ অব্দে, খৃঃ পূঃ ৩২১-৩০০ অব্দে, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র রচনা করেন (মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের যুগ), খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দে বৈয়াকরণবিদ পতঞ্জলির জন্ম হয়েছিল।

আদিপর্বের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে বলা হয়েছে, "দধির মধ্যে নবনীত, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বেদ-চতুষ্টয়ের মধ্যে আরণ্যক, ঔষধির

মধ্যে অমৃত, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, চতুষ্পদের মধ্যে ধেনু যাদৃশ শ্রেষ্ঠ, ইতিহাসের মধ্যে বেদব্যাস প্রণীত মহাভারত তাদৃশ উৎকৃষ্ট।" গবেষকরা বলেছেন যে উপনিষদ, বেদের শেষে আরণ্যক সেগুলি রচিত হতে শুরু করেছিল আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৬০০-৭০০ অব্দে (ডঃ রাসবিহারী দত্ত)। আবার সভাপর্বের ৫ম অধ্যায় বলা হয়েছে, "নারদ বেদ, উপনিষদ, ন্যায়, সাংখ্য, পতঞ্জল, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। তিনি ষাড়্‌গুণ্য (সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, ভেদ, আশ্রয়) প্রয়োগবিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি বৃহস্পতি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিতেন। তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সেবা করেছিলেন।" এবং মহাভারতে জনৈক ব্রাহ্মণের উক্তি, "শত বা শত সহস্র শব্দ আনন্ত্যবাচক বটে কিন্তু আমি যে শত বৎসর শব্দ নির্দেশ করিয়াছি, উহা কেবল পরিমাণবাচক মাত্র, আনন্ত্যবাচক নহে" (২১৭ অধ্যায়—আদি)।

এই সব বিবরণগুলি পর্যালোচনা করেই গবেষকরা অনুমান করেছেন যে মহাভারত (এবং রামায়ণ) খৃঃ পূঃ ৪০০ অব্দ থেকে ২য় খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। বর্তমান যুগে যেমন অতি উন্নত সমাজের পাশাপাশি অনুন্নত উপজাতীয় সমাজ বজায় আছে, ঠিক সেইরকমই মহাভারত-মহাকাব্যে আরো প্রাচীন সমাজের কথাও বলা হয়েছে।

রাষ্ট্রব্যবস্থা

সুপ্রাচীন যুগে বহু গোষ্ঠীপতিদের নেতৃত্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা নিয়ে এক ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। পরস্পরের অধিকৃত ভূমি দখল করাটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দ নাগাদ বৃহত্তর ১৬টি জনপদ প্রাধান্য লাভ করেছিল। তখনকার গণরাজ্য, সাধারণ রাজা-শাসিত রাজ্য ও একচ্ছত্র রাজতন্ত্র—প্রত্যেকটি একাধিক উপজাতি গোষ্ঠীর মৈত্রী জোট ছিল। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। (১) ইন্দ্রের উপদেশে পুরুবংশীয় উপরিচর বা বসু নামক রাজা কুরুদেশীয় চেদি-রাজ্য অধিকার করেন। (২) গঙ্গা ও যমুনা নদীদ্বয়ের অন্তর্গত সমস্ত রাজ্যের অধিকারী হলেন পুরু এবং তার অধিনস্থ ছিল অন্তর্ভুক্ত উপজাতিগুলি—যদু, তুর্বসু, দ্রুহ্য ও অনু। (৩) দ্রুপদ সমুদয় উত্তর পঞ্চালের অধিপতি হন। পরে কৌরব ও পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় দ্রুপদের পক্ষে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় জোট যুদ্ধ করে। (৪) দানবরাজ কংস (ব্রাহ্মণ্যধর্মবিরোধী বলে দানব আখ্যা দেওয়া হয়েছে) যাদবগণকে এবং জ্ঞাতিবর্গদের পরাজিত করে সর্বাপেক্ষা প্রধান হন। অন্ধক, যাদবও ভোজ গোষ্ঠীগুলি কংসকে পরিত্যাগ করে। পরে জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনের জন্য কৃষ্ণ ও বলভদ্র কংস ও সুনামাকে সংহার করেন। (কংস বধের প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী থেকে পৃথক)। (৫) নৃপগণ শান্তনুকে সম্রাট পদে অভিষিক্ত করেন। (৬) যাহারা পূর্বে কুরুদিগের রাজ্য ও ধন হরণ করেছিল, হস্তিনাপতি পাণ্ডু তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতে লাগিলেন। (৭) মগধের অধিপতি জরাসন্ধ সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজিত করে একাধিপত্য সংস্থাপন করেন। উত্তরদেশ নিবাসী রাজাগণ ও অষ্টাদশ ভোজ-কুল জরাসন্ধ ভয়ে পশ্চিম দিকে পলায়ন করে। বিভিন্ন গোষ্ঠী, দক্ষিণ পঞ্চালের রাজারা, পূর্ব কোশল নিবাসী রাজারাও পশ্চিম দিকে পলায়ন করে। মৎস্য ও সন্ন্যস্তপাদদেশীয় রাজারা উত্তরদিক পরিত্যাগপূর্বক দক্ষিণ দিকে গমন করেছে। পঞ্চালদেশীয় রাজারা স্ব স্ব রাজ্য পরিত্যাগ করে ইতস্তত পলায়ন করেছে। জরাসন্ধ ভয়ে কৃষ্ণ ও যাদবরা বিপুল ধনসম্পত্তি বিভাগ করিয়া প্রস্থান করার উদ্দেশ্যে পশ্চিম দিকে চলিয়া গেলেন। তখন হইতে পশ্চিম-দেশের কুলস্ত্রী-নারী পুরীতে কৃষ্ণ বাস করিতে থাকেন। (১৩ অধ্যায় সভা) লক্ষ্য করা যায় যে সে যুগে ব্যাপকভাবে উপজাতী গোষ্ঠীগুলির স্থানান্তরকরণ ঘটেছিল। বর্তমান যুগে বিভিন্ন অঞ্চলে জাতপাতবিরোধের একটি প্রধান কারণ সেই জনগোষ্ঠীর স্থানান্তরকরণ প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি বলে অনুমান করা চলে।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মপন্থী রাজাগুলির শাসন ব্যবস্থার কিছু পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতি ইন্দ্রের নীতি নির্ধারক ছিলেন। ইনি ইন্দ্রকে হিতোপদেশ দেন যে সমস্ত উপায় দ্বারা শত্রু সংহার করা অতীব কর্তব্য (৭১ অধ্যায়—আদি)। দেবরাজ ইন্দ্র 'তাহারও অপকার করিব না'—এইরূপ অঙ্গীকার করেও সমুচিত শিরশ্ছেদ করেন (৫৪ অধ্যায়-সভা)। হস্তিনাপতি শান্তনুর শাসনে ক্ষত্রিয়রা বিপ্রসেবায়, বৈশ্যরা ক্ষত্রিয়সেবায়, এবং শূদ্ররা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের সেবায় নিযুক্ত হন (১০০ অধ্যায়—আদিপর্ব)। নীতি শাস্ত্রবিশারদ মন্ত্রিবর বণিক, ধৃতরাষ্ট্রকে রাষ্ট্রনীতি ব্যাখ্যা করে বলেন, "ভীত ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন, বীরের নিকট বিনয়ভাব, মূঢ়কে (অর্থাৎ লোভী) অর্থদান, সম বা ন্যূন ব্যক্তিকে বল প্রকাশ করিয়া বশীভূত করিতে হইবে। সখা, ভ্রাতা, পিতা এবং গুরুও যদি শত্রুর ন্যায় বিরোধাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করিতে হইবে। শত্রুকে শপথ অর্থদান বিষ প্রয়োগ বা মায়া প্রকাশ করিয়া বিনষ্ট করা বিধেয়। কৃত্রিম সাধুবেশ দ্বারা সোদরদিগকে বিশ্বাসিত করিয়া পরে নেকড়ে বাঘের ন্যায় স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হবে (১২৪ অধ্যায়—আদি)। আবার একচ্ছত্র রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্রনীতির কিছু কিছু সংযোজন ঘটান হয়। যেমন নারদ, যুধিষ্ঠিরকে পরামর্শ দেন যে রাজ্য রক্ষা ও শত্রুকে পরাজিত করবার পদ্ধতি স্থির করা ছাড়া রাজ্যের সমৃদ্ধির বিষয় পদক্ষেপ দিতে হবে। যেমন, রাজস্ব কৃষকরা যেন সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করে, স্থানে স্থানে সলিলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবর খনন করবে, বৃষ্টি নিরপেক্ষ কৃষিকার্য করার ব্যবস্থা করবে (অর্থাৎ সেচ ব্যবস্থা), কৃষকদের বীজ ও অন্নের অভাব না-হয়, কৃষকদের শত চতুর্থাংশ বৃদ্ধিতে শত সংখ্যক ধন প্রদান করবে, নগর রক্ষার নিমিত্ত পল্লীগ্রাম সকল নগরের ন্যায় এবং গোমহিষী (অর্থাৎ গোয়ালা) পল্লীগ্রামের ন্যায় রাখিবে। সৈন্যগণকে অগ্রিম বেতন প্রদানপূর্বক যুদ্ধযাত্রা করবেন, লাভ প্রত্যাশায় দূর দেশ হইতে সমাগম বণিকদের কাছ থেকে শুল্ক গ্রহণ করবে, রাজার আয়ের চতুর্থ ভাগ, অর্দ্ধভাগ বা ত্রিভাগ দ্বারা নিজ ব্যয় নির্বাহ করবে, আয়-ব্যয় নিযুক্ত গণক ও লেখকবর্গ আয়-ব্যয় সকল পূর্বাহ্নে নিরূপণ করবে, ইত্যাদি (৫ম অধ্যায়—সভাপর্ব)। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে সুদে টাকা খাটান, যজ্ঞের উপাদান,

গোরক্ষণ, কৃষি, বাণিজ্য যথেষ্ট উন্নত হল (১২ অধ্যায়—সভা)। দুর্যোধন বলছেন, "কে শত্রু কে মিত্র ইহাতে কোন লেখা প্রমাণ নেই। বলপূর্বক হরণ করাই রাজন্যদিগের ধর্ম। ভূমিসম্পত্তি অবিরোধী রাজা ও আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণকে গ্রাস করিয়া থাকে (অর্থাৎ রাজা ও ব্রাহ্মণ উভয়েই জমিচোর)। সর্বত্র নীতি অনুসরণ করিলে কোন বিশিষ্ট ফললাভের সম্ভাবনা নাই (৫৪ অধ্যায়—সভা)। "অর্জুন বলপূর্বক সুভদ্রাকে হরণ করিলে সৈনিক পুরুষরা সুধর্মা-নাম্নী সভায় এসে সভাপালকে সব বিষয় জানাল। তাহিয়া সভাপাল মহারণ ভেরী বাদন করিতে লাগিলেন। দলে দলে ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়রা সমবেত হোল (২২০ অধ্যায়—আদি)। দেখা যায় যে ভোজবংশীয় রাজা, প্রজাদের হিতার্থে নিজ পুত্রকে পরিত্যাগ করে (৬০ অধ্যায়—সভা)। উদাহরণগুলি থেকে বিভিন্ন ধরনের রাজ্যশাসন পদ্ধতির কথা জানা যায়।

বেদ-উপনিষদপন্থী ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিরোধীদের অসুর, দৈত্য, রাক্ষস ইত্যাদি নামে মহাভারতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সব গোষ্ঠীর রাজাগুলি সম্পর্কে খুব অল্প বিবরণ পাওয়া যায়। বলা হয়েছে যে অসুরদের সুমন্ত্রণাদাতা শুক্রাচার্য নীতিশাস্ত্রবিদ ছিলেন, কিন্তু সেই নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে সহদেব উশনা (শুক্রাচার্য) প্রণীত নীতিশাস্ত্রের সম্যক বুৎপত্তি লাভ করেন। মহাসুর হিরণ্যকশিপুর বংশের বীর দৈত্য নিকুম্ভ'র সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই পুত্র ছিল। এদের রাজ্যে উৎসবের সময় স্থানে স্থানে নৃত্যগীত, বাদ্যোদ্যম ও দীয়তা, ভুজ্যতা, ধ্বনি উঠত। সুন্দ ও উপসুন্দ মহাসমুদ্রের পূর্বতীরের অসুরদ্বেষী মুটরাজাদের ও ব্রাহ্মণদের প্রাণনাশ করে। সমস্ত দিক বিজয় করে সুন্দ ও উপসুন্দ কুরুক্ষেত্রে বাস করতে লাগল (২১০ অধ্যায়—আদি)। পৌরাণিক কাহিনী মতে সুন্দ উপসুন্দকে বিনাশ করবার জন্যই তিলোত্তমা'কে সৃষ্টি করা হয়। অপর এক বিবরণ থেকে জানা যায় মহাবল পরাক্রান্ত দুর্দান্ত বকরাক্ষস, একচক্রানগরীর অধিপতি, নিজ ভুজবলে জনপদ, নগর ও সমস্ত দেশ রক্ষা করত। তাহার প্রভাবে প্রতিকূলকারী বৈদেশিক রাজা বা অন্যান্য হিংস্র প্রাণী হইতে প্রজারা কিছুমাত্র ভীত ছিল না। সে প্রতিদিন প্রজাদের কাছ থেকে বলি, অর্থাৎ কর আদায় করত (১৬০ অধ্যায়—আদি)। এই বক-রাক্ষসকে ভীম হত্যা করে। উদাহরণ না-বাড়িয়ে বলা চলে যে তথাকথিত দৈত্য রাক্ষসের রাজ্যও সুশাসিত ছিল।

ব্রাহ্মণ্যধর্মপন্থী ও বিরোধীপন্থীদের কথা ঃ

আদিপর্বের অনুক্রমণিকাধ্যায় বলা হয়েছে, "উত্তঙ্ক পথি মধ্যে দেখিলেন এক নগ্ন ক্ষপণক আসিতেছে, তৎক্ষণাৎ সে তক্ষকরূপ ধারণ করল।" কালীপ্রসন্ন সিংহ "নগ্ন ক্ষপণক"কে ব্যাখ্যা করেছেন নাওটা বৌদ্ধ ভিখারী বলে। প্রকৃতপক্ষে জৈন মুনিরাই নগ্ন থাকতেন-বৌদ্ধ ভিক্ষুকরা নয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে গৌতম বুদ্ধের জন্মের ১৫০/২০০ বছর পূর্বেই জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ধর্ম প্রচার শুরু করেছিলেন। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত (খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দ) জৈন ধর্মী ছিলেন। আদিপর্বের ৯১ অধ্যায়ে বলা হয়েছে মনুর সন্তান ইলা'র পুত্র পুরূরবা সমুদ্র পরিবেষ্টিত দ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন। ইনি প্রচণ্ড ব্রাহ্মণ বিরোধী ছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের সঞ্চিত ধনসকল অপহরণ করিতেন। পরে ব্রাহ্মণ মহর্ষিরা তাকে পরাজিত ও নিহত করে। অপর এক কাহিনী হচ্ছে, "ভৃগু বা ভার্গব পুত্র শক্তিএবং তার পুত্র পরাশর যিনি ব্যাসদেবের জন্মদাতা। কৃতবার্য্য যজ্ঞের পর ভার্গবদের প্রচুর ধনসম্পদ দান করেন। তখন ভার্গবরা ক্ষত্রিয় ভয়ে তাদের প্রচুর ধনসম্পত্তি ভূগর্ভে নিক্ষিপ্ত বা ব্রাহ্মণসাৎ করিত। পরে কৃতবার্যের বংশধররা ভৃগুগৃহের ভূমি খনন করে প্রচুর বিত্ত পেল এবং ভৃগুনন্দনদের উচ্ছিন্ন করল। তাদের পত্নীরা হিমাচলে পলায়ন করে এবং এক ব্রাহ্মণীর পুত্র ঊর্ব ক্ষত্রিয়দের বধ করতে থাকলে, পিতৃলোকেরা সেই হত্যাকর্ম বন্ধ করতে বলেন (১৭৮ অধ্যায়—আদি)। ব্রাহ্মণপন্থীদের বর্ণ-ব্রাহ্মণ বলা চলে না।

ব্রাহ্মণ্যধর্মপন্থীরা যেন কোন ক্ষেত্রে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের বিরোধীদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। মহাভারতে বলা হয়েছে অমৃত একটি ভেষজ, অর্থাৎ ঔষধি। সেই আয়ুর্বেদিক ঔষধিটি অসুরদের জানা ছিল। বলা হয়েছে যে ভৃগু (ভার্গব) পুত্র, অসুরদের যোগক্ষেমকর শুক্রাচার্য মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা জানতেন যেটি দেবপুরোহিত বৃহস্পতি জানতেন না। এই বিদ্যাটি জেনে আসবার জন্য বৃহস্পতিপুত্র কচ'কে পাঠানো হোল শুক্রাচার্যপুত্রী দেবযানীর সঙ্গে প্রণয় স্থাপন করতে। কচ ও দেবযানীর মধ্যে প্রণয় গড়ে উঠল। কিন্তু অসুররা কচের মতলব জানতে পেরে তাকে হত্যা করে দেহটি খণ্ড খণ্ড করে শৃগাল-কুক্কুরগণকে ভক্ষণ করতে দেয়। তখন দেবযানীর অনুরোধে শুক্রাচার্য কচ'কে পুনর্জীবিত করেন (৭৬ অধ্যায়—আদিপর্ব)। এই কাহিনীর সঙ্গে প্রাচীন মিশরের একটি পৌরাণিক কাহিনীর মিল লক্ষ্য করা যায়। মিশর সম্রাট (দেবতা) ওসিরিস'কে তার ভাই সেথ (দেবতা) হত্যা করে এবং দেহটি টুকরো টুকরো করে সারা দেশময় ছড়িয়ে দিয়েছিল। ওসিরিসের একাধারে বোন এবং বউ আইশিসদেবী মৃত স্বামীর খণ্ডিত দেহগুলি একত্রিত করে এবং সহবাস করে পুত্র হোরাস-এর জন্ম দেয়, যে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়। (মহাভারতের একটি কাহিনী হচ্ছে রাজা ব্যুষিতাশ্ব মারা গেলে রাণী ভদ্রা মৃতদেহের সঙ্গে সহবাস করে তিনজন শাল্ব ও চারজন মদ্র সন্তানদের জন্ম নেয়।)

সামাজিক রীতিনীতি

বেদ-উপনিষদপন্থী ব্রাহ্মণ্যগোষ্ঠী তৎকালে উপজাতীয় রীতিনীতি পালন করত। এর মধ্যে প্রধান ছিল নারীপুরুষের মধ্যে অবাধ যৌন সম্পর্ক। "পূর্বকালে মহিলাগণ অনাবৃতা ছিল। তাহারা ইচ্ছামত গমন ও বিহার করতে পারত। তাদের কামচারও অধীনতায় কালক্ষেপ করতে হত না। কৌমারাবধি এক পুরুষ থেকে পুরুষান্তর আসক্ত হলেও তাদের অধর্ম হত না। ফলতঃ তৎকালে ঈদৃশ ব্যবহার ধর্ম বলেই প্রচলিত ছিল" (১২৪ অধ্যায়—আদিপর্ব)। "ধর্মশাস্ত্রে কথিত আছে যে পুরুষ ঋতুরক্ষাবিনী স্ত্রীলোক কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে যদি তার ঋতুরক্ষা না করে সে ভ্রূণহত্যাপাতকে লিপ্ত হয়" (৮৩ অধ্যায়—আদি)। মহাভারতে উল্লিখিত বিখ্যাত মুনিঋষি ও রাজা-রাণীদের অধিকাংশই বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সংযোগের ফলে জন্মলাভ করেছিলেন।

ক্রমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্বাচন করবার প্রয়োজনে অবাধ যৌনসম্পর্কের সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারি হতে লাগল। "ঋতুকালে পতি-পরিত্যক্তপূর্বক পুরুষান্তর সংসর্গ করলেই স্ত্রীদিগের অধর্ম হয়, কিন্তু অন্য সময়ে তাহারা যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে, তাতে কোন পাপ নেই" (১২৪ অধ্যায়—আদি)। আবার বংশধর সৃষ্টির জন্য পরপুরুষের সাহায্য নেওয়াও বিধিসম্মত ছিল। "শাস্ত্রকাররা কহিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক আপৎকাল উপস্থিত হইলে তিনবার পর্যন্ত পরপুরুষ দ্বারা সন্তানোৎপাদন করিতে পারিবে। চারিবার পরপুরুষের সঙ্গে সংসর্গ করিলে তাহারা স্বৈরিণী ও পাঁচবার করিলে বেশ্যাপদবাচ্য হয়" (১২৩ অধ্যায়—আদি)। "স্বয়ম্ভু মনু বলেছেন যে ঔরসপুত্র অপেক্ষা ক্ষেত্রজ পুত্র শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম ফলদ" (১২০ অধ্যায়—আদি)। শাস্ত্রকাররা অদ্ভুতভাবে খাড়া করতে ওস্তাদ ছিলেন। কুমারী অবস্থায় কর্ণের জন্মদান করে কুন্তী এবং কুমারী অবস্থায় বেদব্যাসের জন্মদান করে মৎস্যগন্ধা বা সত্যবতী কুমারীই থেকে গিয়েছিলেন। যেমন যীশুর জন্মদান করেও মেরী "ভার্জিন" ছিলেন। সমাজপতিদের (রাজা ও ধনবান ব্যক্তি) ক্ষমতা যত বাড়তে লাগল নারীকে স্রেফ বংশধর উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত করা হলো, স্ত্রী স্বাধীনতা লুপ্ত হতে লাগল। বিধান দেওয়া হলো, "অদ্যাবধি যে স্ত্রী, পতি ভিন্ন পরপুরুষ-সংসর্গ করবে এবং যে পুরুষ কৌমার ব্রহ্মচারিণী বা পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইবে ইহাদের উভয়ই ভ্রূণ হত্যাসদৃশ ঘোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হইবে" (১২২ অধ্যায়—আদি)। পুরুষকেন্দ্রীক সমাজ দৃঢ়ভিত্তিক হবার ফলে নারীকে হীনচোখে দেখা হতে লাগল। "গাভীগণের ন্যায় স্ত্রীগণ সজাতীয় শত সহস্র পুরুষে আসক্ত হইলেও উহারা অধর্ম লিপ্ত হয় না" (২১১ অধ্যায়—আদি)। "মুনিরা কহিলেন, পরমেশ্বরী! স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই মিথ্যা কহিয়া থাকে" (৭৪ অধ্যায়—আদি)। অর্জুন যখন কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে বিবাহ করিতে চাহিল তখন কৃষ্ণ বলিলেন, "স্বয়ংবরই ক্ষত্রিয়দের বিধেয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রবৃত্তির কথা কিছুই বলা যায় না। স্বয়ংবরকালে সুভদ্রা কাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে কে বলিতে পারে। সুতরাং স্বয়ংবরকালে তুমি সুভদ্রাকে বলপূর্বক হরণ কর" (২১৯ অধ্যায়—আদি)। অথচ পুরুষের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, "পরিহাস প্রসঙ্গে, স্ত্রী মনোরঞ্জনের নিমিত্তে, বিবাহকালে, প্রাণসংকটে ও সর্বনাশকালে মিথ্যা ব্যবহার কদাচ পাপজনক নয়" (৮১ অধ্যায়—আদি)। ধীবরতনয়া কহিলেন, "আমি অদ্যাবধি পৃথিবীতে এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলাম যে স্ত্রীজাতিকে যাবজ্জীবন একমাত্র পতির অধীন হইয়া কাল যাপন করিতে হইবে। পতিবিহীনা নারী বিবিধ ভোগ করিতে পারিবে না।" (১০৩ অধ্যায়—আদি)। "ভার্যা, দাস ও পুত্র ইহারা যে কিছু ধন উপরর্জন করে, সে ধনে তাহাদিগের অধিকার নাই, তাহাদের প্রভুরই সম্পূর্ণ অধিকার" (৮২ অধ্যায়—আদি)।" "চতুর্দশ বর্ষের অনধিক বয়ঃক্রমে কেহ পাপপুণ্যের ফলভোগী হইবে না" (১৪৮ অধ্যায়—আদি)। "ভ্রাতৃগণের ধন বিভাগ সাধুদিগের অভিপ্রেত নয়"। "তর্কদ্বারা বিধির নাশ হয় না। কিন্তু বিধির দ্বারা তর্কবাদ নষ্ট হইয়া থাকে, অতএব বিধি-বিরুদ্ধ কার্যে হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য নহে।"

কৃষ্ণ বললেন, "পূর্ব জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করেন। তারপরে যাহারা ক্ষত্রকুলে জন্মিয়াছেন তাহারা যথার্থ ক্ষত্রিয়ের ন্যায় আচার-ব্যবহার করেন, তাহারা একত্র হয়ে কুল নিয়ম স্থাপন করেন" (১৩ অধ্যায়—সভা)। "অগ্নি, রুদ্র, গঙ্গা ও কৃত্তিকার পুত্র কার্ত্তিকেয়, যাহারা ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব তাহারা কালক্রমে ব্রাহ্মণ হইয়াছে" (১৩৭ অধ্যায়—আদি)। "যে সকল নরপতিগণ ঐলবংশে ও ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করেন তাহাদের থেকে একশত কুল সমুৎপন্ন হয়। ক্ষত্রিয়গণ স্ব স্ব বংশলক্ষ্মী অধিকার করিয়া আছেন" (১৩ অধ্যায়—সভা)। লক্ষ্য করা যায় যে মহাভারতের যুগে বর্ণ-প্রথা শিথিল প্রকৃতির ছিল।

পার

পূর্বেই বলা হয়েছে যে মহাভারতে উল্লিখিত ব্যক্তিরা প্রকৃতপক্ষে ছিলেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। লোকবিশ্বাসকে প্রমাণ বলে গণ্য করা যায় না। তবে জরাসন্ধ এবং কৃষ্ণ চরিত্র দুইটির বিশেষ তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়। মগধ দেশের রাজা বৃহদ্রথ কাশীরাজের দুই রূপবতী কন্যা বিয়ে করেন। পুত্র না হওয়াতে বৃহদ্রথ রাজ্য পরিত্যাগ করে এক তপোবনে আসেন। সেখান কাক্ষীবান গৌতমের পুত্র চণ্ডকৌশিক তপস্যায় পরিশ্রান্ত হয়ে এক বৃক্ষমূলে বসেছিলেন। বৃহদ্রথের দুঃখের কথা শুনে চণ্ডকৌশিক আম্রতলে বসে ধ্যান করতে থাকার সময় একটি আম্রফল তার কোলে পড়ল। সেই ফলটি খেয়ে বৃহদ্রথের রাণী এক পুত্র-সন্তানের জন্ম দিলেন এবং তার নামই জরাসন্ধ। কিছুদিন পর চণ্ডকৌশিক পুনরায় মগধবেশে এসে বৃহদ্রথ কর্তৃক পূজিত হবার পর মহর্ষি বললেন যে জরাসন্ধ নিঃসন্তান হবে। জরাসন্ধের রাজত্বকালে কংসের মৃত্যু হলে জরাসন্ধ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হন। কুকুর, অন্ধক ও বৃষ্ণি নামক গোষ্ঠীগুলি দুর্বল ব্যক্তি বলবানের সহিত স্পর্দ্ধা করিবে না'—এই নীতিবাক্য অনুসরণ করে জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ করল না। বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক নামক পাঁচটি পর্বতের মধ্যে উপপ্লব্যশূন্য মগধরাজ্য। এই স্থানে বসুমতী ও মণিনাগের আবাস। এই স্থানে শান্তিস্বভাব মহাত্মা গৌতম ঋষি ক্ষত্রিয়দের উপকারে কাক্ষীব প্রভৃতি পুত্রগণকে উৎপাদন করেন। পূর্বে অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি দেশের রাজারা এসে গৌতমের আশ্রম মহোৎসব করতেন (২০ অধ্যায়—সভাপর্ব)। এই জরাসন্ধকে বধ করার জন্য কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে জরাসন্ধের প্রাসাদে উপস্থিত হন। জরাসন্ধ ব্রাহ্মণদের খুব ভক্তি করতেন এবং কৃষ্ণের অনুরোধে মধ্যরাত্রে রাজযজ্ঞাগারে এসে মিলিত হতে রাজি হলেন। মধ্যরাতে জরাসন্ধ যজ্ঞাগারে এসে তিন ব্রাহ্মণের রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ দেখে বিস্মিত হয়ে তাদের প্রকৃত পরিচয় জানতে চাইলেন। উত্তরে কৃষ্ণ বলেন যে বীর ব্যক্তিগণ শত্রুগৃহে অপ্রকাশ্যভাবে ও সুহৃদগৃহে প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ করে। পরে কৃষ্ণের পরামর্শে ভীম জরাসন্ধকে বধ করেন (২০ অধ্যায়—সভাপর্ব)। এই কাহিনীর মধ্যে

গৌতমবুদ্ধ, অজাতশত্রু ও রামায়ণ কাহিনীর-নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদ বধ কাহিনীর ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালের হিন্দুধর্মের প্রধান দেবতার সম্বন্ধে মহাভারতে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়।

ইন্দ্র—মহাভারতের যুগেই ইন্দ্র তার প্রাধান্য হারিয়েছিলেন। ইন্দ্র সর্বদা শঙ্কিত থাকতেন তার ইন্দ্র-পদটি হারাবার ভয়ে। যাদবগোষ্ঠীর যুদ্ধনেতাকে বলা হত ইন্দ্র। চেদিরাজ বসু (বা উপরিচর) ইন্দ্রের কৃপাবতী পূজা পুনরায় শুরু করেছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রের ভয় হয়েছিল উনি ইন্দ্রত্ব গ্রহণে অভিলাষী (৬৩ অধ্যায়—আদি)। সর্পযজ্ঞের সময় ক্রুদ্ধ জনমেজয় আজ্ঞা করিলেন, "যদি দুরাত্মা তক্ষক ইন্দ্রের নিকট পলায়ন করিয়া লুক্কায়িত থাকে, তবে ইন্দ্রের সহিত তাহাকে দগ্ধ কর" (৫৬ অধ্যায়—আদি)। মহাদেব ইন্দ্রকে বলিলেন, "হে শতক্রতো। তুমি বালসুলভ চপলতায় আমাকে অপমান করিয়াছ, অতএব তোমাকে এই গুহা মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।" ইন্দ্র সেই গুহার মধ্যে তুল্যতেজাঃ চারজনকে দেখিতে পাইলেন (১৯৭ অধ্যায়—আদি)। আবার বলা হয়েছে যে বালখিল্য মুনিরা ইন্দ্রবিরোধী ছিলেন (৩১ অধ্যায়—আদি)।

মহাদেব—শ্বেতকি মহাদেবকে তার যজ্ঞের যাজনকার্য করতে বলাতে মহাদেব বললেন, "যাজনকার্যে দীক্ষিত হওয়া ব্রাহ্মণদের বিধেয়; এই কারণে আমি স্বয়ং তোমার যাজনকার্য করিতে পারিব না" (২২৩ অধ্যায়—আদি)। মহাদেব বেদ উপনিষদপন্থী ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

ব্রহ্মা—আদিপর্বের ৭৫ অধ্যায় বলা হয়েছে যে ভগবান প্রচেতার দক্ষ-নামক পুত্র হইতে এই সমস্ত প্রজা সৃষ্টি হইয়াছে, এই কারণবশতঃ লোকে তাহাকে পিতামহ বলে। এবং মরীচির পুত্র কশ্যপ হইতে ইন্দ্রাদি দেবতা, বিবস্বান ও অসুররা জন্মগ্রহণ করে (৬৪ অধ্যায়—আদি)। আবার আদিপর্বের ৭৬ অধ্যায় বলা হয়েছে যে অসুর পুরোহিত ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য কহিলেন, "বরদাতা ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া আপনি কহিয়াছেন পৃথিবীতে বা স্বর্গে যে কিছু বস্তু আছে, আমি তার ঈশ্বর।" লক্ষ্য করা যায় যে মহাভারতের যুগে ব্রহ্মা লোকপিতামহ বলে স্বীকৃতি পাননি।

কৃষ্ণ—মহাভারতের কৃষ্ণ একজন মানুষ যার মৃত্যুও হয়েছিল। আদিপর্বে কৃষ্ণের উল্লেখ শুরু হয় অনেক কাহিনীর পরে। তৎকালীন বৃষ্ণি গোষ্ঠীর অন্তর্গত যদু-কুলে কৃষ্ণের জন্ম। মগধরাজ জরাসন্ধের ভয়ে কৃষ্ণ পলায়ন করে পশ্চিম দেশের কুলহুলী-নাম্নী পুরীতে বসবাস করতে থাকেন। যুধিষ্ঠির বললেন, "কৃষ্ণ নিজেই জরাসন্ধকে ভয় করে" (১৪ অধ্যায়—সভা)। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশী কৃষ্ণকে জরাসন্ধ পাদ্যপ্রদান করতে গেলে কৃষ্ণ নিজেকে অব্রাহ্মণ জেনে সেটি গ্রহণ করেননি। আবার কৃষ্ণ দাস ছিলেন বলে জরাসন্ধ তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে ইচ্ছা করেন নাই (৪১ অধ্যায়—সভা)। চেদিরাজ শিশুপাল কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করতেন না (৪২ অধ্যায়—সভা)। শিশুপাল বলিলেন, "কৃষ্ণকে বালকেরাও ঘৃণা প্রদর্শন করে...কৃষ্ণ বাল্যকালে অশ্ব ও বৃষ্ণ নষ্ট করেছিল...এই দুরাত্মা কংসের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাহাকে সংহার করিয়াছে। হে ভীষ্ম! তোমার বাক্যে গোঘাতী ও স্ত্রীহত্যাকারী ব্যক্তিকে পূজা করিতে হইবে।" (৪৩ অধ্যায়—সভা)। সভাপর্বের ৪৪ অধ্যায় বলা হয়েছে যে শিশুপালের বাগ্দত্তা রুক্মিণীকে কৃষ্ণ বিবাহ করেন। মহাভারতের পরবর্তী পর্বগুলিতে কৃষ্ণকে দেবতা বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হলেও, পরিণতিতে তিনি রক্ত-মাংসের মানুষের মতই মৃত্যুবরণ করেন।

রাম এবং বর্তমানে পূজিত অন্যান্য দেবদেবীদের কথা মহাভারতে অনুপস্থিত অথবা তাদের প্রতি নগণ্য ভূমিকা। প্রসঙ্গত মনে করা হয় যে ত্রেতা যুগটি (রাম-অবতার) দ্বাপর যুগের (কৃষ্ণ-অবতার) পূর্ববর্তী ছিল। সেক্ষেত্রে মহাভারতে প্রাথমিক পর্যায়ে রামের উল্লেখ থাকাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু নেই। আরো লক্ষ্য করা যায় যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্য প্রথমে গঙ্গা-যমুনার পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেটিকে মহাভারতের যুগ বলা যায়। পরবর্তীকালে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মটি গঙ্গাযমুনার পূর্বাঞ্চলে প্রসারিত হয় (অযোধ্যা নগরটি এই অঞ্চলে), যেটিকে রামায়ণের যুগ বলা চলে। মহাভারতের কাহিনীতে ইক্ষ্বাকুকুলের (রামের বংশে) রাজা কল্মাষপাদকে 'রাক্ষস', অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্মবিরোধী বলে গণ্য করা হয়েছে। প্রশ্ন দেখা দেয় যে মহাভারতের কাহিনী কি রামায়ণের কাহিনীর পূর্ববর্তী?

ব্রাহ্মণ্যধর্মবিরোধী গোষ্ঠীগুলি, যথা জৈন, বৌদ্ধ, লোকায়ত, শ্রমণপন্থ, অহিংস মুনিঋষি প্রভৃতিদের সম্পর্ক আলোচনা এই প্রবন্ধে করা হয়নি। এগুলির প্রভাব জনসাধারণের উপর ব্যাপক ছিল। তবে মহাভারতের যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মটিকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং পরস্পরের মধ্যে প্রচণ্ড শত্রুতা ছিল। পতঞ্জলী (খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দ) বলেছেন যে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের পারস্পরিক বিরোধকে সাপ ও নেউলের বিরোধের সঙ্গে তুলনা করা চলে। লক্ষ্যণীয় যে বৈদিক ব্রাহ্মণধর্মে প্রতিমা পূজার কোন স্থান ছিল না, বিষয়টি তাদের কাছে অপরিচিত ছিল (রোমিলা থাপর)। যীশু খৃষ্টের জন্মের সময়কাল থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পাশাপাশি শাক্ত, ভাগবত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হতে থাকে। এই সমস্ত ধর্মবিশ্বাসগুলি মিলেমিশে, পৌরাণিক ধর্মমতের উৎপত্তি হয় (রোমিলা থাপার)। বৈদিক যজ্ঞ বিরোধী গোষ্ঠীগুলির প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়ে বেদ-উপনিষদপন্থী ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রসারটি ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেব তার মাতা সত্যবতীকে বলছেন, "মাতঃ। সময় অতিশয় দারুণ হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে সুখের লেশমাত্রও নাই, দিন দিন পাপ বৃদ্ধি হইতেছে, পৃথিবী শস্যশূন্যা ও ফলবিহীনা হইয়াছে। বোধহয় লোক সকল কালক্রমে নানাবিধ মায়াজালে জড়িত ও নানা দোষে সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিবে; বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।" (১২৮ অধ্যায়—আদিপর্ব)।

মহাভারতে হিন্দু বা হিন্দুধর্ম শব্দ দুইটি অনুপস্থিত, অর্থাৎ ২য় খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষেতে "হিন্দু"-নামক ধর্মমতের উৎপত্তি হয়নি। প্রাচীন পারস্যের আকাইমেনী-শিলালিপিতে "হিন্দুশ" ও "আল-হিন্দু" শব্দ দুইটির অর্থ হলো "সিন্ধুতীরবর্তী অঞ্চল এবং সেটির অপরপারের বাসিন্দা।" পরবর্তীকালে হিন্দু-শব্দটি ধর্মীয় অর্থে ব্যবহার করা শুরু হতে থাকে, "হিন্দুস্থান" ও "হিন্দুধর্ম" ভারতীয় ভাষার অন্তর্গত হয়ে যায়। বর্তমান যুগের "সংঘ পরিবার" বিবেচনা করে দেখুন যে তারা "হিন্দু" শব্দটি পরিত্যাগ করবেন কিনা, কারণ এটি মুসলমানদের, পারস্যবাসীদের দেওয়া শব্দ।

[বিঃ দ্রঃ—পারসিয়ান ভাষাতে 'স' অক্ষরটি নেই, সেইস্থানে 'হ' অক্ষরটি ব্যবহার করা হয়]

আকাশ কুসুম

বিমলেন্দু চক্রবর্তী

নিজেকে প্রশ্ন করলো ধবল, তুমি কোথায়?

কোন উত্তর নেই।

আকাশ শান্ত। শান্ত আকাশে স্নিগ্ধ আলো। স্নিগ্ধ আলোর আকাশে চাঁদ। চাঁদ নীল।

নীল চাঁদ কোন আকাশে ভেসে বেড়ায়? গাছের নিচে নীল আলো। নীল আলোর বুকে স্নিগ্ধ ছায়ার নকশা। ধবল চিনে নিতে চাইছে দেখা দৃশ্য। কোন দৃশ্য চিনতে পারছে না। এরকম দৃশ্য এর আগে কখনো দেখেনি। কোন এক অজানা দেশ থেকে যেন অপার্থিব এক আলো ভেসে আসছে।

সেই উদ্ভাসিত আলোর মধ্যে ধবল একা। সে নগ্ন। নিজের নগ্ন শরীর নিজে দেখতে পাচ্ছে। এখন সে নিজের প্রতিবিম্ব নিজে। অথচ কোন বিস্ময় নেই। নরম নীল আলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফুল তুলছে। না-না সে ঘুরছে না,—হাওয়ার বুকে ভাসছে। তার শরীরে কোন ওজন নেই—ফানুসের মত হাল্কা।

কোথায় কে যেন শব্দ করলো। অন্ধকারের মধ্য থেকে নীল আলোর বুক চিরে শব্দ চলে এল, এল তীরের মত। নীল আলো কেঁপে উঠে ফেঁসে গেল। হঠাৎ সেই ফেঁসে যাওয়া ফাঁকের মধ্যে পড়ে গেল।

এবার ধবল নিজেকে চিনতে পারলো। এই তো আমি। কত দিনের পরিচিত মানুষ। অনেকগুলো দিন, মাস, বছর এই দেহের মধ্যে বাস করে আসছে। সেই দেহ, নিজের হাত-পা—সব চিনতে পারছে। তার কান এখন কানের মধ্যে। সেই কানে শব্দ আসছে। এতক্ষণ ধরে যে নৈশব্দে অবগাহন করছিল তা হারিয়ে গেছে।

পাখা চালিয়ে দাও, কে যেন বললো।

মাথায় জল দাও, অন্য আর একজনের গলা।

ডাক্তার, এক্ষুনি ডাক্তার চাই। উদ্বেল, ভীত, সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর।

কারা কথা বলে? করাতের মত শব্দ। একের পর এক শব্দ এসে কানের ভিতর আঘাত করছে। তা হলে ধবল এখনো পৃথিবীতে আছে! আঃ—কি সুন্দর এই পৃথিবী! কত দিন হল নদী দেখেনি ধবল দু'পাশের সবুজ মাঠের মধ্য দিয়ে জল দুলে দুলে চলছে একবার উঠে বসলে কেমন হয়। চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে থেকে আকাশ দেখতে পাচ্ছে না। উঠে বসলে প্রবাহিত নদী দেখতে পাবে। না, তা তো হবার নয়। ধবল শুয়ে আছে নিজের ঘরে। উঠে বসবার ইচ্ছা হারিয়ে গেল।

ধবল এমনি টান টান হয়ে শুয়েই থাকবে যেভাবে শুয়ে আছে সে শুয়ে থাকবে এই আধো জাগরণ আর আধো ঘুমের জগতে সুন্দর এই তন্দ্রাচ্ছন্ন ঘুম। বুক নিঙড়ে কান্না আসে না। একটা ছুরির দিকে হয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার না করে নিরব থাকা—সে বড় কঠিন শাস্তি মনে হয় যেন একটা অবরুদ্ধ বাক্সের মধ্যে সে বসে আছে। কি কষ্ট.

ধবল আবার হারিয়ে যাওয়া দৃশ্য পেতে চাইছে। না, এই তিক্ত অভিশপ্ত জীবনে সে আর ফিরে আসতে চাইছে না। আবার নিজের মধ্যে নেমে যেতে চাইছে। হারিয়ে যাওয়া নরম নীল আলোর দৃশ্য আবার পেতে চাইছে।

ধবল আবার নিজের মধ্যে নেমে গেল। ধীরে ধীরে নামতে থাকলো। নামতে থাকলো ধাপে ধাপে—মানুষ যেমন সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। ধবল নামছে নিজের মধ্যে। কতটা নামবে?

নামার পথে বাধা পড়লো। কারা যেন কথা বলছে।

ডাঃ ভৌমিককে পাওয়া গেল না।

এখন উপায়।

ডাঃ রায়কে দেখ।

ডাঃ রায়কেই দরকার। ওর বন্ধু। অনেক দিন ধরে দেখছেন।

কারা কথা বলছে? চিনেও চিনতে পারছে না। অনেক তীব্র সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। উদ্বেগ, উত্তেজনা, তাকে স্পর্শ করছে না। ধবল তখন হারিয়ে যাওয়া একখানা ছবি আবার ফিরে পেতে চাইছে। ছবি খুঁজে পাচ্ছেনা। অন্য রকম একটা ছবি চোখের উপর ভেসে উঠছে।

প্রথম ছবি এল ছেঁড়া ছেঁড়া। স্লেটে ছবিটা একবার আঁকা হয়েছিল তারপর মুছে ফেলেছে। চিবুক শক্ত। ঠোঁট সামান্য বাঁকা।

শিখার ছবি ধবলের ভালো লাগছে না। ইচ্ছে করছে পুঁছে ফেলতে। ধবল জানে এ ছবি সে পুঁছে ফেলতে পারবে না। কিভাবে আঁকা ছবি পুঁছে ফেলতে হয় তা সে জানে না। কোন ছবি সে জীবনে পুঁছে ফেলতে পারেনি। অথচ অনেক ছবি জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। কিভাবে কখন হারিয়ে গেল নিজেই জানতে পারে নি।

নিরুপায় ধবল শিখার পানে তাকিয়ে রইল।

রেখা নড়ে উঠলো। বললো, আমি সুকুমারবাবুর সঙ্গে দেখা করে এসেছি। কাল থেকে ছেলে পড়তে যাবে।

ধবল অবাক হয়ে বললো, সেকি। আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করার কথাও মনে এল না। জানো, উনি কত বেশি টাকা নেন। ভদ্রলোক আমার সাধ্য সামর্থের বাইরের মানুষ।

রেখা বললো, দু'শ টাকা এমন কি বেশি। ভালো মাস্টার বেশি নেবেই। জানো, ওর কাছে সব স্কলার ছেলেরা পড়ে।

ধবল বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, পড়ে। তাতে আমার কি? আমার ছেলে যাবে আমার সামর্থের মধ্যের মানুষের কাছে। আমার নাগালের বাইরে আমি যেতে পারি না।

রেখা বললো, এই সামান্য টাকার জন্য গাঁইগুই করছো?

ধবল বললো, আরো একজনকে দিতে হচ্ছে। যোগ করলে কত হয়?

রেখা ঘুরে দাঁড়ালো। বললো, অত হিসেব নিকেশের মধ্যে আমি নেই। ছেলে আমার যাবে।

ধবল অসহায় কণ্ঠে বললো, কোচিং বাড়িতে করার কারণ কি?

রেখা বললো, ওখানে কিছু হয় না।

ধবল বললো, মিথ্যে কথা। তোমার ছেলে কোচিংয়ে যায় না। রকে বসে আড্ডা দেয়।

রেখা কেঁদে দিল। কাঁদতে কাঁদতে বললো, তুমি ছেলেটাকে দেখতে পার না।

হুট করে দৃশ্য হারিয়ে গেল। আবার একখানা কালো পর্দা রূপ করে চোখের উপর নেমে এল।

বাহুমূলে কি যেন ঢুকে গেল। তীক্ষ্ণ এবং ধারালো। ধবল টের পেল কিন্তু নড়লো না। মাথা কি রকম ঝিম ঝিম করছে। একটু একটু রক্ত বুক থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সে এবার টের পাচ্ছে রক্ত প্রবাহ। অথচ এত সময় টের পায় নি। কে যেন হাত ধরে আছে। তার হাতের স্পর্শ নিজের মধ্যে অনুভব করছে।

এখন তার মাথায় আবার নতুন ভাবনা আসছে। জীবন হাত বাড়িয়ে মৃত্যুকে স্পর্শ করে না মৃত্যু এসে জীবনের হাত ধরে? ধবল এখন তাই বুঝতে চাইছে। কিন্তু তাতো বোঝা যাবে না! জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ কুয়াশায় ঢাকা—তবু জানবার জন্য বোঝবার জন্য নিজের মধ্যে ব্যাকুলতা অনুভব করে। মনে প্রশ্ন হল—কোথায় হারিয়ে ও গিয়েছিল?

ডাক্তার বুকে হাত রেখে বললেন, এখন কেমন বোধ করছেন?

ধবল বললো, ভালো।

ডাক্তার বললেন, কি ঘটেছিল বলতে পারবেন?

ধবল বললো, ভেঙে পড়েছিলাম।

ডাক্তার অবাক হয়ে বললেন, ভেঙে পড়েছিলেন।

ধবল বললো, হ্যাঁ, ভেঙে পড়েছিলাম। কোথায় যেন চলে গিয়েছিলাম। কোথায় তা বলতে পারবো না।

ডাক্তারের মুখ গম্ভীর দেখালো। তিনি রুগীর দিকে মনোযোগ দিলেন। চোখ, জিভ, পেট সব খুঁটিয়ে দেখলেন। বললেন, বড় ভাবনায় ফেললেন আমাকে।

ধবল বিছানায় উঠে বসলো। বললো, কেন?

ডাক্তার বললেন, এভাবে নিজেকে নষ্ট করলেন কি করে? আপনার শরীরে তো কিছু নেই।

ধবল বললো, হ্যাঁ, অপচয় বড় বেশি করেছি। সবটাই নেশার ঝোঁকে।

ডাক্তার ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, আপনি নেশা করেন তো শুনিনি!

ধবল বললো, ডাক্তার, আমি মদের নেশার কথা বলিনি। মনের বোতল কি রকম তাই জানি না।

ডাক্তার বললেন, তা আমি জানি। আসলে আপনার মনে তিক্ত উত্তেজনা আছে। তার সঙ্গে আছে বিষণ্ণতা। এই দুয়ে মিলে আপনার ভেতরটা কুরে কুরে খেয়ে নিচ্ছে। আপনি টের পাচ্ছেন না। আর জীবনের কোন এক সময় তীব্র উত্তেজনা বহন করেছেন। তার পরিণতিতে যা হবার তাই হয়েছে।

ধবল ডাক্তারের মুখে অবাক চোখ ফেলে রেখে বসে রইল।

ডাক্তার বললেন, যে সব স্মৃতি আপনাকে দুঃখ দেয়, দগ্ধ করে, উত্তেজনা দেয় তা ভুলে থাকতে পারেন না।

ধবল বললো, নেশা। দুঃখ পাওয়ার মধ্যে একরকম আনন্দ আছে। আত্মহননের চরিতার্থ বলতে পারেন। এ নেশা যাকে পায়—ধবল কথাটা শেষ করলো না।

ডাক্তার চুক্ত কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, এ কি রকম নেশা।

ধবল বললো, আপনি বুঝতে পারবেন না। তীব্র নেশায় আমি মাতাল হয়েছি। একটা মদের বোতলে আর কতটুকু নেশা থাকে।

ডাক্তার বললেন, আমার নিজের কোন অভিজ্ঞতা নেই। কখনো পান করে দেখিনি। তবে যারা মদ খেয়ে লিভারের ব্যারোটা বাজায় তাদের দেখে হয়।

ধবল বললো, আপনি আমার লেখা প্রথম উপন্যাস পড়েছেন?

ডাক্তার হাসলেন। বললেন, আমি আপনার প্রতিটি লেখার সঙ্গে পরিচিত।

ধবল বললো, ঐ উপন্যাসে একটা মাতালের চরিত্র আছে। সে

মাতাল হয়ে বলছে, তার বাবা গামলায় মদ খেত। তার পাশু এক চৌবাচ্চা মদে ডুব দিয়ে থাকতো। নয় তো তার নেশাই হত না। এরকমই একটা কথা লিখেছিলাম। এখন আর মনে নেই।

ডাক্তার বললেন, মদের চৌবাচ্চায় ডুবলে তো লোকটা মরে ভূতে মশায়।

ধবল বললো, মরবে কেন। গল্পে এরকম অনেক অঘটন ঘটে-যা আপনার ডাক্তারী শাস্ত্রে কিছুতেই মিলবে না।

ডাক্তার হাসলেন। বললেন, আপনারা অঘটন ঘটাতে পারেন।

ধবল বললো, আপনারা তা পড়ে আনন্দ পান। যা ঘটছে তা পড়ে মানুষ খুশি হয় না। যা ঘটতে পারতো সেটাই মানুষ চায়। আমরা সেই সুবাদটাকে প্রশ্রয় দিয়ে অঘটন ঘটাই।

ডাক্তার বললেন, আপনি নেশার কথা বলছিলেন।

ধবল সচেতন হল। বললো, হ্যাঁ, নেশার কথা বলছিলাম। সে হল নিজের নেশা। এত নেশা এক চৌবাচ্চা মদ খেলেও হয় না।

ডাক্তার বললেন, আপনি বলুন, আমি শুনবো।

ধবল হাসলো। বললো, আজ বুঝি রুগি দেখার তাড়া নেই।

ডাক্তার বললেন, না। আজ হাতে আমার অনেক সময়।

ধবল বললো, ভাল। তাই বলে আপনাকে আমার নেশার গল্প বলা চলবে না।

ডাক্তার বললেন, আচ্ছা থাক। আমি বরং আপনার প্রেসারটা দেখি।

ডাক্তার প্রেসার যন্ত্র বের করে প্রেসার মাপলেন। ভাল করে আর একবার চেক আপ করে বললেন, আপনি কিন্তু বাড়ির বাইরে এক পাও যাবেন না।

ধবল আৎকে উঠলো। বললো, সেকি!

ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ। বিছানায় শুয়ে থাকবেন। মনে উত্তেজনা আসে এমন কোন ঘটনার মধ্যে নিজেকে জড়াবেন না। চুপচাপ শুয়ে থাকবেন।

ধবল বললো, শুয়ে থাকলে নানারকম কথা মনে আসে। তাতে আমার উত্তেজনা এসে যেতে পারে।

ডাক্তার বললেন, এমন কথা ভাববেন না। মানুষের জীবনে নানারকম সুখ স্মৃতি থাকে। সে সব কথা ভাবুন।

ধবল অসহায় গলায় বললো, আমার কোন সুখ স্মৃতি নেই।

ডাক্তার হাসলেন। বললেন, তা কখনো হয়। মানুষের জীবনটা সুখ স্মৃতি একটা ছকের মত। অবশ্য আমার চেয়ে এটা আপনি অনেক ভাল জানেন।

ধবল কোন কথা বললো না।

ডাক্তার বললেন, আপনি শুধু আপনার সুখের সময়গুলোর কথা ভাববেন। যাতে মনে স্ফূর্তি থাকে এমন সব ঘটনা ভাববেন। যে সব ঘটনা দুঃখ দেয় মনকে বিষণ্ণ করে তোলে তেমন ঘটনা ভাববেন না। এটা আপনার খুব প্রয়োজন।

ধবল বললো, লিখতে পারি তো ডাক্তার।

ডাক্তার বললেন, লিখুন। তবে হাসির গল্প। সারা জীবনে আপনি একটাও হাসির গল্প লিখলেন না। এবার কিছু লিখুন। অন্য ভাবনা আপাতত অন্যত্র চালান করে দিন।

ধবল বললো, ডাক্তার আপনি একটা আশ্চর্য কথা বললেন। সারা জীবন একটা হাসির গল্প লিখিনি। শুনে আমার নিজের খুব অবাক লাগছে।

ডাক্তার বললেন, আপনার কোন রচনার কোন অংশে এমন একটা পরিচ্ছেদ নেই যা পড়ে পাঠকের হাসি আসবে। সারা জীবন শুধু জীবনের দুঃখ আর বেদনার কথা লিখে গেলেন!

ধবল বললো, হ্যাঁ, বুকের সব কান্না লেখার ভিতর ঢেলে দিতে চেয়েছি ডাক্তার। পারিনি। পারা যায় না।

ডাক্তার বললেন, এই কান্নার কথা এখন থাক। হাসির কথা লিখুন।

ধবল বললো, আমার কি হয়েছে তা তো বললেন না।

ডাক্তার বললেন, বললো। গম্ভীর মুখে তাকিয়ে রইলেন ধবলের দিকে। বললেন, আমি রুগি হলে বলতাম না। কিন্তু আপনাকে বলবো। লুকিয়ে রাখা যাবে না। আপনি এত সচেতন যে ধোঁকা দেওয়া অসম্ভব।

ধবল হাসলো।

ডাক্তার বললেন, বিপদ শুধু সেখানেই নয়। রোগের কথা না বললে আপনি সচেতন হবেন না। আপনার যা হয়েছে তার ঔষধ আপনি নিজেই। বাঁচার তীব্র আগ্রহই আপনাকে আবার নতুন করে দিতে পারে। নয় তো আপনার শরীরে আর কিছু নেই।

ধবল বললো, আপনি বলুন।

ডাক্তার বললেন, আপনি 'বাঙ্ময়তার প্রেম'। উপন্যাসের আর একটা খণ্ড লিখবেন বলেছিলেন। তা কিন্তু আপনার লেখা হয়নি।

ধবল বললো, হ্যাঁ। লিখতে পারছি না ডাক্তার। 'বাঙ্ময়তার প্রেম' -এ নায়কের মধ্য দিয়ে আমার নিজের ভাবনাগুলি আমি প্রকাশ করতে চেয়েছি। জীবনের নির্মম অভিজ্ঞতা মানুষকে কি পরিমাণ কষ্ট দেয় তা বলতে চেয়েছিলাম। প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি যা ভাববার তা প্রকাশ করা কত কঠিন।

ডাক্তার বললেন, এত সব জেনেও আপনি দ্বিতীয় খণ্ড আজ পর্যন্ত লিখলেন না। আমরা পাঠকরা তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অপেক্ষা করে আছি। আর কবে লিখবেন তা বুঝতে পারছি না। অবশ্য ফার্স্ট স্ট্রোকের ধাক্কা আপনি সামলে নিতে পেরেছেন।

ধবল চমকে উঠলো। বললো, স্ট্রোক। এই বয়সে!

ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ। এখন আপনি নিজেই ভেবে দেখুন নিজের শরীরের প্রতি কি অবহেলা আর অত্যাচার করেছেন। এবার সতর্ক হন। অন্তত 'বাঙ্ময়তার প্রেম' দ্বিতীয় পর্বে হাত দিন। আমরা একখানা মোটা মহাভারত আশা করে আছি আপনার কাছে।

ধবল তাকিয়ে রইল ডাক্তারের দিকে। হঠাৎ মনে হল সত্যিই তো। তার প্রিয় নায়কের জীবনের একটা অধ্যায়ই তার বলা হয়েছে। নায়িকাকে হারিয়েও যে তার আর একটা জীবন আছে তার কথা বলা হয় নি। ভাগ্যের হাতে একটা মানুষ কিভাবে প্রতারিত হয় তা লিখবার মত। অথচ সে অর্ধেক লিখেই থেমে আছে। ধবল বললো, ডাক্তার ভয় পাবেন না। দ্বিতীয় পর্ব না লিখে মরছি না।

ডাক্তার বললেন, ভেরী গুড। কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে লেগে পড়ুন। কোন অসুবিধা হলেই খবর পাঠাবেন।

ডাক্তার চলে গেলেন। ঘর নিঃশব্দ হল। ধবল ভাবতে বসলো

তার হারিয়ে যাবার ঠিকানা। বুকের খাঁচায় অচিন পাখি কোথায় কেন হারিয়ে যায়। আবার ফিরেও আসে। এই যাওয়া আসাটা কেমন করে ঘটে তা বোঝে না। কত কিছু ঘটনা ঘটে জীবনে যা বুঝতে পারলো না। অনেক মানুষ তাকে ভালোবাসে। তাদের বুকে স্বপ্নের মত সে বসে আছে। কত মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করলো সারা জীবন ধরে। নাম যশ কীর্তি মানুষের ভালোবাসা এ সব নাকি মানুষ পাবার জন্য আকুল হয়ে থাকে। এরকম পাওয়া জীবন নাকি ধন্য জীবন। কম হলেও সে কিছু পেয়েছে। তবু নিজেকে কত শূন্য মনে হয়। অনেক সময় মনে হয় বুকের মধ্যে কিছু নেই। আকাশ গিয়ে ঢুকে পড়েছে বুকের মধ্যে। হৃৎপিণ্ড বুকের মধ্যে আছে কিনা তাতেই সন্দেহ জাগে। কি চেয়েছিল জীবনে আর কি পেয়েছে এসব কথা মনে আসে। হিসাব কষে। যোগ বিয়োগের হিসাব মেলে না। তবে জীবনের দু'চারটা অঙ্ক মেলা উচিত ছিল। অথচ এমন তার ভাগ্যে একটাও মিললো না।

কোন মানুষেরই জীবনের অঙ্ক মেলে না। দু'চারটা বড় অঙ্ক মিলে যায়। জীবন চলে। আর বড় অঙ্কগুলো যদি অমিল হয়ে যায়— বুকের পাশে চাপা বেদনা অনুভব করলো ধবল। বুকের কোন জায়গায় বলতে পারবে না বুকের কোন এক জায়গা কেটে চৌচির হয়ে আছে। অতীতের স্মৃতি মনে এলেই জায়গাটা ভেঙে বেরিয়ে আসে। বুকের মধ্যে সেই রক্ত প্লাবন সৃষ্টি করে। ধবল বেদনায় নীল হয়ে যায়।

কি ছিল বাঞ্ছিতার মধ্যে। এমন ভাবে বুকের মধ্যে গেঁথে বসলো কিসের জোরে? সে কম নারী চরিত্র সৃষ্টি করেনি। তারাও ভালবেসেছে। কোন চরিত্র ভালবাসা পায়নি। তাই বলে তারা কাঁদতে বসেনি। জীবনের স্বাদ পাবার জন্য নিজেদের নতুন করে নিয়েছে। অতীতকে টিলে কোঠায় বন্দী করে জীবনকে উপভোগ করতে চেয়েছে। প্রতিদিন গাছের পাতা খসে যায়। পাতা থেকে ছায়া ঝরে পড়ে আর এক পাতায়। নতুন পাতা মুখ তোলে আলোতে। এই তো জীবনের রীতি। প্রতি মুহূর্তে সে বৈচিত্র খোঁজে। কোন ঘটনাই তার জীবনের চূড়ান্ত ঘটনা নয়।

মানুষের জীবন মালার মত। নানা ফুলের নানা রংয়ের রামধনু রঙে সাজানো। কোন ফুল হাত থেকে খসে গেল বলে মালা গাঁথা বন্ধ থাকতে পারে না। কি আশ্চর্য এত যত্নে গেঁথে তোলা মালা মানুষ নিজের গলায় দোলায় না। দিয়ে দেয় আর একজনার গলায় পরিয়ে। তার ভিতর থেকে সে অর্জন করে আবার আনন্দ। যাকে মালা দিতে চাইলো সে মালা না নিলে হৃদয় শূন্য হয়ে যায়। তবু প্রদক্ষিণের পথ ধরে আবার বসন্ত আসে। দেবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য উৎসুক হয় মানুষ।

ধবলের মনে হল সারা জীবন ধরে সে শুধু একখানা মালাই গাঁথলো। যার জন্য মালা গেঁথেছিল সে ফিরিয়ে দিয়েছে। তাই বলে মালা গাঁথার কাজ তার বন্ধ হয়নি। দিন রাত্রির চক্র পথ ধরে সে সেই মালাই গেঁথে চলছে। আর সে মালা গাঁথছে এমন একজনের জন্য যে কোন দিন এ মালা নেবে না।

হাত মুখের নিচে এনে মেলে ধরলো ধবল। কতগুলি আঁকা বাঁকা রেখা। এই রেখার পথ ধরে মানুষের জীবন চলে। সব হকের মত বাঁধা আছে। যারা তার ভাষা জানে তারা বলতে পারে। ধবল এই সব রেখার অর্থ জানে না। বুঝতেও পারে না। শুধু দেখে শূন্য হাত। সারা জীবন ধরে এই হাত ঘিরে যে মালা গাঁথলো তার কোন মূল্য নেই বাঞ্ছিতার কাছে। ধবল এ কি করলো।

প্রথমে এল অনুতাপ। তার পিছনে এল শ্রাবণ ধারার মত বেদনা। অনর্গল ঝরে চললো সেই বৃষ্টির ধারা। যুগ যুগান্তের বিয়োগান্ত ব্যথা চেপে বসলো বুকের উপর। কোথা থেকে যেন নিরাসক্ত উদাসী হাওয়া এসে বুকের মধ্যে কাঁদতে থাকলো।

কপালের উপর হাত রাখলো ধবল। চোখ বুজে শুয়ে রইল। হাতের মধ্যেও এখন ব্যথা অনুভব করছে। অত বড় সৃষ্টি কত অবলীলায় মাংসের ভিতর ঢুকিয়ে দিল ডাক্তার। এত সহজে সব করলো যে ধবল টেরও পেল না। এখন টের পাচ্ছে। মাংসের শিরা উপশিরা বেয়ে বেদনা উঠে আসছে কোথে কোথে। হাত টন টন করছে। বুকের বেদনার সঙ্গে দেহের বেদনার মিলন হল। মেরুদণ্ড বেয়ে হিমার্ত হাওয়া যেন উঠে আসছে। কত নতুন নতুন ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে তার দেহ আর মনের মধ্যে।

বুক ওঠা নামা করছে তার টের পাচ্ছে ধবল। বুকের মধ্যে যেন একটা হাপর বইছে। হাপরটা হাওয়া টেনে চলছে। তার চাপে সারা দেহ ওঠা নামা করছে। ধবলের মনে হচ্ছে হাপরের প্রতিটি ধাক্কায় তার দেহ বেড়ে যাচ্ছে। হাপর হাওয়া ছেড়ে দিলে আবার দেহ ছোট হয়ে যাচ্ছে। দেহের মধ্যে এমন সব কাণ্ড ঘটে চলছে যা আমরা খেয়াল করি না।

ঘড়ির দিকে চোখ গেল ধবলের। আটটার ঘর ছোঁয়ার জন্য কাঁটা তির তির করে এগিয়ে যাচ্ছে। নিজেকে একটা ঘড়ি বলে ভাবতে ইচ্ছে হল। প্রতি মুহূর্তে জীবন প্রান্ত সীমার দিকে এগিয়ে চলছে। বুকের মধ্যে একটা পেণ্ডুলাম ডানে বাঁয়ে দুলছে। সময় ক্ষয়ে যাচ্ছে। বয়স বাড়ছে না বয়স কমছে? মানুষ উল্টো হিসাব করে। মানুষ তার জন্মের দিন থেকে বয়স কমিয়ে এগিয়ে চলছে শেষ সীমার দিকে। নিঃশব্দ সেই অনিবার্য গতি। জল ধারার মত চলছে নিচের দিকে। কে তাকে রুখবে?

সময় চলে যাচ্ছে। অথচ কিছুই করা হল না তার। কত কিছু করবে ভাবতো! অথচ ভাবতে ভাবতেই সময় ডেকে গেল। আরম্ভটাই করা হল না। এসব ভাবনা ধবলকে কষ্ট দেয়। জীবন থেকে কত সময় অযত্নে অবহেলায় ঝরে গেল। এত নিঃশব্দে ঝরে গেছে যে টের পায়নি। সে সময়গুলো আর ফিরে পাওয়া যাবে না। কপাল ঠুকে কোন লাভ নেই। যা হারিয়ে যায় তা হারিয়েই যায়। থাকে শুধু স্মৃতি। এ সব কিছু তার অজানা জীবনে প্রতিফলিত করে তুলতে পারলো না। সব কিছুর উপর পাথর হয়ে বসে রইল এক অভাব বোধ।

বাঞ্ছিতাকে ধবলের মনে হল নিয়তির মত। সারা জীবন যা কুড়িয়ে এনেছে সব হারিয়ে ফেলেছে। হারিয়ে ফেলেছে? ধবল আপন মনে মাথা নাড়লো। না হারায়নি। অদৃশ্য হাত এসে তুলে নিয়ে গেছে। কি অসীম শক্তি এই বাস্তবতার। যত দূরেই থাকে তার অদৃশ্য হাত তার বুকের মধ্যে। তার সঞ্চিত ধন সব এক এক করে তুলে নিয়ে নিচ্ছে। সে শূন্যই থাকছে। জীবনের ধর্ম এমন তবুও তাকে আহরণ করতে হয়।

(ক্রমশ)

অমৃতকথা

প্রসঙ্গ ঃ বিদ্যাসাগর

অজয়কুমার নন্দী

মরুতে হঠাৎ জলের দেখা পেলে পথিক যেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তেমনি করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবে বাঙালী জীবনে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। বাঙালীর নিস্তরঙ্গ মনোভূমে মহাসাগরের কল্লোল শোনা গেল। বাঙালীর ক্ষুদ্র মনাকাশ বিশ্বাকাশে মুক্তি পেল। বহু খ্যাতকীর্তি মহাপুরুষ বিস্মৃতির পলিতে চাপা পড়ে যায়, কিন্তু বিদ্যাসাগর আজো প্রতিটি বাঙালীর হৃদয়ে মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো উজ্জ্বল। তাই শহরে-উপশহরে, গ্রামেগঞ্জে, স্কুল, কলেজ, গ্রন্থাগার, ক্লাব, রাস্তা প্রভৃতির নামকরণ বিদ্যাসাগরের নামে আজো হয়। শিশু শিক্ষার সূচনা হয় বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় দিয়ে। তাই বিদ্যাসাগর বাঙালী আবালবৃদ্ধবনিতার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। বিদ্যাসাগর প্রাচীন ভারতবর্ষ ও আধুনিক ভারতবর্ষের মধ্যে সেতু রচনা করেছেন। এই মহৎ ব্যক্তিত্বের জীবনের কিছু স্মরণীয় ঘটনা এই পর্যায়ে তুলে ধরা হল।

প্রতিভার কদর

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন ছিলেন জ্ঞানী তেমন ছিলেন বিনয়ী। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের ১১ই মে তিনি লোকান্তরিত হন। তাঁর প্রয়াণ সংবাদ শুনে শিক্ষিত সমাজ তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ছুটে যায়। বিদ্যাসাগর তখন বার্ধক্যে জরাজীর্ণ। এ অবস্থাতেও তিনি প্রয়াতকে শ্রদ্ধা জানাতে গেলেন। সেখানে কোন একজন বিদ্যাসাগরকে ইঙ্গিতপূর্ণ প্রশ্ন করতেই বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, মধুসূদন খ্রীস্টান হলেও আমি তাঁকে ভালোবাসি তাঁর প্রতিভার জন্য। এই পাদরিও তাঁর প্রতিভার জন্য বাঙালীর গৌরব। আমি সেই প্রতিভাধর জ্ঞানবৃদ্ধ ভদ্রলোককে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি।

করুণাসাগর বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর অবয়বে পুরুষ হলেও অন্তরে ছিলেন জননীর কোমলতা। বারাসত নিবাসী কালীকৃষ্ণ মিত্রের একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হলে তাঁর পত্নী কুন্তীদেবী পাগল হয়ে যান। তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছিলেন। খাওয়ার অনুরোধ করলে বলতেন—বিদ্যাসাগর খাইয়ে দিলে খাবেন। কীলাকৃষ্ণের মুখে বিদ্যাসাগর একথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে খাইয়ে দেবার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। দীর্ঘদিন তিনি সে কর্তব্য পালন করেছেন।

অপচয় বিরোধী

একবার এক ভদ্রলোক বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ব্যক্তিগত দেখা করতে এলে তিনি তাঁকে একটা কমলালেবু খেতে দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক লেবু খেয়ে ছিবড়েগুলো নিচে ফেলে দিলে বিদ্যাসাগর সেগুলো কুড়িয়ে ছাদে ছড়িয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে কিছু কাক এসে সেগুলো খেয়ে যায়। ভদ্রলোককে কোন কথা না বলে অপচয় না করার শিক্ষা দিলেন।

নুন-ভাত

ভোজনরসিক বিদ্যাসাগরকে একবার এক ধনী তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। নানা ব্যঞ্জনে থালা সাজিয়ে তাঁকে খেতে দেন। বিদ্যাসাগর সব ব্যঞ্জন সরিয়ে শুধু নুন দিয়ে ভাত খেলেন। ধনী ভদ্রলোক অবাক হয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন, বিদ্যাসাগর ম্লান হেসে বললেন ঃ শৈশব কৈশোর নুন-ভাত খেয়ে কেটেছে। এখনো সেই মনের জোর আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য সুস্বাদু ব্যঞ্জন পাশে সরিয়ে রেখে শুধু নুন দিয়ে ভাত খেলেন।

পিতাপুত্রে ফারাক

প্রথম বিধবা বিবাহে উপস্থিত থাকার জন্য বিদ্যাসাগর স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রামপ্রসাদের কাছে যান। রামপ্রসাদকে আমতা আমতা করতে দেখে বিদ্যাসাগর অসন্তুষ্ট হন। দেওয়ালে টাঙানো রামমোহনের ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন ঃ এমন পিতার এমন ছেলে। ছবিটা দেওয়াল থেকে নামিয়ে ফেল।

মদ্যপ হলেও প্রতিভাবান

একবার এক মদ্যপ বিদ্যাসাগরের কাছে মদ খাওয়ার জন্য টাকা চাইলে বিদ্যাসাগর প্রত্যাখ্যান করেন। তখন সে মদ্যপ রেগে গিয়ে বলে ঃ মধুসূদন আপনার অর্থ সাহায্যে মদ খেতেন। বিদ্যাসাগর ভদ্রভাবে বলেন ঃ তুমি যদি মেঘনাদবধ-এর মতো কাব্য রচনা করতে পার তাহলে তোমাকেও মদ খাওয়ার টাকা দেব।

বিধবা বিবাহের নেপথ্য কাহিনী

বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের এক আত্মীয়া মাত্র বারো বছরে বয়সে বিধবা হন। বিদ্যাসাগরের জনক-জননী তাতে খুব আঘাত পেয়েছিলেন। তাঁরা বিদ্যাসাগরকে বিধবা বিবাহের কোন বিধান শাস্ত্রে আছে কিনা সন্ধান করতে বলেছিলেন। জনক-জননীর মুখ চেয়েই বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথাই সত্য হল

রামকৃষ্ণ এসেছেন বিদ্যাসাগর সদনে। নানা কথা হল উভয়ের মধ্যে। ঠাকুরের মুখ থেকে ভাবের কথা শুনে বিদ্যাসাগর মুগ্ধ হয়েছিলেন। বিদায়কালে ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে দক্ষিণেশ্বর যাবার আমন্ত্রণ জানান এবং পরক্ষণে একথাও বলেন যে তাঁর সেখানে যাওয়া হবে না। সত্যি সত্যি বিদ্যাসাগরের দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া হয়নি।

দয়ার সাগরের দু'চোখে জল

বিদ্যাসাগর একবার হাঁটাপথে বীরসিংহ যাবার সময় এক দরিদ্রের কুটিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেদিন কুটিরের ছেলে-মেয়েরা আজ ডাল হয়েছে বলে আনন্দে নৃত্য করছিল। বিদ্যাসাগর খোঁজ নিয়ে জানলেন রোজ তারা শুধু ভাত খায়। আজ ডাল হয়েছে তাই তাদের আনন্দ। একথা শুনে করুণাসাগরের দু'চোখে তখন অশ্রুর বন্যা নেমে এসেছে।

গ্রন্থ রক্ষণ

বিদ্যাসাগর গ্রন্থ রক্ষণাবেক্ষণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। তাঁর ধনী বন্ধু উপহাস করে বলেছিলেন এটা অর্থের অপব্যয়। বিদ্যাসাগর ঐ ধনীর হাতে সোনার চেনে বাঁধা ঘড়ি দেখিয়ে বললেন ঃ ওটা ঘড়ি নিয়ে বাঁধলেও পারতেন।

নিয়মের দেশে অন্ন কী করে মুখে তুলবো

বিদ্যাসাগর তখন রোগশয্যায়। তাঁর এক সুহৃদ তাঁকে কারমাটারের বাড়িতে থেকে হাওয়া বদলের পরামর্শ দেন। বিদ্যাসাগর ক্ষমাভেজা কণ্ঠে বললেন ঃ দুর্ভিক্ষ হওয়ায় সেখানকার সাঁওতালরা দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাচ্ছে না, আমি সেখানে গিয়ে কী করে অন্ন মুখে তুলবো।

বজ্রের দেশ ঃ দেনজঙ

(ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী)

অ জি ত কু মা র ব সু

॥ আট ॥

বাসটি আরও কিছুটা এগিয়ে চড়াই পাড়ি দিয়ে এস. এন. টি. সি বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছে থেমে যেতে, নেবে এলাম আমরা। কোথায় তখন অবসাদ? সর্বোচ্চ অনিশ্চয়তার কিন্তু মাত্র নেই। চোখ দুটি তখন কেবল উর্ধ্বমুখী হয়ে ওঠে। সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে, যে দিকেই চোখ না কেন, প্রকৃতি যুবি তাঁর অপরূপ রূপসাধুরী ছড়িয়ে দিয়ে একান্ত অন্তরঙ্গ ভাষায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে : ওরে আয়! তোরা আমার কাছে আয়।

ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে যাই। কিন্তু, হলে কই? হোটেল থেকে নেমেই যে হোটেল-অভিযানের শামিল হতে হলো আমাদের। গোটাদল একসঙ্গে। আলাদা হবো কোন ভরসায়?

বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। তাপমাত্রা এখন কত ডিগ্রীতে নেমেছে, কে জানে। ছুঁ হতে হলে তো হোটেল দরকার। মিলছে কই? সরকারী হোটেল-ম্যানেজমেণ্ট-নিবাসের রিসেপ্‌শন-রুম থেকেই ফিরতে হলো। রিসেপ্‌সনিস্ট-মহিলা লেপচা চুটিয়া। যথাযোগ্য সৌজন্য সহকারে জানালেন : ফল্ রুমস্ আর বুকড্।

বৌমা আর বাবুসোনা প্রতিবার খোঁজে যায়, আর ফিরে এসে একই কথার পুনরাবৃত্তি করে। "এখন অফ্-সীজন্। তাই নেই কী গো বাছা"—পিছন থেকেই নীচু স্বরে মন্তব্য করতেই বৌদি বলল তোমার বৌমা-র পছন্দ হচ্ছে না যে।

আর তোমার জামাইয়ের?

পাপাই তখন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে ওঠে: আমা-র চাই ডিউ-লেক্সিং-রুম, বুঝলে দাদু।

হোটেল-কর্মী-র ম্যানেজার বয়সে প্রবীন, আপ্যায়নের কসুর না করে, ওয়েটার-কে সঙ্গে পাঠিয়ে ঘর দেখার ব্যবস্থা করলেন। দু'খানা ঘর দেখার পর বৌমা বললো বড্ড ড্যাম্প, প্যাবি। অন্যত্র দেখ।

ছোট্ট একটি রুম। স্পেশ্‌ল্ অফার দিলেন ম্যানেজার। বৌমা-র চোখে মুখে বিমর্ষতার ছায়াপাত ঘটলো। বাবুসোনা বললো না-না, আসলে তেমন কোন ল্যাণ্ডস্কেপ নজরে আসেনা ঘর দুটো থেকে।

এবার আমি, বৌদি ও পাপাই বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম। আমরা তিনজন হোটেল-কর্মীতে ঢোকার চওড়া গলি-টার একধার ঘেঁসে সঙ্গের জিনিষপত্র নামিয়ে ওয়েটিং-রুম বানিয়ে ফেললাম।

বৌদি কী ভাবছিলেন জানি না। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন শেষ ধর্মরাজা, পল-পেন-পল-পুপ কি এখনো জীবিত?

বললাম হ্যাঁ, দেখা করতে যাবে নাকি?

তিনি তো শুনেছি, সিকিমের ভারত ভুক্তির বিরোধী ছিলেন। দুটি ভিন্ন স্বার্থের কি কখনো মিল হয়? সিকিম ভারতের অঙ্গরাজ্য হলে ছো-গ্যাল-কে যে সিংহাসনের অধিকার হারাতে হয়।

ধর্মরাজ দুপের নতুন রাণীর খবর কী?

তিনি তো তাঁর নিজের দেশ আমেরিকা-তেই ফিরে গিয়েছিলেন, তেরোর সালে। তারপর, একসময়, নিজের দেশের কোর্ট মারফৎ বিবাহ-বিচ্ছেদ.....।

কিন্তু কেন?

সেটাই তো রহস্য।

পাপাই এসে হাত ধরে টান মেরে বলে, রাখো তোমাদের রহস্য। দেখে যাও, রাস্তা তো নয়, যেন মেলা বসেছে।

এই মুহূর্তে আরও দু'জন মহিলার কথা

আমার মনে পড়ে। এঁদের একজন হলেন শ্রীমতি এলিজা মারিয়া এবং অন্যজন শ্রীমতি রুথ বারথক। কিন্তু উপায় কি।

হাত কয়েকদূরে রোম কলমাস, কর্মচঞ্চল, প্রশস্ত সড়ক গান্ধীমার্গ। সহরের মার্কেট প্লেস।

কতক্ষণ বিভোর হয়েছিলাম জানিনা। চলাচলে আত্মগতি মানুষের চল, যেন বিরাম নেই। পোশাক ও রূপসজ্জার কত না রকমারী বাহার। সড়কের দু'পাশ জুড়ে জনস্রোত। রাস্তাঘাটে গাড়ির মিছিল। পথচারীদের কলকণ্ঠের সুর ও ধ্বনির ঢেউ ছাপিয়ে নানারঙ, আকার, মেক ও মডেলের বিচিত্র পরিচয়ের গাড়িগুলির দ্রুত ছোটাছুটি ও সতর্কধ্বনি-র মন্ত্র মধ্যেও তার সঙ্গতের অ্যানস্থেটেরথী, ললিত, বিলাসখানি টোড়ি, আশাবরি ও বিলাবল সরগমে মুখরিত রাজপথ।

কত কিসমের গাড়ি, দু'দিক থেকে দ্রুতবেগে এসেই মিলিয়ে যাচ্ছে নিমেষে। মাঝে মধ্যে দু'একটি এসে পার্ক করছে। এগুলির অধিকাংশই প্রাইভেট কার। পলিং-কেন্দ্রিক। হর্নের বিচিত্র মোহনধ্বনি পাপাই-কে মাতিয়ে তোলে। উদ্ভাসিত কণ্ঠে সে ঘোষণা করে চলে সবেগে ধাবমান গাড়িগুলির নাম স্যাণ্ডরোভার, অ্যামব্যাসাডর, প্রিফিয়ার, জোন্সা, মারুতি.....।

দুষ্টুমী করে, আমি-ও সুরমিলিয়ে বলতে থাকি হাওড়াগাড়ি, রাজদূত, প্রধানমন্ত্রী, পাহাড়িয়া, পবন-নন্দন.....।

পাপাই তাৎক্ষণিকভাবে রসিকতাটুকু ধরতে পারে না বটে, কিন্তু বৌদির হাসিতে সন্দিগ্ধ-চোখে তাকায়।

এমন সময় স্বাস্থ্যবান, গৌরবর্ণ তিনজন যুবকের দিকে পাপাইয়ের চোখ পড়লো। পরনে ঝলঝলা জাতীয় হাতকাটা কলমলে লাল পোশাক। শুধু পোশাক-ই নয়, ওঁদের চলন-ভঙ্গিমা ও আচরণ আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। আমরা যে ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে ঐ ফুট ধরেই উত্তরদিক থেকে অনেকটা প্রায় আমাদের কাছকাছি এসেই, সড়ক পার হলেন তাঁরা। লক্ষ্য করলাম ওঁরা মাঝেমধ্যে থমকি থেমে ফিরে দু'চারজন পথচারীর সঙ্গে সৌজন্য বিনিময়ও করছেন।

পাপাইয়ের বিস্মিতকণ্ঠ কানে এলো : দাদু, এরা কারা? কোন দেশের লোক, বলতো?

জবাবে বলি : সম্ভবত : লামা। তিব্বতীয়।

পাপাইয়ের দৃষ্টি তখনো ঐ পথচারী তিনজনের দিকে। সেদিক থেকে চোখ না ফিরিয়ে পুনরায় সে প্রশ্ন করে : ওঁরা এলেন কি করে? তিব্বত থেকে সিকিমে আসার পথতো সব বন্ধ।

কলমাস এঁদের জন্য এমেলেই। ওঁদের মধ্যে কি দামুদরা এখেনে এসেছেন অনেক আগে।

বৌদি বললেন নয়তো ঐ সরকারী অনুমতি নিয়ে এসেছেন। সিকিমে আসতে হলে ভারতীয় ছাড়া আর সকলকেই তো অনুমতি নিতে হয়।

শুধু 'লা' কেন, সবপথেই। —একটু থেমে বৌদি ফের বললেন।

পাপাই বলে : আমাদের স্কুলে যাবার পথে প্রধান-নগর, সেবক রোডের'পর অনুমতি নেবার একটা অফিস আছে।

কলমাস শুধু প্রধান-নগর কেন, কলকাতা, দিল্লী, মুম্বাই, চেন্নাই বিদ্যাকথর থেকে, এমনকি দিল্লীর পঞ্চশীল মার্গ কিংবা কলকাতার রাসেল স্ট্রীট সিকিম পর্যটক তত্ত্বকেন্দ্র এ বিষয়ে যে অফিস আছে, সেখান থেকেও অনুমতি নেওয়া যায়।

বাবুসোনা যে কখন এসে দাঁড়িয়েছে বাবার শিয়রে খেয়াল করিনি। তার গলা শুনে প্রায় চমকে উঠলাম। সে বলছে : এতক্ষণে তোমাদের ও হোটেলে ঢোকার অনুমতি মিলেছে, চলো।

(৯)

বহুকাল থেকেই তিব্বত বৌদ্ধধর্মের দেশ। এখানকার বৌদ্ধরা মহাযানপন্থী। অন্যপন্থীরা হলেন হীনযান। এক সময় অবিভক্ত বাংলাদেশের পূর্বদিকে হীনযান পন্থীদের বেশ পড়ি-বৃদ্ধি ঘটেছিল।

তিব্বতে মহাযান-পন্থীদের মধ্যে মতাদর্শগত ভাঙন ধরলো যখন, তিব্বত থেকে তখন চলে আসতে বাধ্য হলেন 'লালটুপি'-র বৌদ্ধলামা-রা। তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার তাগিদেই গড়ে তুললেন সিকিম রাজ্যটি। এদিকে তিব্বতে রয়ে গেলেন 'হলুদ-টুপি'—পরা বৌদ্ধলামারা।

এই দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যেও, আবার, নানান ভাগ (শ্রেণী) আছে।

তিব্বতের শাসক দালাই লামা। তিনি 'হলুদ-টুপি' পরা সম্প্রদায়ের সর্বেসর্বা। শাসক যখন, রাষ্ট্রের মালিক ও অধিকার, তখন তাঁরই বলবে। 'দালাই লামা' কিন্তু কোন নাম নয়, উপাধি বিশেষ।

'হলুদ-টুপি'-পরা 'গে-লুক-পা'—গোষ্ঠীর লোকের শাসন ক্ষমতা নিজেদের হাত নেবার পর, ধর্মের নামে শাসিত হতে থাকে রাষ্ট্র-টি। পরপর দু'জন ধর্মরাজার শাসনকাল পেরিয়ে তৃতীয় লামা-শ্রেষ্ঠ যখন শাসনভার গ্রহণ করলেন, তখন মঙ্গোল সম্রাট আলতান খাগান তাঁকে 'দালাই লামা' উপাধিতে ভূষিত করলেন।

"দালাই লামা" শব্দ-টির অর্থ হলো 'সাগরের মতো বিশাল'। এই বিশালতা পরিধি বা ক্ষমতার দিক থেকে ; তাঁর উপরে আর কোন শক্তির স্থান নেই।

অন্যদিকে 'লাল-টুপি'-পরা মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের যে লামা-গোষ্ঠী সিকিমে রাজতন্ত্র গড়ে তুললেন, তাঁরা কিন্তু 'হলুদ টুপি'-ওয়ালা সম্প্রদায়ের মত সিকিমের শাসনভার নিজেদের হাতে নিলেন না। একজন পৃথক 'চো-গ্যাল' নির্বাচন করে দেশের শাসনভার অর্পন করলেন তাঁর হাতে।

'চো-গ্যাল'—শব্দটি তিব্বতী, অর্থ ধর্মরাজা।

ধর্মীয় সম্প্রদায়গত দিক থেকে এই বিভাজন সত্ত্বেও কিন্তু দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধের বদলে গড়ে উঠেছে শ্রদ্ধা ও বাৎসল্যের সম্পর্ক। প্রায় আড়াইশ'-বছর ধরে এই সম্পর্ক বজায় ছিল।

সিকিমে যখন রাজতন্ত্রের পতন হলো, তিব্বতের শাসক, তখন, পঞ্চম দালাই লামা। প্রথম নামগ্যাল, মুক্তহস্তে তিনি শুধু মেনেই নেননি, দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে আদর্শ পিতা-পুত্রের সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি-ও দিয়েছেন। 'প্রতিশ্রুতি'-র অর্থ যে 'সত্যার্পন'। ইতিহাস একথা বারবার প্রমাণ করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় চো-গ্যাল, তেন-সুঙ-এর তিন রানী। রাজপরিবারে একাধিক বিয়ে চালু থাকলেও তিব্বতের অভিজাত বংশে পানিগ্রহন ছিলো ঐতিহ্যমূলক। প্রথা অনুসারে ঐ রানী-ই হতেন 'গ্যাল-মো' উপাধি-র প্রকৃত অধিকারিণী। রাজার অন্যপত্নী থাকলেও তাঁরা হতেন শুধু নামে মাত্র রানী। সিংহাসনের উত্তরাধিকার 'গ্যাল-মো'-র পুত্রসন্তান আর কারো ছিলো না। গ্যাল-মো ছাড়া তেন-সুঙ-এর বাকী দুই পত্নী-র একজন ছিলেন ভুটানী, অন্যজন সিকু-কন্যা।

তেন-সুঙ মারা গেলেন। তিব্বতীপত্নী (গ্যাল-মো)-র পুত্র চাগ-দর প্রথা অনুসারে সিংহাসনে বসবেন। স্বভাবতঃ, সিংহাসনের দাবী নিয়ে রাজপরিবারে বিরোধ দেখা দিলো। তেন সুঙ-এর ভুটানী-স্ত্রী, তাঁর কন্যার প্রয়োচনায়, সিংহাসনের দাবী জানিয়ে ভুটানের রাজাকে চিঠি লিখলেন।

এদিকে, তখন, সবেমাত্র চাগ-দর-এর অভিষেক শেষ হয়েছে ; অতর্কিতে ভুটান-রাজ সিকিম আক্রমন করে দখল নিলেন বার-তের-সে।

চৌদ্দ-বছরের তরুণ রাজা চাগ-দর, প্রসাদ থেকে পালিয়ে গেলেন। দুর্গম অরণ্য, পার্বত্যপথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে একদিন আশ্রয় নিলেন লাসা-য় রাজপ্রাসাদে।

গোটা রাজ্য ভুটানের দখলে।

৬ষ্ঠ দালাই-লামা তখন তিব্বতের শাসক। পূর্বসূরীর প্রতিশ্রুতি রাখতে তিনি সিকিম পথহারানো ভুটান-রাজকে লিখলেন : একই ধর্মের অংশগত তিব্বত, ভুটান, সিকিম, পিতা-মাতাও সন্তানের মতো একই পরিবারের সদস্য।

সুদীর্ঘ আটবছর পর কাজিন্‌পত্ত ও তার আশে-পাশে কিছু অঞ্চলবাদে চাগ-দর ফিরে পেলেন তাঁর পুতরাজ্য।

শুধু কি তার গৃহবিবাদ? এর পিছনে ছিলো এক গভীর ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক দুর্যোগ। রাষ্ট্রীয় জীবনে এই দুর্যোগ বুঝি প্রতিপদে। ভুটানের পর দেখা দিলো লিম্বুয়ানা ভীতি। সে ভয়-কে ছাপিয়ে, নতুন বিপদ দেখা দিলো গোর্খা জাতির অভ্যুত্থানে।

গোর্খা-রা যেদিন কাঠমাণ্ডুর নেওয়ার রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে নেপালরাজ্য গড়ে তুললেন, সেইদিন থেকেই সিকিমের রাজনৈতিক আকাশে দেখা দিল এক দীর্ঘস্থায়ী দুর্যোগ।

দ্বিতীয় তুতসো-র সময় থেকেই গোর্খা-রাজা পৃথ্বিনারায়ণের নেতৃত্বে চলতে থাকে হানাদারী ও লুঠতরাজ। নেপালরাজ প্রতাপ নারায়ণের সময় এই হামলা, দখলদারীর পর্যায়ে উন্নীতহয়ে ওঠে। তেনজিং নাম-গিয়ালের সময় গোর্খারা 'ঝরু-থে-সে' দখল করে নেয়। এবার ও তিব্বত তাঁর অভিভাবকত্বের দায় নিয়ে ভুটানের সহায়তায় সিকিমকে বিপদমুক্ত করে।

তিব্বতের সাথে সিকিমের সুদীর্ঘকালের সুমধুর সংস্পর্কে চিড় ধরে বৃটিশদের আগমনে। মিত্রের ছদ্মবেশে বৃটিশরা ক্রমেই সিকিমকে কাঁদে ফেলে তিব্বতের বিরাগভাজন করে তোলে। প্রথমে সিকিমের পর তিব্বতের কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও পরে চূড়ান্তভাবে তিব্বতী-অভিভাবকত্বের অবসানের পরিণতিতে সিকিম হয়ে উঠলো বৃটিশদের সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের অধীন।

আর তিব্বত? বৃটিশদের চোখতাতুর দৃষ্টি যে তার উপর বহুদিন থেকে। সোনা ও নানাবিধ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ তিব্বত। এই দেশটিকে হাতে আনার জন্যই না বৃটিশরা চেয়েছে সিকিমকে তাদের তাঁবে আনতে। প্রথম লক্ষ্য, দার্জিলিংকে কলোনি করার পর তাদের পরবর্তী লক্ষ্য তো এখন পাশাপাশি। এবার?

সিকিম, ভুটান আর নেপাল এই তিনটি দেশের মধ্যদিয়ে তিব্বতে যাবার সবচেয়ে সহজ সুগম-সুরম্যের পথ যে সিকিম। সেই সিকিমে এখন বৃটিশদের আধিপত্য প্রশ্নাতীত।

হায়রে দুর্ভাগা। কী দুর্বিসহই না অধীনতা ও দারিদ্রের অভিশাপ।

রাজনৈতিক দিক থেকে সিকিম বৃটিশদের সংরক্ষণে আসার প্রায় সাড়ে চৌদ্দ বছর পর (১৯০৪ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর), বৃটিশদের প্রত্যর্তিত আক্রমনের পতন ঘটলো স্বাধীন তিব্বতের। বিজিত তিব্বত শাসক, যিনি একাধারে প্রধান ধর্মগুরু (দালাই লামা) বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে সন্ধি-চুক্তি করতে বাধ্য হলেন।

সেদিনের সেই বৃটিশ অভিযানে লেপচা ভুটিয়া ও নেপালী কুলিরা অজান্তেই নিজেদের অভিভাবক-রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে আত্মবিক্রয়ের অজ্ঞাতাষ্ট্রী হয়ে গোটা বৃটিশ-বাহিনীর যাবতীয় রসদ ও যুদ্ধ উপকরণের বোঝা নিজেদের পিঠে চাপিয়ে হিমালয়ের দুর্গম চড়াই ঢাকা দুর্গম পথপাড়ি দিয়েছিলেন।

রাজতন্ত্রের অধীনে সুদীর্ঘকালীন বঞ্চনা, শোষণ ও নিষ্পীড়নের এই কলঙ্কময় ঐতিহাসিক পটভূমিকার উপর দাঁড়িয়ে এই কুলিরাই আধার তার প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর পথ সংগঠিত করলেন 'কালো-ভারী আন্দোলন'।

(ক্রম)

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনাতে চিন্তাসূত্র ফিরে আসতেই, মনে একটু স্বস্তির আবহাওয়া ফিরে এলো বুঝি ; আর, তখনই হঠাৎ কী মনে হতেই বৌদিকে প্রশ্ন করি : আচ্ছা, তুমি তখন মার্কিন সুন্দরী প্রসঙ্গে ভুলেছিলে না? আমি 'রহস্য'-বাসই ইতি টানতে বাধ্য হয়েছিলেন।

'রহস্য'-টা কি জান? মিস্ হোপকুক্-এর সাথে মৃতমার মহারাজ কুমারের সাক্ষাৎ বিশেষ এক পরিস্থিতিতে। তখন ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ চলছে। সময়টা'৬২-র ডিসেম্বর। স্থান: দার্জিলিং-এর এক নামী হোটেল। মেশে তখন জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়েছে। সিকিমের সাথে চুক্তি-র সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন। পিছিয়ে গেছে'৬২র রাজ্যপরিষদ নির্বাচন (তৃতীয়-নির্বাচন)।

হঠাৎই আবার প্রশ্ন করে বসি : তুমি শ্রীমতি এলিনা মারিয়া-র নাম শুনেছ, নিশ্চয়ই। মিস্ হোপকুক্-এর মতো উনিও একজন বিদেশিনী। অথচ, দুজনের মধ্যে মত ও পথের ফারাক না কারাক।

বৌদি বললেন : কাজী-সাহেবের স্ত্রী ; উনি কি এখনো জীবিত? হ্যাঁ ; থাকবেনও চিরকাল। সিকিম-রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠান আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর নাম চির-ভাস্বর হয়ে থাকবে।

বৌদি বললেন সমসাময়িক আরও একজন মহিলা ছিলেন, যিনি নিজেকে 'লেপচা-রানী' বলে পরিচয় দিতেন এবং শুধু লেপচাদের নিয়েই একটা পৃথক রাজনৈতিক দলগড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন লেপচাদেরই একমাত্র রাজা হবার অধিকার আছে। তাঁরাই হলেন এদেশের আদি বাসিন্দা। তাঁরা শুধু তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিতই হননি, হয়েছেন ভুটিয়া-রাজতন্ত্রের শোষণ ও নিপীড়নের শিকার।

প্রকাশ্যে বলি : তিনি তো কারাগারে দণ্ডিত হন এবং'৬৮-তে মুক্তি পাবার পর, সিকিম ছেড়ে চলে যান।

বৌদি বললেন তাঁর বিরুদ্ধেও তো বাইরের কোন গোপন শক্তির মদতি-যাঁতাতের অভিযোগ উঠেছিল।

কথা বলতে বলতে হোটেলে পৌঁছোলাম কটে, আমার মাথায় একরাশ চিন্তার জট। অসম্পূর্ণ চিন্তার জটগুলোনিয়ে দপদপিয়ে উঠছে রগের শিরাগুলো।

এতক্ষণে বিশ্রাম নেবার সুযোগ পেয়ে বৌদি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন বাব্বা! বাঁচলুম যেন।

হোটেলের নাম অর্কিড।

স্ক্রীন্ সরাতেই চোখ্‌টি বুজি জুড়িয়ে আসতে চায়। মন ভরে উঠতে থাকে আনন্দে।

কী অপরূপ দৃশ্য।

পাপাই উচ্ছ্বসিত আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে ওরাওনেকুল্।

সত্যি-ই তাই। এই মুহূর্তে ঐ একটিমাত্র শব্দ ছাড়া অন্যকোন ভাষ্যে, এই সৌন্দর্যের ফর্মন দেবার সাধ্য আমারও নেই। মাথাটা হাল্কা হয়ে আসছে। মনে হতে থাকে : এবার বুঝি চিন্তার জটগুলো খুলে যাচ্ছে একে একে। চেয়ারে এসে বসতেই মন ওঠে গুণগুনিয়ে

".....ভাষার অতীত তীরে কাজল নয়ন মেঘে
যায় হতে আসে ফিরে ফিরে।"

(ক্রমশঃ)

ছায়া সরে যায়

দেবব্রত বিন্দু

স্বাতী হন্তদন্ত হয়ে এন আর এস-এর গেটের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল। ঋতুকে দেখতে না পেয়ে এগোল সোজা মর্গের দিকে। ফিজিওথেরাপী ডিপার্টমেন্টের সামনেই দেখা হয়ে গেল ওদের সঙ্গে। একটা ছায়া দেখে ওরা বসে আছে। রঞ্জনাদি, শৌভিক, নন্দিতা, বিজন।

বিজন হাত নেড়ে অনুচ্চ স্বরে বলল,

—বস চিনুবার দাদারা এস. এস-এর ঘরে গিয়েছেন।

—আজ তো রবিবার। বডি পাওয়া যাবে? স্বাতী খুব আস্তে জিজ্ঞেস করল।

—কোন এক এস. সি-র সঙ্গে পার্টির আছে চিনুদার সেজদার। বসছে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে।

শৌভিক সামনে ঘাসের ওপর আসতো চাপড় মেরে বলল, বস এখানে। অপূর্ব এসে না?

—মা ও বাবাকে গেছে। কাল ফেরার কথা ছিল। ফেরেনি, মাটিতে বসতে বসতে স্বাতী জিজ্ঞেস করে—

—কি ব্যাপার শৌভিক দা। আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না।

—কি বিশ্বাস করতে পারছিস না? চিনু সত্যি ট্রেনে কাটা পড়ল না ট্রেনের তলায় মাথা দিল?

একটু থেমে, আরও চাপা গলায় বললো,- জানি না। কেউই বোধ হয় জানে না।

অদূরে একটা শিউলি গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে বিজন। দুজনে মিলে ওরা এই ব্যবসা শুরু করেছিল।

চিনুর দাদারা ফিরে এলো। ব্যবস্থা সব হয়ে গেছে। কাটা-ছেঁড়াও কমপ্লিট। একটু বেশি টাইম গেল। দুটির দিনে তো ডেড বডি পাওয়া যায় না। পুরো একের পিঠে তিনটে শূণ্য। প্লাস একটা বাস লাগাতে হয়েছে।

মেরা মর্মিতির ঘরগুলা একটা স্তব্ধতা উপস্থিত। চিনুকে তার মধ্যে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিষ্কার একটা সাদা চাদরে ঢাকা শরীর—সবই যেন ঠিক আছে। যন্ত্রণা অসহ্য যন্ত্রণায় স্তব্ধ হয়ে। আমাদের চোখেই জল। বন্ধনা অসহ্য যন্ত্রণায় স্তব্ধ হয়ে। স্বাতী খুবই ভেঙ্গে পড়েছে। আমরা সবাই

পেছনে একটা ভ্যান গাড়িতে উঠলাম। আরও দু'তিনটে গাড়িতে বাকিরা আসছে। বডি প্রথমে বাড়ি যাবে—তারপর ক্যাওড়াতলা শ্মশানে।

চিনুর মৃত্যু কি দুর্ঘটনাজনিত? না ইচ্ছাকৃত? এ প্রশ্ন উপস্থিত সকলকেই ঘুরে ফিরে যাচ্ছে। ঘটনাটা যা শোনা গেছে তাতে এমন সাংঘাতিক পরিণতি না হবারই কথা। সকলেই নিরাপদ দূরত্বে চলে যেতে পারল আর একা চিনুই শুধু চলন্ত গাড়িতে ধাক্কা খেল। পার্ক সার্কাস স্টেশন থেকে লাইন ক্রশ করে ওপাশে যেতে গিয়ে হঠাৎই দুদিক থেকে গাড়ি এসে পড়ে চিনু তার মধ্যে পড়ে ধাক্কা খায়। কিন্তু এটা তো একটা সাধারণ স্টেটমেন্ট। ঘটনা কি সত্যিই তাই?

চিনুর একান্ত কাছের লোক যারা তাদেরই শিষ্ট করেছে এই রহস্যময় পরিস্থিতি। যদি দুর্ঘটনা মৃত্যুর কারণ না-হয় তাহলে কি কারণ? প্রশ্নগুলো স্রোতের মত তীব্র কাঁপুনি দিয়ে এই প্রশ্ন গুলোর সকলকেই স্পর্শ করে যায়।

২

স্বামীর কথা

একটু আগে চিনুদার বাড়িতে এসে আমরা পৌঁছেছি। কাঁচের দেওয়ালের ভেতর সাদা চাদরে ঢাকা শুয়ে আছে চিনুদা। কপালের ওপর চুল এসে পড়েছে। চোখ বুজে ঘুমচ্ছে। একটু ভ্যাবাটে ভাব এসেছে মুখে। তা নয়তো সব ঠিক আছে। মর্গ থেকে সোজা এসেছে বাড়িতে। কান্নার রোল। চিনুদার বৌদি চিনুদার ছেলেকে কোলে নিয়ে এসেছেন। "বাবাকে প্রণাম করো" বলতে বলতেই নিজে কেঁদে ফেললেন তিনি।—বাবাকে ওর ভেতরে শুইয়ে রেখেছে কেন? শিশুর এই অবোধ উচ্চারণে কান্নার শব্দ বাড়তে থাকে। রঞ্জনা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল, এই প্রথম থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে, হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল। নন্দিতা, স্বাতী তাকে ধরে পাশের রুমে শুইয়ে দিল।

চিনুদার মৃত্যু আমার কাছে যেন কেমন অদ্ভুত লাগছে। অসম্ভব মানুষটা কাল ছিল আজ আর নেই—এটা ভাবতেই আমার অবাক লাগছে। চিনুদার মৃত্যুর জন্য কি আমার কিছু দায় আছে? একটা অপরাধবোধ আমায় পীড়ন করতে থাকে।

এই চিনুদাই ছিল একদিন আমার প্রিয়তম ব্যক্তি। কিন্তু চিনুদার পছন্দ ছিল রঞ্জনাকে। চিনুদার থেকে বয়সে দুয়েকের মিনিয়র। অত্যধিক মদ্য। ওর কথা শুনলে চমকে উঠতে হয়। বলতো "তোরা সব বিয়ে বিয়ে করিস, একটা স্ত্রীতার তেলায় দম থাকা থাকে?" ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মোক করতো। মেয়ে বন্ধু ছিল না বললেই চলে। সেই রঞ্জনাদিকেই পছন্দ করলো চিনুদা।

আমি অপূর্বকেই বিয়ে করলাম।

কালকেই চিনুদার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। দুপুরের দিকে এসেছিল। খেয়ে দেয়ে সবেমাত্র কাগজটা নিয়ে বসেছি চিনুদা এসে হাজির। দরজা খুলেই চিনুদাকে দেখে আমার অবাক লেগেছিল। কিন্তু সত্যি একটা ভাল লাগাও ছিল। নিরালা দুপুরের ভাললাগা-বার মধ্যে হাতছানি আছে।

চিনুদা হৈ হৈ করতে করতে ঢুকে পড়লো। হাতে একটা কাগজের মোড়ক। টেবিল করে টেবিলের ওপর রেখে বলে উঠলো-আজ দারুন সেলিব্রেট করব। তুমি দুটো গ্লাস নিয়ে এস।

—কি ব্যাপার বলতো? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, -গ্লাস কি হবে? কাগজের মোড়কটা খুলে দেখি বিদেশের বোতল। আমি জোরে টেবিলের ওপর ওটা রেখে দিয়ে বললাম,—তুমি এসব নিয়ে এখানে এলে কেন? না, না এটা ঠিক নয়। এটা তুমি ঠিক করো নি।

—আরে মুর্খ। খবরটার প্রতিটি জানো? তুমি আগে গ্লাস আনো। এমনিতে আনতে গিয়ে কে দেখে ফেললো কে দেখে ফেললো করে থানা। তা ওপর তুমি আবার ভ্যানতাড়া ভাঁজছ।

আমি ক্ষুব্ধ মনে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও রান্নাঘর থেকে একটা গ্লাস এনে রাখলাম।

—আরে একটা কি হয়? এই প্যাকেটে ফিস ফিংগার আছে। এসব কি আমি একা খাব নাকি?

১ —চিনুদা তোমার আওজান লোপ পাচ্ছে। আমার ছেলে বাড়িতে। তাছাড়া এসব আমার ভাল লাগে না।

—অপূর্বর ফেরার কথা ছিল। রাত্তেলটা আসে নি।

—না ফোন করেছিল, দু-তিনদিন দেরি হবে।

—যা শালা আমি তো ভেবলুম ও এসে যাবে। যাক্‌গে। শোন, ছেড়ে খবর—। পকেট থেকে একটা খাম বের করে আমরা হাতে দিয়ে বলল-পড়।

চিনুদার কথাবার্তা, এ্যাপিয়ারেন্স আমাকে বিমোহিত করে। কিন্তু বিরাটের ছোতল হাতে চিনুদার প্রবেশকে আমি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারছি না। বিরক্তির সঙ্গে খামটা খুলে পড়ি। পড়তে পড়তে আমি সব ভুলে যাই। আনন্দে চিৎকার করে উঠি—চিনুদা সত্যি। গ্রেট। কবে জয়েন করতে হবে? এটা কি তোমার অফিসেই?

—তবে? এতক্ষণ তো গোমরা মুখে ছিলে। বল এটা সেলিব্রেট করার দিন কি না। অপূর্বটা হলে জমতো ভাল। সে না হয় আর একদিন হবে। এ্যাকচুয়ালি তুমিই তো কেস্ত। নাও বলে গ্লাসটা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে চিনুদা বোতলটা ধরেই চুমুক দিল।

—আমার অফিসেই, কিন্তু আমার ডিপার্টমেন্টে নয়। পানীয়টা মুখে ঢেলে, হাত দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে বলল চিনুদা। —এটা ক্রিস্টিটারের ডিভিশনে। আর ইউ প্রিজড?

—ইয়েস। সারটেনলি; তোমায় কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব—

—না না ধন্যবাদ ধন্যবাদ কিসের? স্বাতী ভাবীকেও আমি ভুলে যাই নি। এখন আরও বেশি করে মনে পড়ে। তোমার জন্যে কিছু করতে পেরে আমি সুখ পাই—গভীর সুখ। নাও খাও।

—চিনুদা প্লিজ—

চিনুদা আমার মুখের দিকে তাকাল। কেমন করুণ, অদ্ভুত ভাবভাব চাউনি। আমি বললাম, -বেশ তুমি কিছুটা ঢেলে নাও। আমি জাস্ট একটা চুমুক দেব।

—ঠিক আছে তুমি আগে চুমুক দিয়ে নাও। চিনুদার সেই গাঢ় উচ্চারণে কি ছিল আমি জানি না, আমার কেমন একটা অনুভূতি হল। আমি গ্লাসটা আলতো করে চুমুক দিয়ে টেবিলে রাখতেই চিনুদা পরম যত্নে দীর্ঘক্ষণ ধরে পান করতে থাকল। পুরোনো স্মৃতি দরজায় আমার আঘাত করছে তখন। চিনুদাকে ঘিরে আমার কি প্রত্যাশাই না ছিল। এমনই যত্নে আমি দীর্ঘ অপেক্ষা করছি চিনুদার এক চিলতে হাসির জন্যে। চিনুদা আমায় প্রত্যাখান করে ছিল।

সময় চলে যায়। ঘুটে বেজে গেছে। চিনুদা উঠে পড়ে। নিস্তব্ধতা ভেঙে যায় চিনুদার কণ্ঠস্বরে।

—সাইনড্ মানে সোমবার। চারদিন বাকি। তার মধ্যে আমি আবার আসব।

—এস। আসবে কিন্তু। অবশ্য সোমবার আমি ঠিক চলে যাব।

—নো, নো। প্রথম দিনটা আমিই তোমাকে নিয়ে যাব। উড ইউ মাইন্ড?

—কি যে বল তুমি। আমি চিনুদার হাতটা ধরে টান দিই। —এতে মাইন্ড করতে যাব কেন?

চিনুদা আমার হাত-হাত জড়িয়ে দু'কাঁধে হাত রেখে গভীর দীর্ঘ লয়ে উচ্চারণ করে—স্বাতী, আমি চলি। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে চিনুদা আবার, বলে—স্বাতী, আই হ্যাভ লস্ট এভরিথিং। উড ইউ কাইন্ডলি গিভ মি এ কিস?

চিনুদার দিকে তাকিয়ে আমি কেমন হয়ে যেতে লাগলাম। আমার ঠোঁটদুটো ভূকম্পনের মত

চেয়ে থাকে চিনুদার চোখের দিকে। আমি একটা হাত দিয়ে চিনুদার গালটা আলতো করে ধোলাতে থাকি। আমার বুকের মধ্যে অজস্র নূপুরের শব্দ। একটা নরম মধুর আস্বাদের জন্য আমার মুখ উন্মুখ। আমার দু'হাতের তালুতে অবদ্ধ তখন চিনুদার মুখ। চঞ্চল ওষ্ঠদ্বয় সবে তখন দুর্ধর্ষগতি—হঠাৎই নজর পড়ল রাতুল এসে দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। পেন্সিল হাতে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। আমি ঘুমুচ্ছিই, দুর্বলতা ঝেড়ে একটু জোরেই বলি,—চিনুদা বজ্ঞ বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে—ব্রিজ আউট।

কামার আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আমি রাতুলকে বুকে নিয়ে সোফায় বসে পড়ি। চিনুদা কখন চলে গেছে বুঝিনি। হঠাৎ খেয়াল হল দরজা খোলা, চিনুদা চলে গেছে। তারপর এই কদর। কিছুদিন যাবৎ-ই চিনুদা কেমন হয়ে গিয়েছিল। একটা কষ্ট তার শরীর জুড়ে ছায়া ফেলেছিল। কিন্তু কেন সেই কষ্ট কেউ নির্দিষ্টভাবে জানে না। বা যে জানে সে বলছে না।

সত্যিই কি তুমি গাড়ির সামনে পড়ে লাইন রেল লাইনে ক্রস করতে পারলে না। —না চাইলে না। কে আর বলতে পারবে সে কথা। আমার গুপ্তর অভিমান নিয়ে চলে গেলে। আমি জানি অন্যত্যাশিত অপমান তোমায় বিঁধেছিল। লজ্জা-ঘৃণা অপমান.....।

৩

শৌভিকের কথা

চিনুদের বাড়ি থেকে গাড়ি কেওড়াতলার দিকে যাচ্ছে। আরও একটা অ্যাম্বুলেন্স ছুটছে আমাদের সঙ্গে। রত্নাকে বাড়িতে রাখা গেল না। চিরকালই ও জেদি। নিয়মের তোয়াক্কা করে না। আমার স্বামীর শোক যাত্রায় আমি যাব না, আর পাঁচজন যাবে। না শৌভিক তা হবে না। সে শুধু আমার স্বামী নয়, তোদের মত আমারও বন্ধু।' —আমি মনে মনে ভাবি এসব বক্তিমে কোথায় ছিল চিনু। এখনতো খুব ওগরাচ্ছে।

চিনুর পরিণতি এমন ট্র্যাজিক হবে সেটা আমি ভাবিনি। ওকে একটা উচিত শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম—কিন্তু মৃত্যু তো চাই নি। আমার আবাল্য ঘনিষ্ট বন্ধু চিনু। কিন্তু আমার কথা দেখিয়ে চলে গেল।

পরশু রাতে সে এসেছিল আমার কাছে। বহুদিন পর। চিনুর এই দীর্ঘ অনুপস্থিতি আমাদের জীবনে স্বাভাবিক ছিল না। আমার কোন নন্দিতা দরজা খুলে দিতে এসে প্রথম পাঁচকড়ালে ওকে। নন্দিতার সঙ্গে কিছুক্ষণ খুনসুটি করে তাকে চা আনতে পাঠাল। নন্দিতা চলে যেতে আমি বললাম,—কি ব্যাপার এত রাতে। আর সত্যিই তুই এলি অনেকদিন পর।

—দরজাটা বন্ধ করে দে। কথা আছে। চিনু গম্ভীর সুরে বলল।

আমি দরজা বন্ধ করে চেয়ারে এসে বসলাম। ওপাশের সোফাটায় বসল চিনু। আমার দিকে একটা চিঠি এগিয়ে দিয়ে বলল-পড়। আমি নির্লিপ্তভাবে চিঠিটা নিয়ে চোখ বোলালাম। একটা শেষ-কথা লেটিস, চিনুর লেখে। কাগজটা চিনুকে ফিরিয়ে দিলাম কোন কথা না বলে।

—এই অপরাধে ওরা আমাকে সাসপেণ্ড করে চার্জশিট দিতে পারত। আমার পাষ্ট-রেকর্ড, আমার সার্ভিস টু দা ব্যাঙ্ক তার হাত থেকে আমায় বাঁচিয়েছে। আমি জবাব দেবার জন্য সাতদিন সময় চেয়েছি।

—কেস টা তো আরও বেশি সাবধান হওয়া উচিত ছিল। আমি বললাম, এ ব্যাটারা তো বদ, ঠগ। পারে না এমন কোন কাজ নেই। চিনু কিছুটা আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকায়। বলে-কি বলছিস তুই। আমি ওদের প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছিলাম। তুই তো রেকর্ডেও করে পাঠালি।

—আরে সে তো-একজনকে চিনতাম ওর মধ্যে, তার রিকোয়েস্টে।

—সেটা ভেবেই আমি দ্বিতীয়বারও ডিক্টিউড করি, কিন্তু তুই পারসোনালি এসে দেখা করে এটা করে দিতে বলেছিলি। বলেছিলি, তোর একটা প্লাটি পাওয়ার সুযোগ আছে। এরা লোক ভালো ও বাজারে সুনাম আছে। তোদের পাড়ারই কেস। প্রমোটার, বাড়িওয়ালা উভয়কেই তুই ভালোভাবেই চিনিস। কোন গণ্ডগোল নেই। তুই আমাকেও একটা ফ্লাট নেবার কথা বলেছিলি। আমি অবশ্য নেগেটিভ করেছিলাম। এসব কথা ভুলে গেলি কি করে?

—ভুলব কেন। সে হতেই পারে। কিন্তু তুই তো অফিসিয়াল এ্যাপ্রোচমেন্ট দেখে নিবি না কাকে লোন দিচ্ছিস? একজন একটা আমি বেরিয়ে ডেভালপমেণ্টের জন্য আট লাখ লোন চাই তুই দিয়ে দিবি। প্রপিজালটও দেখবি না ভাল করে?

—শৌভিক আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, এসব কথা এখন উঠছে কেন? আগে একবারের জন্যেও তুলিস নি। ব্যবস্থা তো আমি করেছিলাম। সরাচিং করতে গিয়ে মালিকের এক দূর সম্পর্কের ভাইয়ের সন্ধান পাওয়া যায় যে খুচখাচ কোর্ট কাছারি করেছে। কিন্তু প্রমোট নিতে পারেনি বলে ট্রাস্টির বিরুদ্ধে টাইটেল সুট করতে পারেনি। তবে সে অমেলন করতে পারে। তোকে আমি জানিয়েছিলাম। তুই একজনকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিলি এই সেই ভদ্রলোক। ও কোনও অবজেকসন রেইজ করবে না। সেই মতো একটা অ্যাডারটেকন দেয়। আমি বিশ্বাস করেছিলাম—কারণ তুই নিয়ে এসেছিলি বলে। সেই লোকটা আসল লোক ছিল না। একজন সাজানো ব্যক্তি। পরে আমি জেনেছিলাম। —বা। বা! এখন আমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছিস। অফিসিয়াল প্রসিডিওর না মেনে তুমি টাকা দেন বিলে—নাম্বিটা আমার কাঁধে এসে পড়ল—যেহেতু আমি রিকোয়েস্ট করেছিলাম।

—শৌভিক। তোর কথাবার্তাও আমার শরীরের ভেতর কেমন করছে। আমার বিশ্বাস, নির্ভরতা, প্রীতি সব ধোঁয়ার ধোঁয়া হয়ে ঘর আটকে দিচ্ছে। তোকে লোকাল ইনভেস্টিগেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। স্ক্যাম তুই নিজেই মিয়েছিলি। সে রিপোর্টেও তুই লোন দেবার ফেবারে সাজেশন দিয়েছিস। তুই আজ এরকম টেরাবাঁকা কথা বলছিস কেন? ব্যাঙ্ক কিন্তু তোকেও ছাড়বে না।

—তুই আমায় ফাঁসালি। আমার ইনসপেক্টর যে রিপোর্ট আমার তৈরি করে দিয়েছে আমি তার বেসিসেই সাজেস্ট করেছি। এতে আমার অন্যায়টা কোথায়। আর আমার ওপর কিছু হলে আমি কারুর বাড়ি গিয়ে উপায় খুঁজবো না। নিজেকে বাঁচাবার ক্ষমতা আমার আছে।

—ও। আচ্ছা। তুই আমার চলে যেতে বলছিস? আমি তোর সঙ্গে কথা বাড়াতে আর চাই না। তুই এত নীচ হয়ে গেলি কবে থেকে আমি বুঝতে পারছি না। ঘুষটা তোর সঙ্গে কেস কিছুদিন ধরেই তৈরি হয়ে গেছে। আমার বিজিওন্যাল ম্যানেজার হওয়ার পর তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। তারপর অফিসার্স এসোসিয়েসনের এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ইলেকটেড হবার পর তুই একদম ফেসে গিয়েছিস।

—যা, যা, এসব কোনদিন আমি ভাবি না। ইগো কমপ্লেক্সে ভুগছিস তুই। আমার হাত ধরে চাকরিতে আসা। আমার সূত্র ধরে এ্যাসোসিয়েসনে ঢুকেছিস-সেই আমাকেই ল্যাঙ মারতে, তামিল্য করতে তোর বাধে-নি।

—এইসব অদ্ভুত চিন্তা তোকে পাগল করে তুলেছে। আমি জীবনে এসব ভাবিনি। শুধু তোর জন্যে, তোর সঙ্গে আমার পূর্বের সম্পর্ক ফিরে পেতে আমি সমস্ত পোস্ট থেকে রিজাইন করতে পারি। তুই চাস?

—এসব বড়বড় স্টেজ মাতানো কথা আমার কাছে কাড়বি না। তারপর গলাবাজিরে সকলকে বলবি। আমি তোকে চিনি না।

—আশ্চর্য! তুই একদম পাল্টে গেছিস। যাকগে সেসব কথা। তুই অন্তত অরিজিনালে ডিফটো জমা দে। সাত দিনের মধ্যে এটা জমা দেবার কথা ছিল।

—সে আমি কোথায় পাব এখন? ঐ সেকশনগুলো সব চিট। এরা ফিসীমানায় নেই। সে জোগাড় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—তার মানে তুই কি আমায় ফাঁদে ফেলার জন্য এসব করেছিস নাকি? তোর কথাতেই আমি অরিজিনালের ডিফল্ড ছাড়া টাকাটা স্যাংসেন করলাম। তুই কথা দিলি সাত দিনের মধ্যেই দিয়ে যাবে—তুই নিজে সঙ্গে এসে দিয়ে যাবি। আর তুই আজ আমার এই বিপদের সময় হাত তুলে নিচ্ছিস?

—সে ওরা খুব বলেছিল বলে আমি তোকে অনুরোধ করেছিলাম। তার মানে আমার ঘাড় নাকি? তুই ব্যাঙ্কের ইন্টারেস্ট না দেখে টাকা স্যাংসেন করলি, দায়িত্বটা আমার হল?

—পৌত্তিক আমি কখনও ভাবিনি তুই আমাকে ঠকাবি। এতবড় চক্রের মধ্যে তুইও একজন। একুশ কাঠা প্লটের ওপর একটা মাল্টিস্টোরিড হবে। সমস্যা যা আছে মিটে যাবে। শুধু আমার জন্য মেটিরিয়ালাইজ করছে না। তোরও একটা ফ্ল্যাট পাবার সুযোগ আছে। এসব কথা তুই আমার বাড়িতে এসেও বলেছিস। মল্লারও শুনেছে। আজ সব ভোঁ ভাঁ। আমার এত বড় বিপদেও তুই আমার পাশে দাঁড়াবি না। আমাকে ওরা জেলে দিতে পারে আমার নির্বুদ্ধিতা কোন দোষ ছাড়া।

—তারজন্য আমি তো দায়ি নই। এরকম ভুল সামান্য ভুল নয়। এদের সঙ্গে ব্যবসায়িক, আর্থিক লেনদেন না থাকলে এটা কখনই সম্ভব হত না।

—পৌত্তিক স্টপ ইট। আমার সিনিয়ররা পর্যন্ত এই ঘটনার পরও এই শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারেন নি। তারাও ভাবছে এর পিছনে কোন রহস্য আছে। আমি যা শুনেছি তাহলে তা ঠিক। আট লাখ টাকার মধ্যে তোকেই ওরা দিয়েছে খুশদখ। তুই এই আরগ্রুভ নেগেছিস। ছি ছি।

—আমি কি আরগ্রুভ নেগেছি না নেগেছি তা নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। তুই তোর চরকায় তেল দে।

—পৌত্তিক, এ তুই কি করলি? আমার মান, সম্মান, প্রতিপত্তি সব যাবে।

এবার চিনু ভেঙে পড়ল। তুই যে আমার ছোট বেলার বন্ধু। তুই এ কাজ করলি। বিশ্বাস ভালবাসা সব শেষ হয়ে গেল। তাহলে আমি বাঁচব কি নিয়ে। এই বলতে বলতে চিনু হঠাৎ সোফা থেকে উঠে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। আমার বুকের মধ্যে দম আটকানো যন্ত্রণার কেবল বাজতে লাগল 'তুই একাজ করলি'।

স্কুল থেকে আমার একসঙ্গে পড়েছি। একই পাড়ার বাসিন্দা। চিনু চিরকালই খুব ভাল ছেলেদের দলে। ভাল ক্রিকেট করত। আবৃত্তি করত। মনটা ছিল উদার। বন্ধুদের প্রতি সহানুভূতিশীল। কলেজের সিলেবাস পরিবর্তনের আন্দোলনে আমি আর ও আরও কাছাকাছি আসি। ওর জনপ্রিয়তা আমার ঈর্ষার বিষয় ছিল। তবুও ছিলাম অন্তরঙ্গতম বন্ধু। পাস করার পর আমি ব্যাঙ্কের পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাই। ও কিছুতেই চাকরি করবে না। এম. এ পড়তে গেল। কলেজে পড়াবে—এই ওর মোটো ছিল। ওর বাড়িতে অভাব ছিল খুব। ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, আমি ফর্ম কিনে এনে ফিলআপ করে ব্যাঙ্কের পরীক্ষার পরের বারে বসিয়েছিলাম। চিনু ভাল রেজাল্ট করে চাকরি পেল। চাকরিক্ষেত্রে ওর কৃতকার্যতা আমাকে অতিক্রম করে যায়। আমি যখন সিনিয়র পারসোন্যাল অফিসার ও তখন রিজিওন্যাল ম্যানেজার হয়ে গেছে। আমি কিছুতেই এটা সহ্য করতে পারিনি। মনে মনে চেয়েছি ওর এমন একটা ফল্ট ধরা পড়ুক যাতে চাকরী জীবনে ও বেইজ্জত হয়ে যায়। কিন্তু তা কখনও ঘটে নি। ও ছিল সততার প্রতিমূর্তি। এ বাজারে এসব চং একেবারেই অচল। কিন্তু কে সেটা ওকে বোঝাবে। ইতিমধ্যে আমার বাবার হল কার্সিনোমায়। টাটায় পাঠাতে হবে। পাঁচ-ছ' লাখ টাকার প্রয়োজন। কোথায় পাব। চিনু লাখ খুরেক টাকা জোগাড় করে দেবে বলেছিল। কিন্তু আমি চাইনি এ ব্যাপারেও সে আমাকে টেক্কা দিক। এমন সময় মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিং—এর কেসটা আমার কাছে এল। আমার পাশের রাস্তার জমিটা। একটু মিটিগেসন আছে। কিন্তু তা আদৌ কঠিন কাজ নয়। একজন প্রমোটার আর আরগ্রুভের বর্তমান মালিক ট্রাস্টি বোর্ড—উভয়েই আজকে ধরেছে। ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে তারা জমিটা ডেভালপ করবে। মানে ফ্ল্যাট আনবে। আমাকে একটা ফ্ল্যাট দেবে। লাখ তিনেক টাকাও দেবে যদি সেলটা আমি যদি করে দিতে পারি। আট লাখ টাকার মধ্যে তিন লাখ আমার দিয়ে জমিতে ডেভলপমেন্ট করবে কি দিয়ে। অতশত আমি ভেবে দেখিনি। আমার কাছে তখন টাকার দরকার। এই প্রলোভনে আমি পা দিয়ে দিই। এদের সমস্ত কারবারটাই যে জোচ্চুরি সে বুঝেছিলাম পরে—তখন ফিরে আসার কোন রাস্তা নেই। চিনুকে সহজে কাত করা যাবে না। শুধু আমাদের বন্ধুত্বের খাতিরে, সে আমার কথার ওপর বিশ্বাস করে এই লোন করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ওরা প্রতারক। টাকা হাতে পেয়েই কাটবার ধান্দায় ছিল। আমি কোন রকমে দু'লাখ টাকা রাখতে পেরেছিলাম। তারপর তাদের আর পাত্তাই দেখেনি। ট্রাস্টিতে একজনই ছিল সর্বেসর্বা। এই সময় সে হঠাৎ মারা গেল। ফলে কাউকেই আর ধরা ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া গেল না। সবই ছিল বেনামী। ব্যাঙ্ক খোঁজ করেও তাদের সন্ধান করতে পারেনি। দলিলের জেরক্স কপিটা জমা রেখে চিনুকে বলেছিলাম সাত দিনের মধ্যে অরিজিন্যাল দলিল জমা দেব—সে শুধু ওদের কথায়। কিন্তু ওদের পাত্তা নেই। দলিল কোথায় পাব?

আমি জানি চিনুকে বিনা অপরাধে চাকরী হারাতে হবে অবশ্য দূর কোন রাস্তে ট্রান্সফার হয়ে যেতে হবে। অফিসার্স এসোসিয়েসন ওর হয়ে লড়বে। কারণ ওর মধ্যে কোন ঘুনীতি আছে পারে এটা কেউ বিশ্বাস করে না। আমিও জানি ও নির্দোষ। একথা আমি পাঁচজনের সামনে বলতে পারব না। মনে মনে বলি। কিন্তু সেই যন্ত্রণায় ও আত্মহত্যা করল। রেলে কাটা পড়ল। ওর কাছে আমার ক্ষমা চাইবারও অবকাশ রইল না।

৪

বিজনের কথা

ধীরে ধীরে শ্মশানের প্রায় কাছে এসে পড়েছি আমরা। আমাদের পেছনে বিরাট শোকযাত্রা। শারিবদ্ধ মানুষ, যুকে তাদের কালো ব্যাজ। নীরবে চলেছে। চিনুদাকে শেষ বিদায় জানাতে। সবাই মনে করে নিয়েছে এটা একটা দুর্ঘটনা। কিন্তু আমি জানি এটা দুর্ঘটনা নয়। চিনুদার ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়নি। ট্রেনের তলায় চিনুদা নিজেকে ফেলে দিয়েছে। আত্মহত্যা।

ঘুম থেকে উঠেই বাতস্থ হতে একটু সময় লাগল। কি এমন হয়েছিল? দেনা তো মানুষ মাত্রেরই হয়। বিজনেস করতে এসে রিস্ক তো নিতেই হবে। লোকটা সত্যিই এ বাজারে চলে না। একেবারে পাগল। মাঝে মাঝেই বলত ব্যবসাটা আমার জন্য নয়রে। কল্পনার জাঁহাটা একেবারে বকে যাচ্ছে। তোরও অবস্থা খুব খারাপ। তোদের দু'জনকেই একটা কাজে লাগিয়ে দেওয়া। এ বাজারে কে কার জন্যে ভাবে। যারা ভাবে তারা অবশ্যই সাধারণ স্তরে বুদ্ধির বাহিরে। পাগল ছাড়া আর কি? অপদার্থ।

চিনুদা যে ব্যবসাটা আমাদের হাতে ধরিয়ে দিল সেটা একটা কম্পিউটার স্টেশনারির এজেন্সি। কয়েকটা বড় অফিস ক্যাচ করতে পারলেই কয়েক হাজার টাকা মুনাফা।

আমার মনে আছে মানুষ হিসাবে চিনুদাকে ভালবাসত সবাই, আমাদের বাড়িতে চিনুদার একটা অন্য সম্মান ছিল। সৎ, নির্ভিক, নির্ভাবানকর্মী হিসাবে। আমি তখন বেকার, বাড়ীর কাছে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারি না। ছোট ছোট ভাই বোন গুলোর দিকে তাকাতে পারি না। এ্যাপ্লিকেশনে বাবার পাটা কাটা যাবার পর চাকরীটা চলে গেল। ষোল টাকা যে কটা পেয়েছিলেন তা একটা বোনের বিয়ে দিতে গিয়ে শেষ হয়ে গেল। এবারে খাব কি? শুনেছি চিনুদার স্ত্রেতি ইন্যুয়েন্স। ব্যাঙ্কের বড় অফিসার। নিশ্চয়ই একটা আধটা চাকরি দেবার সোর্স আছে। আমাদের বাড়ির সঙ্গে চিনুদার ঘনিষ্ট সম্পর্ক। পাশাপাশি বাড়ি। আমাদের সংসারের খুঁটিনাটি সবই তাঁর জানা। চিনুদার মার সাহায্যে আমাদের হাঁড়ি চড়েছে—এমন কতদিন হয়েছে। চিনুদাকে গিয়ে একদিন জড়িয়ে ধরলাম—একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দাও। দেখছ তো বাড়ির অবস্থা। যে কোন একটা সন্ধান করে দাও। চিনুদার মনটি এমনিতে খুব নরম। আমায় সান্ত্বনা দিয়ে বললো, দেখ ব্যাঙ্কে তো এভাবে চাকরি হয় না। কম্পিটিটিভ পরীক্ষা হয়। তাও আজকাল বন্ধ। নতুন লিবারালাইজেসনের ধাক্কায় ব্যাঙ্কের অবস্থা শোচনীয়। অন্য কোন জায়গায় কিছু করা যায় কি না আমি দেখব। তোকে আমি পরে খবর দেব। আমি চলে গেলাম। মাস খানেক পর হঠাৎ চিনুদার ডাক এলো। খুব আশা নিয়ে গেলাম। চিনুদা চা খাওয়াল। তারপর আসল কথায় এল, দেখ্ চাকরি-বাকরীর আশা ছেড়ে দে। কষ্ট করে কিছু রোজগার করতে চাস।

—তুমি যা বলবে আমি তাই করবো। আমি বললাম—শুধু নিজেরটা জোগাড় করতে পারলে হল।

—শ্যামল, মানে আমার শালা, চিনিস তো?

—হ্যাঁ। হ্যাঁ।

—তোরা দু'জনে মিলে একটা ব্যবসা কর।

—ব্যবসা? কি বলছ মাইরি! মাল কড়ির ঠিক ঠিকানা নেই-ব্যবসা?

—সে ভার আমার। প্রথম ক্যাপিট্যাল আমি জোগাড় করে দেব। অর্ডারও আমিই ধরে দেব। তোরা আমার কথা মত কাজ করবি। এক বছর পর তোদের দু'জনের ঘাড়ে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আমি মুক্তি নেব। এর মধ্যে কাজ শিখে নিতে হবে। এই এক বছর আমি দেখাশোনা করবো। হিসেব পত্তর রাখব। পাই পয়সা হিসেব সব আমাকে দিতে হবে। তার বদলে লাভের অর্ধেক পাবে। তিনভাগ হবে। একভাগ আমার বাকি দু'ভাগ তোমাদের দুজনের, পাবে?

—পারবো, বলে আমি লুটিয়ে পড়লাম চিনুদার পায়ে।

চিনুদা ব্যাঙ্কলোন ও অন্যান্য জায়গা থেকে লোন নিয়ে প্রায় লাখ পাঁচেক টাকা ঢালল এই ব্যবসায়। কম্পিউটার স্টেশনারির অর্ডার সাপ্লাই-এর ব্যবসা। চিনুদা নিজেই অর্ডার সংগ্রহ করতে লাগল। আমাদের কাজ শুধু অর্ডার অনুযায়ী মাল সাপ্লাই করা ও পেমেন্ট নেওয়া।

প্রথম প্রথম চিনুদা হিসেব পত্তর রাখলেও পরের দিকে বজায় রাখতে পারে নি। আমাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছিল।

শ্যামলটা ছিল ফোপর দালাল। ও শালা বুঝেই গেছে জামাই বাবুর ঘাড়ে যখন বন্দি ফেলেই দিয়েছি তখন অত পরিশ্রমের কি আছে? ও ব্যাটা ধীরে ধীরে আমার কাছে সারেন্ডার করল। ও সব কাজ আমাকেই ছেড়ে দিল। আমি কোন ইতস্তত না করে নিয়ে নিলাম। সমস্ত ব্যবসাটা আমার হাতে। পেমেন্ট যা পেতাম তার ওয়ান থার্ড জমা দিতাম, টুথার্ড আমার পকেটে। চিনুদা লোকটা একেবারেই ভাল মানুষ। ব্যবসা বোঝে কিন্তু লোককে বোঝে না। কিছুদিনের মধ্যেই ফান্ড শর্ট। সাপ্লাই অনুযায়ী মালের দাম মিলছে না। পার্টিরা বলছে সব পেমেন্ট দিয়ে দিয়েছে। সত্যিই তো দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু চিনুদার খাতে জমা পড়ে নি। পুনরায় অর্ডার সাপ্লাই দেবার ক্ষমতা কোম্পানীর আর নেই।

দিন সাতেক আগে, মানে গত সোমবার চিনুদা আমাদের দুজনকে ডাকলেন। চিনুদাকে এত রাগতে আমি কখনও দেখিনি। রাগবে নাই বা কেন? ব্যবসাটা তার নিজের জন্যে প্রাকটিক্যালি করে নি। যাদের জন্যে করল তারাই সব ফেড়ে ফাঁক করে দিল। রাগবে না?

যে সব কোম্পানী আমাদের অর্ডার দিয়েছে তারা সাপ্লাই না পেয়ে তারধার অর্ডার ক্যানসেল করে দিয়েছে। আসলে সে সব পার্টিতো আমার পকেটে। আমি তাদের সঙ্গে আলাদা ডিল করছি।

চিনুদা ঘায়ার হয়ে বললেন, তোরা কি পেয়েছিস কি? আমায় তো একেবারে ডুবিয়ে দিলি। এই তোদের রোজগার করার আগ্রহ। সব টাকা আমার করে উড়িয়ে দিয়েছিস। দু'জনে যুক্তি করে আমায় শেষ করে দিলি।

—আমি কোন পেমেন্ট নিই নি। আমি কিছু জানি না। শ্যামল বললো।

—তাহলে তোমার কাজটা করল কে?

—আমি ওসব জুয়াচুরি কাজের মধ্যে নেই। বিজুকে আমার কাজ অথরাইজ করে দিয়েছিলাম। ওই সব করেছে।

—বা চমৎকার। এই না হলে নিজের লোক; যাকে দিয়েছ সে সর্বস্ব লুট করে চলে গেল সেদিকে খেয়াল নেই?

কথাটায় তোধার একটা খোঁচা ছিল—আমার গায়ে লাগল। চিনুদা কি বিন্ করতে চাইছে আমার বুঝতে দেরী হল না। ইঙ্গিতটা হয়ত সত্য বলেই আমায় পীড়ন করবে বেশি। আমি একটু রাগ দেখিয়ে বলে উঠলাম এসব তুমি কি বলছ? এত পরিশ্রম করেও যদি এমন কথা শুনতে হয় তাহলে আমি চলে যাচ্ছি। তোমার এখানে আমার দ্বারা আর কিছু হবে না।

—সেটা আমি জানতাম। তোমাকে তাড়িই আর রাখব না। বাজারে লাখ পাঁচেক টাকার দেনা শোধ করে যাও।

—দেনা। কার দেনা? তোমার দেনা আমি কেন শোধ করতে যাব?

—কি বললি, আমার দেনা? ব্যবসাটা আমাদের তিনজনের। স্বামার জন্য আমি করিনি। তোদের একটা উপকার করতে চেয়েছিলাম।

—তোমের না। বল, তোমার শালার জন্য। ও একটা নিষ্কর্মা। অপদার্থ বলে তুমি এতজন উপযুক্ত সহযোগী খুঁজছিলে। আমাকে বেকার পেলে। শ্যামলের সঙ্গে আমায় লাগিয়ে দেওয়াও হল, আর লোককে বলা হলো আমার উপকার করলে। আসলে তুমি একটা হিপোক্র্যাট।

—বিজু এই কি আমার প্রাপ্য ছিল? ব্যাঙ্ক থেকে আমাকে নোটিশ দিয়েছে। লোন শোধ দিতে না পারলে আমার বাড়ি ক্রোক করবে। ওদিকে মানি লেন্ডার কোর্ট থেকে পে-এ্যাটাচমেন্ট সমন পাঠিয়েছে। আমি নিজের জন্যে এসব করেছি? আমার ভাল মানুষীর সুযোগে তোরা আমার মান, সম্মান সব ধ্বংস করলি। রঞ্জনার মুখের দিকে তাকিয়ে তারই অনুরোধে শ্যামলের একটা ব্যবসা করতে চেয়েছিলাম। তার সঙ্গে তোরও। কোন হিপোক্র্যাসি এর মধ্যে নেই। একটা কৃতজ্ঞতাও থাকবে না তোদের? যা তোরা চলে যা। দায় দায়িত্ব সব আমার। আমি বুঝে নেব সবকিছু। গেট আউট-আমি সহ্য করতে পারছি না, তোদের।

—যাব তো বটেই। শুনে রাখ আমি নিজেই এজেন্সি খুলেছি। শ্যামলও আমার সঙ্গে কাজ করবে, চলি।

আমি চলে এলাম। শ্যামলও আমার পিছু নিল। তখন তোমার কি মনে হচ্ছিল? পৃথিবীতে এত ছোটলোক থাকতে পারে। এত হীন, নীচ। তুমি তখন নিজেকে নির্বোধ, পাঁঠা বলে তিরস্কার করছিলে। এই পাঁচ লাখ টাকা দেবার ক্ষমতা চিনুদার আছে কিনা জানি না, কিন্তু কোন কিছু দিয়েই আর চিনুদার ক্ষতি পূরণ হবে না। চিনুদা সত্যিই খুব আঘাত পেয়েছিল—টাকার শোকে নয়—বিশ্বাসঘাতকতায়। কিন্তু তার জন্যে চিনুদা আত্মহত্যা করবে? কেউ নিজে না চাইলে এইভাবে ট্রেনে কাটা পড়ে মরতে পারে?

চিনুদার সঙ্গে আমার শেষ দেখা কাল সন্ধ্যায়। চিনুদার মৃত্যুসংবাদ ঘোষণার আমি একমাত্র সাক্ষী পরিচিতদের মধ্যে।

গতকাল সন্ধ্যার যে গাড়িতে চিনুদা ফিরছিল আমিও সেই গাড়িতে উঠেছি। কামরায় উঠে দেখি হাতে গেলাসের তলা নিয়ে চিনুদা একটা সিটে বসে আছে। একটু উদাস। গম্ভীর।

আমি দেখা দিলাম না। সত্যি কথা বলতে কি চিনুদার সঙ্গে ঐ ঘটনার পর আমার নিজের মধ্যেও অপরাধবোধ হচ্ছিল। নিজের মধ্যে খচখচ করছিল। লোকটার জন্য মায়া মায়া হতে লাগল। বেশ কয়েক মাস ধরে ওদের ফ্যামিলিতে একটা গণ্ডগোল চলছে। রঞ্জনাদির সঙ্গে তন্ময়দার প্রণয়ঘটিত ব্যাপারটা এখন মুখরোচক আলোচনার বিষয়। শুনেছি মৌলিকদার সঙ্গেও বাকি চিনুদার ঝগড়া হয়ে গেছে। মৌলিকদা-চিনুদা ছিল মানিক জোড়। তাদের মধ্যেও বিচ্ছেদ হল।

চিনুদা কেমন একা একা হয়ে গেছে। হাপুস-চোখে মাঝে মাঝে করুণভাবে কি যেন ভাবে। চিনুদার সঙ্গে নাকি আজকাল স্বাতী অপূর্বদার খুব খাতির। চিনুদার কাছে খাপ খুলতে না পেরে স্বাতী পেয়ে অপূর্বদাকে বিয়ে করেছিল। তবে স্বাতী মেয়েটা প্রাণখোলা। আমরা সব ছোট বেলার বন্ধু। রাস্তায় মাঝে মাঝে দেখা হয়। খুব হাসি ঠাট্টা করে। পুরনো দিনের স্মৃতি জেগে ওঠে। এই সব ভাবতে ভাবতে দেখি পার্কসার্কাস এসে গেছে। আমি আগে নেমে গেলাম। ক্রসিং পেরনোর সময় হঠাৎ ওপাশ থেকে একটা গাড়ি আসছে দেখলাম। আর উল্টো দিক থেকে আর একটা ট্রেন আসছে জোরে। সন্ধ্যবত গ্যালপিং। আমরা মাঝখানে। ট্রেন অবশ্য নিয়ন্ত্রণ ঘুরতেই ছিল। আমরা সবাই এদিক ওদিক সরে গেলাম। ওপারে গিয়ে আমি বৌদ্ধমূর্তী হয়ে পেছনে ফিরে চেয়ে দেখি চিনুদা কেমন ঘোরের মত দাঁড়িয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। একবার এগোচ্ছে একবার পেছোচ্ছে। আমি থাকতে না পেরে হাঁক মারলাম—'চিনুদা, ট্রেন এসে গেল। সামনের দিকে লাফ দাও।' চিনুদা আমার দিকে তাকাল। আমাকে দেখে কেমন হয়ে গেল। কেমন যেন ডেকাণ্ট লুক একটা চিনুদার চোখে। ক্রসিং পার হবার জন্য যে আগ্রহটা দেখছিলাম তা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। ধড়মড় করে ট্রেনটা এসে পড়লো। কি ঘুচে এবার চিনুদা লাফিয়ে সামনে আসতে গেল তখন উল্টো দিকের ট্রেন ষ্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। চিনুদা কিছু করার আগে ধাক্কা মেরে চিনুদাকে ছিটকে দিল মাটিতে। হৈ হৈ শব্দে চারদিক থেকে লোকজন দৌড়ল। ট্রেন থেমে গেল একটু দূরে। চিনুদার একটা হাত কেটে বেরিয়ে গেছে। গেলাস ফুলতলো এদিক ওদিক ছড়িয়ে গেছে। চিনুদা অচৈতন্য। আমরা সবাই ধরাধরি করে হসপিটালে নিয়ে গেলাম। কিন্তু কোন ফল হল না। চিনুদা তার আগেই মারা গেছে।

বেঁচে থাকতে তোমার কাছে আসতে পারতাম কি না জানি না—তোমার মৃতদেহের কাছে আমার কনফেসনের দরকার ছিল। কিন্তু বারবার পিছিয়ে গিয়েছি। ভয় পেয়েছি। তোমার সেই শেষ ডেকাণ্ট লুকের মধ্যে আমি তীব্র ঘৃণা লক্ষ্য করেছিলাম। সেই চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার চতুর্দিকে। মৌলিকদাকে খবরটা প্রথমে জানিই নি। আমার কেমন ভয় করছিল। মৌলিকদাই সাহস দিয়ে আমার টেনে নিয়ে এল। আমাকে দেখেই কি তোমার মনে হল চিনুদা এ জীবনের কি মূল্য আছে! তুমি তো সরে আসতে পারতে। আমিই কি কারণ তোমার মৃত্যু না আত্মহত্যার জন্য।

৫

তন্ময়দার কথা

ধীরে ধীরে আমনে এসে পৌঁছলাম। গাড়ি থেকে তোমার বার করে ওরা ওইরে রাখল চুরির কাছে। পাশে মার ঘুটো ঝুড়ি অপেক্ষা করছে। আর তন্ময়দা। ম্যাসিয়ার দেড় ঘণ্টা পরে তোমার শরীর ঢুকে যাবে চুল্লির ভেতরে। আমার বুকের ভেতর কেমন সবকিছু ফাঁকা পাকিয়ে উঠছে। আমাদের পেছনে ঝিরঝি শোভাযাত্রা। পড়ার লোক, অফিসের লোক, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন। বুকে কাল ব্যাথা ওঠা। আমার গা শিরশির করে উঠছিল। এতলোক তোমার জন্যে এসেছে চিনু। এতলোক তোমাকে ভালবাসে। তোমার মেয়েটা তো ঘুলে ঘুলে কাঁদা। ভুল কি সত্যি কথা বলে না চিনু। তোমার মুখের ওপর পড়া চুলটা আর হাত দিয়ে সরিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। মাটির ওপর তোমার শরীর চিৎ হয়ে আছে। মুখে কি হাসির ছোঁয়া। তাজ্জিলোর হাসি। যে তাজ্জিলা আমি দেখিয়ে বেড়াতাম তাকেই মুখংকারে তুমি যেন উড়িয়ে দিলে। কেন গেলে। সত্যিই কি ঘুটো ট্রেনের মাঝখানে পড়ে বেসামাল হয়ে-চকিত হয়ে তুমি চাপা পড়লে। আর সকলে লাইন ক্রস করে এদিক-ওদিক চলে গেল, তুমি, একা তুমিই বেসামাল হলে? না সত্যিই সুযোগের ব্যবহার করলে চিনু?

ভুল ঝুঝলে আমার। ভুল বুঝলে। আমি তো চাকরি করতে চাই নি। তুমিই তো বলতে—মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়োজন। কেন করবে না। চাকরি পেলে করবে না কেন।

আমি বলতাম, তুমি যা পাও তাতে আমাদের চলে যাবে। ছেলেকে মানুষ করতে কত প্রয়োজন? তুমি বলতে—ধরো আর আমার কোন বিপদ হল। অথবা তুমি বিপথগামী হলাম। তোমার দেখলাম না। ত্যাগ করলাম। অথবা আমাকে তোমার আর ভাল লাগছে না। আমার ভরণ করতে চাও। কিন্তু উপায় নেই। দেশের আইন, সামাজিক নিয়মনীতি যা তাতে এসব সহজসাধ্য নয়। বাধ্য হচ্ছ আমার সঙ্গে থাকতে।

—থাক, কি এসব যা তা বকছ। আমি বলতাম।

—যা তা নয় এ সবই বাস্তব। তুমি দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিতে।

চাকরি নিলাম অবশেষে। আমাদের বহু পরিচিত। আমার বাবার ছাত্র তন্ময়দা। আমাদের বাড়িতে যখন পড়তে আসত আমি স্কুলে পড়ি। বিদেশ ঘুরে এখানে এসে ইনজিনিয়রিং ডেকোরেশনের এজেন্সি খুলেছে। একজন প্রাইভেট সেক্রেটারী খুঁজছে। পি. সি চালাতে জানে, স্টেনো-টাইপ জানে এমন একজন। আমার কম্পিউটার কোর্স করা ছিল। টাইপটা বিয়ের আগে শিখেছিলাম। স্টেনোগ্রাফি জানি না। তন্ময়দা আমার নিদেন ছ'দিন-ছ-মাসের মধ্যে স্টেনোগ্রাফিটা শিখে নেব। তন্ময়দা বললেন মাস্টারমশাইয়ের কাছে আমার ঋণ কম নয়। তাঁর কাছ থেকেই তো শিখেছি সব। তুমি তাঁরই মেয়ে। আমার বোনের মত। প্রথম প্রথম অসুবিধা হবে। তুমি শিখে নাও। আমি ভর্তি করে দেব। ছ-মাসের মধ্যে তোমাকে তৈরি হয়ে নিতে হবে। ছ-মাস ধরে তন্ময়দার অফিসে যত টুকু কাজ করার করে আমি শর্টহ্যান্ড-টাইপ শিখতে লাগলাম। ঠিক সময়ের মধ্যে প্রমান করলাম আমি পারি। চেষ্টা করলে পারা যায়।

কিন্তু তন্ময়দার উদারতার ফাঁকে শুধু বোনের মত দেখার ব্যাপার ছিল না। চিনু সেটা বুঝতে পেরেছিল। আমাদের বাড়ি থেকে তন্ময়দার বাড়ি

ছিল কাছেই। শীতকালে জোরেলো রাজধানীটা নিয়ে চলে আসতেন। আমাদের সবাইকে উঠিয়ে দিয়ে বলতেন, কি ব্যাপার এখনও ঘুমন্ত ভোমরা? চল চল। একটু ফ্রি হ্যাণ্ড করো, জগিং করো। পার্কসার্কাস ময়দানটা ছিল বাড়ির পাশে। জোর করে টেনে নিয়ে যেতেন। চিনু এক অধমিন গিয়ে আর যেত না। তস্করদাও বোধ হয় সেইটাই চাইত। প্রথম প্রথম আমার অস্বস্তি লাগত। পরে মেনে নিয়েছিলাম। মনে করে নিয়ে ছিলাম এটাও Part of my service. এ নিয়েই চিনুর সঙ্গে আমার মন কষাকষির শুরু।

একদিন বেশ আবেগের বশেই চিনু আমায় বলল,—আমি তোমায় জোর করেছিলাম চাকরি করার জন্য। সেই আমিই বলছি, Be careful পায়ে তো বেরিয়ে এস এই খাঁচা থেকে। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম,

—আমি একটা বাচ্চা মেয়ে নই, চিনু। যার খুশি ছুতমার্গ নিয়ে বাইরে বেরোনো যায় না। তুমি তো অরবিন্দের মত কথা বলছ।

—না না, আমার ভুল বুঝ না। তুমি বিপদে পড়বে। ঠকবে। ভীষণভাবে ঠকবে। সেই ভেবেই আমার কষ্ট হচ্ছে।

—I don't mind. তোর কেয়ার যদি ওরে একটু সাদা দিই তো কি হল তাতে। আমার হাতের একটু ছোঁয়া বা মিষ্টি কিছু কথা। একটু রসরস-তাতে আমার কিছু অতি তো দেখছি না। তোমার যা পাওয়ার তাতে ঘাটতি পড়ছে না তো।

চিনু কিছু বলল না আর। হাসল অদ্ভুতভাবে। এরপর থেকে ওর মধ্যে একটা নিরাসক্ততা বাসা বাঁধে। স্বাতীর বাড়িতে যে কদাচিৎ যেত সে এখন প্রায়ই সে বাড়িতে আড্ডা মারে। চিনুকে আমি তো জানি। সে ভীষণ আবেগপ্রবণ। স্বাতীকে প্রত্যাখ্যান করে সে আমাকে বিয়ে করেছিল। আমি ওর থেকে বয়সে বড়। স্বাতীর মত সুরূপা নই। তবুও সে আমাকেই পছন্দ করেছিল। স্বাতীর জন্যে কখনও আক্ষেপ করতে শুনি নি।

সব বুঝেও আমার কিছু করার ছিল না। স্বভাবে আমি ভীষণ রেগি। সাধারণ সাংসারিক নিয়ম সংস্কার আমার কাছে ছিল তুচ্ছ বিষয়। তস্করদার বিষয়টাকে হালকা, স্বাভাবিক ভাবে দেখতে গিয়ে আমিও যে তলিয়ে যাচ্ছিলাম তা বুঝতে পারি নি। বা বুঝতে পারলেও বাধা দিতে পারছিলাম না। প্রতিদিন তস্করদা ইঞ্চি ইঞ্চি করে আমার দিকে সরে আসছে। হুইস্কির টানা, স্ট্যাটাস, বাইনকুলার এসব মিলিয়ে আমার এমন করে ভুলেছিল, আমি বিশ্বাস করতে চাইলাম—আমার গায়ে কে হাত ছোঁয়াল তাতে কি এসে যায়? আমার একটু বন্ধুত্বের জন্য যদি কেউ লালায়িত থাকে সে আমার গর্বের কথা। থাকুক না।

এই রকম গৌরববোধ যখন আমায় পেয়ে বসেছিল সে সময় একদিন লাঞ্চ আওয়ারে হঠাৎ আমায় টেনে চুম্বন করে বসল। আমি বাধা দিতে গিয়েও পারলাম না। বাধা দেওয়াতে জোর ছিল না। আমি যেন প্রস্তুতই ছিলাম। আমি বিষয়টাকে পাত্তা দিতে চাইলাম না। ভাল লেগেছিল কি? না। খারাপ লেগেছিল? না তাও না। আমি তখনও ভাবলাম ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক ভাবে নিতে দোষ কি? Part of my service হিসাবেই গ্রহন করতে চাইলাম। ভেবে নিলাম-সিনেমাতে আখছার চুম্বনের দৃশ্য দেখা যায়। তাতে প্রকৃত চুম্বন বলে অভিনেত্রীরা ভাবে না। অভিনেতা-অভিনেত্রীর তাতে কিছু এসে যায় না। তাহলে আমাকেই বা ঘটনাটা পীড়িত করবে কেন? এই সব অদ্ভুতুড়ে যার করে আমি নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম।

পরকাল ছিল আমাদের বিবাহবার্ষিকী। চিনুর খুব ইচ্ছে ছিল আমরা সারাদিন বাড়িতেই কাটাই। ও আমাকে অনুরোধ করেছিল আজ অফিস না যেতে। কিন্তু আমার টেবিলে কয়েকটা জরুরী কাজ ছিল। তস্করদা কদিন বাইরে ছিল। আজ অফিসে আসবে। তস্করদার সই করিয়ে কাগজপত্তরগুলো পার্টিকে আজই পাঠিয়ে দিতে হবে। কোম্পানির শুভ উইলটা বজায় রাখার জন্য আমার তো ভাবতে হবে। আজকে অফিস যাওয়াটা খুবই জরুরী ছিল। আমি সান্ত্বনা দিয়ে চিনুকে বললাম,—সত্যি খুব কাজ আছে গো। কিছুক্ষণের জন্য আমায় যেতেই হবে। বরং তুমি লুচোর আগে চলে এসো। আজ বাইরে কোথাও একসঙ্গে লাঞ্চ খাব। তারপর সিনেমায় ঢুকে পড়ব। প্রিজ কিছু মনে কোরো না। আমি ওর কপালে ঠোঁট দিয়ে টিপ পরিয়ে দিলাম। ও খুশি হল কিনা জানি না, মেনে নিল। অফিসে গিয়ে তাড়াতাড়ি টেবিলের কাজ শেষ করতে লাগলাম। পার্টির প্রয়োজনীয় কাগজগুলো টাইপ করে, ঠিকঠাক করে তস্করদার সই এর জন্য চেম্বারে ঢুকলাম। আমাকে দেখে তস্করদা উজ্জীবিত হয়ে উঠল, আরে কি ব্যাপার? দারুন লাগছে তোমায়। সাজগোজের এত বাহুল্য আজ—ম্যাচিং শাড়ি এসব এতদিনে।

—আজ অফিসেই আসতাম না। আমি হাসতে হাসতে বলি, শুধু তুমি আজ আসবে বলে চলে এলাম।

—বাহ, আমার কি ভাগ্য। তা যাওয়ার আজ আসতে না কেন? আজ কি?

—আজ আমাদের বিবাহের ডে। আমি কিন্তু ঠিক লুচোর চলে যাব।

—শ্রাড নিশ্চয়ই যাবে। আমারও তাহলে ভুল হয় নি। আজকের দিনটার কথা মনে রেখে বোম্বে থেকে একটা জিনিষ এনেছি। তোমার জন্যে।

ড্রয়ার থেকে একটা বাক্স বার করে টেবিলের ওপর রাখল তস্করদা। আমি কৌতূহলী চোখে চেয়ে আছি। বাক্সটা খুলে তস্করদা বার করলেন একটা নেকলেস। জ্বল জ্বল করছে। আমার দিকে তুলে ধরলেন।

—হাউ ডু ইউ লাইক।

—গ্রান্ড। তস্করদা। গ্রান্ড। তুমি মহান।

—দাঁড়াও আজ আমি নিজের হাতে তোমায় পরিয়ে দেব।

তস্করদা উঠে দরজা বন্ধ করে দিল। আমার হাত ধরে টেনে এ্যান্টি চেম্বারে ঢুকলো। এবার একটা অস্বস্তি, ভয় হতে লাগল আমার। কিন্তু মুখে হাসি রেখেই বললাম—কি করছো তুমি।

—দেখই না। বলে তেওয়ারি ড্রয়ার বড় আয়নাটার সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল।

আমি সাহস যে হারাইনি এটা নিজেকে বোঝাবার ছলে বললাম,

—এই দিনটার কথা তোমার মনে আছে!

—মনে না রেখে উপায় আছে? তোমার কথা সব সময় আমার মনে থাকে। তোমার সবকিছু। এবার ঠিক করে সামনের দিকে মুখ করে দাঁড়াও। তোমায় লাগে দেখ।

আয়নায় দেখা যাচ্ছে তস্করদা নেকলেসটা আমার গলায় লাগিয়ে দিল। স্পর্শ লাগল আঙুলের আমার ঘাড়ে, গলার পাশে। শিহরণ। তার মিশ্রিত শিহরণে বুঝি কেঁপে উঠলাম আমি। আমি নিজেকে সংযত রাখার জন্যই কথা বলি,

—দারুন। চমৎকার। ধন্যবাদ তস্করদা।

তস্করদা আমার ঘুটো কাঁধ ধরে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। আমার কিছু বোঝার আগেই তপ্ত দুটি ওষ্ঠ চেপে ধরলো আমার ওষ্ঠে। প্রথমে আমার জাপটে ধরল। আমি তখনও ভাবছি-এ আর এমন কি, সাধারণ ভাবে নিতে কি আছে। আমার ঠোঁট তো পুড়ে গেল না। আমি প্রায় সারেন্ডার করলাম। কিন্তু এবারে সে আমার বুক, পিঠ, নিতম্ব পিষ্ট করতে লাগল। আমি একটু ছাড়াবার চেষ্টা করে বলে উঠলাম, —তস্করদা আর না। আমার ছাড়। প্রিজ ছাড়।

কিন্তু সে তখন আমার চ্যাংদোলা করে নিয়ে কোন একটা জায়গায় ফেলতে চায়। তখন আমি প্রায় কেঁদে ফেললাম।

—তন্ময়দা, প্লিজ, ছাড়। আজ নয়। চিনু এতক্ষণে হয়তো বাইরে বসে আছে। আজ আমাদের একসঙ্গে খাবার কথা।

কি মনে হল—জানি না, ও ধীরে ধীরে আমায় ছেড়ে দিল।

—আই উইল ওয়েট ফর মি ডে। ও ক্লান্ত স্বরে বলল। ঠোঁট থেকে তখন আমার রক্ত ঝরছে। ব্লাউজের বোতাম খুলে গেছে।

ছাড়া পেয়ে এক মুহূর্ত দেরী না করে আমি বেশবাস ঠিক করে নিলাম। দরজা ফাঁক করে উঁকি মেরে দেখি চিনু বসে আছে। আমি আবার স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করি। মুখে হাসি টেনে বেরিয়ে এসে ওকে যেন হঠাৎ দেখছি এভাবে জিজ্ঞেস করলাম,

—কি কতক্ষণ এসেছ?

—বেশিক্ষণ নয়। কি হয়েছে।

—কি আবার হবে? আমি কথা বাড়াতে না দিয়ে টেবিলটা গোছগাছ করতে লাগলাম। ও দেখি আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

—কি দেখছ অবাক হয়ে?

—রঞ্জনা আয়নায় নিজেকে দেখ। তোমার ঠোঁটের কোনে রক্ত। তোমার মুখ চোখ সন্ত্রস্ত, মাথার চুল এলোমেলো। একটা ধস্তাধস্তির চিহ্ন তোমার গায়ে, তোমার পোষাকে। আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। আই উইল কিল হিম।

ও তখন উত্তেজিত হয়ে তন্ময়ের চেম্বারের দিকে যেতে উদ্যত। আমি উপায়ান্তর না দেখে কপট রাগ দেখাই,—কি হচ্ছে কি? তুমি যা ইচ্ছে ভেবে যা খুশী তাই করবে নাকি? চল, চল। আমার হয়ে গেছে। তোমার এই নোংরা সন্দেহে তুমি নিজেই পুড়ে মরবে।

চিনু কি বলতে যাচ্ছিল উত্তেজিত হয়ে। এমন সময় দরজা খুলে তন্ময়দা বেরিয়ে এলো। —কি ব্যাপার চিনু? আজ তো দেখছি ঠিক সময়ে উপস্থিত। চল আজ তোমাদের আমিই লাঞ্চ দেব।

আমি প্রমাদ গুনলাম। তাড়াতাড়ি বলি—আমি তোমায় বলেছি না ম্যারেজ ডে ওনলি ফর মি কলসল। সুতরাং তোমার লাঞ্চ অন্যদিনের জন্য তোলা থাকল।

—ও হাঁ, হাঁ। তা ঠিক আছে। তাই হোক।

—আমার একটু সেরি দেখে ওর একটু অভিমান হয়েছে।

—ও মো সরি চিনু। সেটা আমারই জন্যে। ফোর্গিভ মাইড।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে একটা হাসির ঝলক টেনে বলি, চলি তন্ময়দা। ওকে হাত ধরে টানতে টানতে জোর করে বের করে নিয়ে আসলাম। চিনু তখন রাগে ফুঁসছে। গেট পেরিয়ে সে গর্জে উঠল, রাস্কেলটার স্পর্ধা কম নয়। তোমারই প্রশ্রয়ে ও এতদূরে বেড়েছে। একটা ঘুসি মেরে ওর দাঁত কটা ভেঙ্গে দিতে ইচ্ছে করছিল।

—চিনু তুমি খুব ইমপেশেন্ট হয়ে যাচ্ছ। এসব কথা বলার মানে তুমি আমাকেও ইনসাল্ট করছ।

—রঞ্জনা কি বলছ তুমি? তার মানে যা কিছু হয়েছে তাতে তোমার প্রশ্রয় ছিল।

—ইয়েস। হি হ্যাজ কিসড মি। হোয়টস রং ইন দাট? তাতে যদি আমি অপবিত্তর হয়ে যাই, ঘৃণা না আমাকে। তুমিও কি স্বামীকে চুম্বন করো নি কখনও?

চিনু হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, তুমি স্বামীর কথা এখানে বলবে না। তারপর তার নাভিভেদ করে কি একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল। যেন আমারই নাম ধরে ডেকে একটা আর্তনাদ। বহুদূর থেকে ভেসে আসা কান্নার গোঙানির মত শুনতে পেলাম আমি, চাকরীটা তুমি ছেড়ে দাও। আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি।

—নো ইমপসেবল। ঘোড়া তীর তুনে ফেরৎ আসে না।

—তা হলে আমরা বরং আলাদা থাকি। এই ক্যামোফ্লেজের থেকে বরং সেটা অনেক ভাল।

—আমার কিন্তু মাত্র ইনটারেষ্ট নেই।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা সেন্ট্রাল এভিনিউ-য়ে আমাদের পুরানো পরিচিত দোকানের সামনে হাজির হলাম। চাঙ-ওয়া। আমরা মাঝে মাঝে এখানে খাই। একটা কেবিনে ঢুকে আমি বসে পড়লাম। উল্টো দিকে বসতে বসতে চিনু আবার কাতরে উঠলো—প্লিজ রঞ্জনা, এ চাকরীটা তুমি ছেড়ে দাও।

—কেন জ্বালাতন করছ। চাকরী আমি ছাড়ব না।

—তুমি তন্ময়দাকে ভালবাস?

—নো, নট এ্যাট অল।

—শুধু তোমার কথায়? নো আই কান্ট।

—দেন লিভ মি।

—নেভার।

—এ এক অদ্ভুত পাকচক্রের মধ্যে আমি পড়লাম। আমি বুকে উঠতে পারি না এখন কি করব?

চিনু হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। আমার কাছে এল। আমার মাথাটা হঠাৎ উঁচু করে ধরল। বিড়বিড় করে বলেছ শুনলাম, আমি এখন কি করব তুমি বলে দাও। কি নিয়ে আমি বাঁচব।

আমি বতমত খেয়ে তাকিয়ে আছি ওর দিকে। অস্বস্তি হচ্ছে। ঘণ্টা সাবডিস বয় এসে পড়ে। আমি বিরক্ত হয়ে বলি, এসব কি তামাসা জুড়লে? আজ দিনটাই গেল মাটি হয়ে।

চিনু আমায় ছেড়ে দিল। দুবার উচ্চারণ করল "তামাসা" "তামাসা"। তারপর হেসে উঠে দ্রুতপায়ে রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল। সেই শেষ দেখা। সে কি আবার দেখা করতে চেয়েছিল। যথারীতি সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরছিল। তার হাতে একগুচ্ছ গোলাপ ছিল। প্রতিবার বিয়ের তারিখে এই গোলাপের গুচ্ছ সে নিয়ে আসত। সেইটা নিয়েই ফিরছিল কেন? ঘুটো গাড়ির মাঝখানে পড়ে ধাক্কা খেয়ে চিনু প্রাণ দিল না ইচ্ছে করেই গাড়ীর লাইন থেকে সরতে চায় নি চিনু? কে আর জবাব দেবে?

তোমার স্নেহকে সম্মান দিতে পারিনি আমি। কিন্তু তুমি জানতে পারলে না চিনু আমি তোমারই। আমি তোমাকেই ভালবাসি।

ইলেকট্রিক চুল্লির ভেতর বডিটা ঢুকিয়ে দেওয়া হল। আমরা সবাই শেষবারের মত তোমায় দেখে নিলাম। তুমি তখনও যেন ঘুমিয়ে আছ। ওরা তোমায় চুল্লির ভেতরে ঠেলে দিল। ঘাট ঘাট করে আগুনের লেলিহান শিখা তোমায় আঁকড়ে ধরল। তারপর ঢাকা পড়ে গেল লোহার চাদর মোড়া চুল্লিটা। আমাদের প্রত্যেকের ভেতরটাই তখন হু হু আগুনে জ্বলছে। আমরা একে একে ঘুরে দাঁড়ালাম। তোমার বন্ধুরা তোমায় কি একটা বলে শেষ বারের মত বিদায় জানাল। সে সব কথা সবটা আমার কানে গেল না। কি আশ্চর্য দেখ আমাকে আজ ধরে নিয়ে চলেছে স্বামী। আর একদিকে নন্দিতা। শেষ হতে আরও ঘণ্টাখানেক মত সময় লাগবে। আমরা কজনে এসে বসলাম ঘাসের ওপর গোল হয়ে। কারুর মুখে কথা নেই। প্রত্যেকেই তাকাচ্ছি প্রত্যেকের দিকে। কখনও-বা নিজের দিকে। প্রত্যেকেই বোধহয় আমরা বিদ্ধ হচ্ছি, খাসরুদ্ধকর নিষ্ঠুর যন্ত্রণায়—প্রকাশ করতে পারছি না।

পরের দিন প্রভাতী দৈনিকগুলোতে খবরটা প্রকাশিত হয়েছিল এইভাবে :—

কলকাতা : ২৭শে আগষ্ট, পার্কসার্কাস সেতেন ক্রসিং পার হবার সময় চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় গতকাল নিহত হয়েছেন স্টেট ব্যাঙ্কের রিজিওন্যাল ম্যানেজার শ্রী চিন্ময় ঘোষ। বয়স সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ। খবরে প্রকাশ যে এ দিন ছিল তাঁর বিবাহবার্ষিকী। হাতে গোলাপের গুচ্ছ নিয়ে তিনি ফিরছিলেন বাড়ির পথে।

নতুন আলোয়

অনিরুদ্ধা সেন

আজ মহাসপ্তমী। একটু দূরে প্যাণ্ডেল থেকে ভেসে আসছে সন্ধ্যারতির বাদ্যযন্ত্রের সুর। মন্ত্রউচ্চারণ। লোকের ঢল নেমেছে রাস্তায়। রং বাহারি সুদৃশ্য বিচিত্র আলোক সজ্জায় চারদিক ঝলমলে। প্রকৃতি নবসাজে সজ্জিত। মহামিলনের ঐক্যসুরে চারদিকে মুখরিত।

মধ্যবয়সী সবিতা বারান্দায় গ্রীল ধরে দাঁড়িয়ে। ওর উদাস অকরুণচোখের দৃষ্টি যেন কোথায় কতদূরে। তার জল ভেজা কাপসা চোখে এই আনন্দোৎসবের উজ্জ্বল ছবি ছায়া ফেলে না। মনের গভীর যন্ত্রনায় ও ভয়ানক নীরব। স্বামী সুহাস ওর এই মর্মান্তিক অবস্থা দেখে গভীর শোকে দিশেহারা। কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে, সবিতার কাঁধে আলতোভাবে হাত রেখে স্নেহে বললেন, নিজেকে কেন এত কষ্ট দিচ্ছ বলতো, সে যে মায়ার বাঁধন দিয়ে হারিয়ে গেছে। কত চেষ্টাইতো করলাম তাকে ফিরে পেতে কিন্তু.....

তীব্র কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সবিতা বলল, এই দিনটা যে আমাকে কুঁরে কুঁরে খায়, বার বার মনে করিয়ে দেয় এই উৎসবের দিনেই আমার মেয়েটা কী শূন্য করে হারিয়ে গিয়েছিল শুধু রেখে গেছে দুঃসহ মর্মঘাতী যন্ত্রণা , যা পুড়িয়ে ছারখার করছে সেহেমন।

শোন, আমার কথা শোন। একটু শান্ত হও। যতদিন বেঁচে আছ এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি নেই আমাদের। তবুও ধৈর্যহারা ধরতেই হবে। এছাড়া কিইবা করার আছে আমাদের। ওঠ, চোখে মুখে জল দিয়ে তৈরি হয়ে নাও। দেরি হয়ে যাচ্ছে। ছেলেটা বোধ হয় এতক্ষণে এয়ার পোর্টে পৌঁছে গেছে। আমাদের না দেখে দুশ্চিন্তা করবে। চল তাড়াতাড়ি। বলে সুহাসবাবু সবিতাকে ধরে নিয়ে গেলেন।

এরা নিজের দুঃখ সামলে নিয়ে যতটা সম্ভব ছেলের সামনে স্বাভাবিক ভাবে থাকার চেষ্টা করেছে। তবুও বাবা মায়ের মানসিক অবস্থা বুঝে নিজের মনের মধ্যেই কষ্টটা লুকিয়ে রেখেছে। যতটা সম্ভব বাবা-মাকে খুশি রাখতে চেয়েছে। তনয় বলল, মা তুমিও আমাদের সঙ্গে খেতে বস না। বেশ গল্প করতে করতে খাওয়া যাবে। তাছাড়া রাতও কম হয়নি।

না রে বাবা, সারাদিন বসে তোর প্রিয়খাবার গুলো বানিয়েছি, পাশে বসে যত্ন করে না খাওয়ালে আমার মনই ভরবে না। তোরা দু'জনে খা, আমি দু'চোখ ভরে দেখে একটু শান্তি পাই। সারাটা বছর ধরে তোর আসার পথ চেয়ে এই সাতটা দিনের জন্য অপেক্ষা করে থাকি আমরা। খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ ফুর্তি সবইতো ঘর থেকে চলে গেছে, তুই এসে শুধু মানুষটা পেট ভরে দুটো খায়। আস্তে আস্তে খা আমি রান্না ঘর থেকে পায়েসটা নিয়ে আসি। বলে সবিতা রান্নাঘরে গেল।

সবিতার চোখে জল আনমনে বসেছিল হাত দিয়ে বসে থাকতে দেখে মৃদু বললেন, তুমি এখনও বসে আছ। ছেলেটা দেখতে পেলে অনর্থ ঘটে যাবে। অনেকদূর যাবে ঠাণ্ডা লাগিয়ে ওকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ বল বিশ্রাম করতে দাও। খাওয়া হোমার হয়ে না ওঠ, হাত মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়।

হাঁটতে হাঁটতে পানুটা ভাবি হয়ে আসছে শরীরটা আর বইছেনা। এই অনিশ্চিত পথ চলার কোথায় শেষ কে জানে। তিনদিন পেটে কিছু পড়েনি। বাতাস ধারের জল চোখে কোনমতে শরীরটাকে টেনে চলা। কোলের বাচ্চাটা দুধ ছাড়া শুকনো গামছাটাকে টানতে টানতে আধো হয়ে পড়েছে। বার বার দাঁত দুটিয়ে এক ফোঁটা দুধ না পেয়ে রাগে দুঃখে কতক্ষণ প্রাণপণ চিৎকার করে নেতিয়ে পড়ল। অসহায় কাঁদতে মা মানুষের সব স্নেহ উজাড় করে দিয়ে বাচ্চাটাকে বুকে চেপে বুক ভাঙ্গার ভিতিয়ে দিল ওর ছোট্ট শরীরটা তারপর মাথায় মুখে চুমু খেয়ে বলল, কি করব বাবা, নির্মম নির্দয় মানুষগুলো কিছুতেই অসহায় কষ্টের কথা বুঝতে চাইছে না। তারপর হতাশার সুরে বলল, দেখি সামনে এগিয়ে যদি কোন প্যাণ্ডেলে প্রসাদ পাই। কিন্তু অবসন্ন দুর্বল শরীরে বেশিক্ষণ চলা গেল না। মাথাটা পাক দিচ্ছে। চারদিক গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে ঘাস্ করে পড়ে গেলও।

ভোরের আলোয়, এক ভিখারিকে বাড়ির

গেট পড়ে থাকতে দেখে সুহাস বাবু ভয়ানক রেগে চিৎকার শুরু করে দিলেন। ওর চিৎকার শুনে সবিতা ও তনয় বাইরে এসে দেখে মরলা ছেঁড়া কাপড়ে আপাদ মস্তক ঢাকা এক ভিখারী বাচ্চা কোলে নিয়ে পড়ে আছে। সবিতা স্বামীকে বাধা দিয়ে বলল, পুজো আচ্চার দিনে মানুষকে দূর ছাই করলা-তো অকল্যাণ হবে। মনে হচ্ছে বেচারীর জ্ঞান নেই। জ্ঞান হলেই চলে যাবে। তাছাড়া কোলে বাচ্চা রয়েছে কি জানি ভগবানের এ কোন পরীক্ষা।

সবিতার কথাগুলো ভিখারীর তন্দ্রাচ্ছন্নমনে কেমন যেন অদ্ভুত আলোড়ন তুলল। শিউরে উঠল গা। ঘোমটার আড়াল থেকে একনজর দেখে ওর মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। একি করে সম্ভব! না না আর এক মুহূর্তও নয়, এক্ষুনি পালাতে হবে ওদের নজর থেকে অনেক দূরে। অনেক কষ্টে উঠে কোনমতে বাচ্চাটাকে বুকে চেপে ছুটতে লাগল মেয়েটা। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখে ওরা তো বিস্ময়ে হতবাক। সম্বিত ফিরে সবিতা চিৎকার করে বলল, এই মেয়ে তুমি ওভাবে ছুটছো কেন? কোনভয় নেই, আমরা তোমার কোন ক্ষতি করব না। আহা, ওভাবে ছুটলে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে যে।

কথাটা শেষ না হতেই ধরাস্ করে পড়ে গেল মেয়েটা। দেখে ওরা তিনজনে দ্রুত ছুটে গেল। ছেলেটা ছিটকে দূরে পড়ে। সুতীব্র আর্তচিৎকার করে থেমে গেল। মেয়েটির শরীরের অনেক জায়গা কেটে ছেঁড়ে গেছে। ঘোমটা কোট কপাল থেকে রক্ত ঝরছে। সবিতা জলস্থানটা চাপ দিতে ওর বুকের আঁচলটায় টান দিতেই মেয়েটা সব শক্তি দিয়ে বাধা দিল। তারপর জ্ঞান হারাতে ওর হাতের মুঠো আলগা হল। এবং আবরণটুকু নির্বিচারে সরে গিয়ে পাঁশুটে বিবর্ণ চাঁদের মত ওর যন্ত্রণা বিক্ষত নির্জীব মুখটা বের হতেই ওরা সুতীব্র আর্তকান্নায় স্তব্ধ পাথর বনে গেল। তারপর দীর্ঘদিন ধরে ওদের মনে জমে থাকা উদ্ভাস শোক তরঙ্গ দেহমন চূর্ণ বিচূর্ণ করে প্রচণ্ড গতিতে আছড়ে পড়ল। স্বামী স্ত্রীর চলে পড়া শরীরটা ধরে সান্ত্বনার সুরে সনৎলাল নিজেকে। সঙ্কটের মুহূর্তে এভাবে ভেঙে পড়লে আরও বিপদ বাড়বে। এখন আমাদের মনকে শক্ত করে বিপদ কাটিয়ে হবে।

সবিতা ভয়ে শিউরে উঠে বলল, উঃ কি ভয়ানক নিষ্ঠুর দৃশ্য। এযে আমার দুঃস্বপ্নেরও অতীত। আমি আর সইতে পারছিনা।

তনয় বলল, বাবা মায়ের অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না। সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে যাবে। তুমি মাকে বাড়ি নিয়ে ডাক্তার দেখাও। আমি বাবার হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করি। মা ছেলে দুজনকে এমারজেন্সি ওয়ার্ডে রক্ত ও অক্সিজেন দিয়ে রাখা হয়েছে। তনয় কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে গভীর উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় হাসপাতালে বসে প্রতিটি মুহূর্ত ওপরে একটু ভালখবরের আশায়। উঃ সে কি টান-টান মানসিক উত্তেজনা। বাড়িতে সুহাসবাবু অসুস্থ স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে তাকে সুস্থ করার চেষ্টা করছে। আর নীরবে চোখের জল ফেলে ইশ্বরের কাছে সকরুণ আর্তি জানিয়েছে এই সর্বনাশা বিপদের হাত থেকে মুক্তি পেতে। বার বার চোখের সামনে ওর যন্ত্রণা বিক্ষত মুখটা ভেসে উঠে মনটাকে ক্ষত বিক্ষত করে দিচ্ছিল। কেন এমন হল?

আটচল্লিশ ঘন্টাপরে, মেয়েটির জ্ঞান ফেরায় ওদের মনে ঘনকালো মেঘ সরে গিয়ে মুখে হাসি ফুটল। তনয় বাবা-মাকে এ-খবরটা দেওয়ার জন্য তড়িঘড়ি বাড়ি ছুটল। হারানো জিনিস খুঁজে পেয়ে ওরা আনন্দে দিশেহারা।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে মেয়েটি সকরুণ চোখে বাচ্চাটিকে চারদিক খুঁজতে লাগল দেখে আরা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, বাচ্চার কথা ভাবছ ও ভালই আছে। আর একটু সুস্থ হলেই তোমার কাছে দেবে। একদম মন খারাপ করো না, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দি। তুমি একটু ঘুমনোর চেষ্টাকর।

ছেলেকে স্ত্রীর কাছে রেখে সুহাসবাবু তখুনি হাসপাতালে ছুটলেন। ফিমেল ওয়ার্ডএ ওকে দেখে সুহাসবাবু আনন্দবিহ্বলতায় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কপালে হাত ঠেকালেন। ও কাছে যেতেই মেয়েটি পাশফিরে মুখে আঁচল দিতে ; সুহাসবাবু স্নেহে ওর মাথায় হাত রেখে গভীর মমতায় বললেন, মাগো তুই এখনো আমায় দেখে মুখ লুকাবি? তোর কিসের এত লজ্জা? কিসের এত সঙ্কোচ? কেন এত ভয়? এ আমাদের ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া কিছু নয়। সব দুঃখ ভুলে তুই একটু স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা কর মা। কথাগুলো শুনে প্রবল আবেগ আর উত্তেজনায় থর থর করে কেঁপে উঠল ওর মেয়েটা। অস্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস পড়তে দেখে আরা ডাক্তারবাবুকে ডাকল। ডাক্তারবাবু একটা ঘুমের ইনজেকসন দিয়ে রেগে বললেন, ঘোষ বাবু, আপনার মেয়ে এখনও সংকট মুক্ত নয় এ অবস্থায় উত্তেজিত হলে প্রাণ সংশয়ও হতে পারে। বাইরে চলুন। সুহাসবাবু অপরাধ স্বীকার করে সবিনয়ে বললেন ; আমি ঠিক বুঝতে পারিনি যে, ও এরকম উত্তেজিত হয়ে পড়বে তাহলে... ওরে বাপরে পরমবিস্ময়ে ডাক্তার বাবু বললেন, আমার জীবনেই অবাক লাগছে আপনার মেয়ের এরকম দুর্ঘটনা হল কি করে? কি ঘটেছিল ওর জীবনে?

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুহাসবাবু চেয়ারে বসে ডাক্তার বাবুকে বলতে শুরু করলেন, ডাক্তারবাবু ভাগ্যবিতাড়িত সে বড় বেদনাদায়ক কাহিনী। ছেলে, মেয়ে আর স্বামী স্ত্রীতে আমাদের ছোট্ট সুখের সংসার। আনন্দ আর হাসি খুশিতে বেশ অনেক গুলো বছর কেটে গেল। ওরা বড় হল। ছেলে একটা সরকারী চাকরী নিয়ে দিল্লীতে চলে গেল। স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে আমি বদলী হয়ে শ্রীরামপুরে চলে আসি। মেয়েকে শ্রীরামপুর কলেজে ভর্তি করলাম। কলেজ, কোচিং আর আমাদের সঙ্গে ওর সময় কাটত। আমি ছিলাম ওর বন্ধুর মত। সাইকেলে চেপেই মেয়ে কলেজ যেত।

হঠাৎ একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে মেয়ে আমার কাচুমাচু মুখে বলল ; একজন বাইকোয়ারী যুবক নাকি প্রায়ই ওর পথ আগলে দাঁড়ায়, নানারকম ভাল ভাল কথা বলে আকার ইঙ্গিতে প্রেম নিবেদন করে। আমি সস্নেহে লজ্জায় নুইয়ে পড়া ওর মুখটা তুলে বললাম ; তাহলে আমার মামনি বড় হয়ে উঠেছে। তার রূপলাবণ্য যুবকের মন কাড়ে। ভীষণ কষ্টে মনটা ভারী হল বললাম, তোকে ছেড়ে আমি যে বড় একা হয়ে যাব মা। কি জানি, তোকে পরের ঘরে পাঠিয়ে আমরা কি করে শূণ্য ঘরে থাকব। ঠিক আছে সময় সুযোগমত ছেলেটির সঙ্গে কথা বলে দেখতে হবে সে আমার মামনির যোগ্য কিনা? বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

তারপর বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে। কিন্তু ছেলেটির সঙ্গে আমার আর আলাপ করা হয়নি। মেয়েও ও প্রসঙ্গ নিয়ে আর কোন কথা বলেনি। সপ্তমী পুজোর দিন মেয়ে ওর এক কোচিংএর বন্ধুর সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরল। ক্রমশঃ রাত বাড়তে লাগল কিন্তু ও বাড়ি ফিরল না দেখে আমাদের দুশ্চিন্তা হল। সারাটা রাত গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় অজানা কোন বিপদের আশংকায় ঘর বাইর করে ওর আসার পথ চেয়ে কাটিয়েছি। ভোরের আলো ফুটতেই আমি সব জায়গা ও হাসপাতালে খোঁজ করে ; কোন হদিস না পেয়ে অগত্যা থানায় ডায়েরী করি। সাতদিন কাটল কোন খবর মিলল না। অত্যধিক শোকে ওর মা বিছানা নিল। তার জীবন মরণ সমস্যা। আমি অচেতন জড়বস্তু হয়ে গেলাম। আমাদের এ হেন সংকটজনক অবস্থায় একজন সহৃদয় প্রতিবেশী এস. টি. ডি. করে ছেলেকে বাড়ি ডেকে আনল। ছেলে মাস খানেক ধরে মথাসাধ্য চেষ্টা চালাল বোনকে খোঁজার কিন্তু ফল সেই শূন্যই রয়ে গেল। দিন কাটে, মাস যায়, বছর ঘোরে বুকের আগুনও একটু একটু করে স্তিমিত হয়। আসলে দুঃখ কষ্ট লজ্জা ঘৃণায় মানসিক অবস্থা এমন হয়েছিল যে মানুষের কাছে মুখ দেখাতে ইচ্ছে করত না। তাই ছেলের

পরামর্শে এখানে বাড়ি কিনে চলে আসি মুখ লুকোতে।

তারপর প্রায় তিন বছর বাদে হঠাৎ পনেরদিন ওকে অজ্ঞান অবস্থায় আমরা বাড়ির গেটে দেখতে পাই। সবকথা শুনে ডাক্তারবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠলেন, এতো অবিশ্বাস্য কাহিনী বলেই মনে হচ্ছে। বাস্তবে এটি হওয়া সম্ভব? একটু থেমে বললেন, আচ্ছা ঘোষ বাবু আপনি এখন বাড়ি যান। ও একটু সুস্থ হলে বুঝিয়ে বলে দেখি কি করা যায়।

পরদিন সকালবেলায় ডাক্তারবাবু ভিজিটিং আওয়ারে এসে ওকে পরীক্ষা করে বললেন, এইতো ইয়ং লেডি চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। যাক সব বিপদ কেটে গেছে। এবার বাবা দাদার হাত ধরে বাড়ি ফেরার পালা। ডাক্তারবাবুর কথা শুনে ওর মুখটা ফ্যাকাশে মলিন হয়ে গেল। তারপর দিশেহারা পাগলের মত ডাক্তারবাবুর হাত দুটো ধরে সজোরে কেঁদে বলল, আমি এই সর্বনাশা পরিস্থিতি নিয়ে কিছুতেই ওদের সামনে দাঁড়াতে পারব না। কেন কি হয়েছে তোমার? এক মুখোশধারী দু-পেয়ে হিংস্রপশু আমার সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। আমি একেবারে নিঃস্বে হয়ে গেছি। বলে তীব্র আর্তনাদে লুটিয়ে পড়ল ও। ডাক্তার-বাবু ওকে গভীর মমতায় সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমি জানি মা, তোমার মনে কোন কঠোর আঘাতে বিরাট ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সেই ক্ষতটাকে সারিয়ে না তুললে ওতো দিনে দিনে ভয়ঙ্কর বিষময় হয়ে সব গ্রাস করবে। মাগো তুমি আমাকে সব খুলে বল মনটা হাল্কা হবে। দেখি আমরা সবাই মিলে তোমার কষ্টটা দূর করতে পারি কি না।

আহত ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মত ক্রোধে জ্বলে উঠল ওর চোখ দুটো। যদি একবার ওকে নাগালে পাই তাহলে এমন নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নেব ওর প্রতি। যা-দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। সে জন্যই এত দুঃখ কষ্টেও প্রমাটা জিইয়ে রেখেছি। বাচ্চাটা একটু বড় হলে ওকে অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে আমি ঘুরে বেড়ব শয়তানটাকে। ওকে কিছুতেই রেহাই দেব না। কথাগুলো একটানা বলে হাঁফাতে লাগল মেয়েটি। ডাক্তার বাবু বললেন অপরাধীকে প্রকৃতিই শাস্তি দেবে এ ব্যাপারে আমরা সবাই তোমার পাশে দাঁড়াব, কিন্তু ঘটনাটা ঘটল কি ভাবে?

কিছুক্ষণ পর মেয়েটি বলল : কলেজ যাবার পথে রোজই বাইক নিয়ে ছেলেটা আমার পথ আগলাত। নানারকম ভাল ভাল কথা বলে ও একটু একটু করে আমার মনে জায়গা করে নেয়। ওর রূপের আকর্ষণতো ছিলই। নিজের অজান্তে কবে যেন ওকে ভালবেসে ফেললাম।

এক সপ্তমী পূজোর সন্ধ্যায় আমি, একটি কোচিং-এর মেয়ে আর ওর ঘুরতে যাবার কথা ছিল। কথামত আমি নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেখি ও একাই দাঁড়িয়ে। আমি যাব না বলে আপত্তি জানালাম। কিন্তু ও কিছুতেই ছাড়লনা। শেষ পর্যন্ত মায়ার বিধি কেটে আমার যেতে বাধ্য হল। কলকাতাগামী একটি বাসে আমরা উঠে পড়লাম। কলকাতায় ঠাকুর দেখে ফেরার পথে একটা বড় বাড়িতে আমায় নিয়ে উঠল। সেখানে বেশ এলাহি ব্যাপার। কি ডাকর সাইক পেয়ারা ও আধুনিক সাজ সরঞ্জামে বাড়িটি সুসজ্জিত। দেখে আমি অবাক হলাম। ও আমার বিস্ময় দেখে একটু সলজ্জগর্বের হাসি হেসে বলল : তুমি তো জানই আমার বাবা একজন এম. এল. এ। কলকাতায় কাজে এলে বাবা আমাদের এই বাড়িতে ওঠে। আর আমরা আসি মাঝে মধ্যে বেড়াতে। যেমন আজ এলাম তোমাকে নিয়ে। জান ভীষণ ভীষণ আনন্দ হচ্ছে আমার তোমাকে কাছে পেয়ে। মনে হচ্ছে তুমি সত্যিই আমার, এতদিনের স্বপ্নটা সার্থক হল আজ।

ওর নির্দেশমত স্নিগ্ধ সঙ্গে বাথরুমে গিয়ে ফ্রেস হয়ে এলাম। তারপর রাজকীয় ভোজে রাতের খাবার শেষ হল। একটি আলাদা ঘরে আমার শোবার ব্যবস্থা হল। আমি খাটে। আর তাজের মেয়েটি মেঝেতে। বাবা মার জন্য দুশ্চিন্তায় রাজকীয় ঐশ্বর্যেও আমার ঘুম এল না। বার-বারই চোখ দুটো ভিজতে লাগল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছটফট করে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎই আমার দেহের উপরে আর একটি মানুষের অস্তিত্ব অনুভব করে ভীষণ ভয়ে চীৎকার করে উঠতেই জানোয়ারটা আমার মুখচেপে বলল, আমি। চিনতে পারছ না? তারপর আমার সব বাঁধা ছিঁড়ে ফেলে সর্বস্ব কেড়ে নিল নির্মমভাবে। আমি অসহায় ভাবে শুধু কাঁদলাম।

পরদিন বেশ বেলায় আচ্ছন্ন মেয়েটাকে টানতে টানতে দরজার গিয়ে দেখি বাইরে থেকে তালাবন্ধ। অনেক চিৎকার চেঁচামেচির পর বাইরে থেকে একজন বলল, আমি পনেরো হাজার টাকায় কেনা ওদের দাসী। এটি নারী পাচার চক্রের বাড়ি। সুতরাং ওদের মর্জিমতই আমাকে চলতে হবে। ঐ নরপিচাশগুলি প্রেমের ফাঁদ ফেলে এভাবেই মেয়েদের ঘরে এনে মোটা টাকায় এদের হাতে তুলে দেয়। কথাগুলো বলতে বলতে ঘৃণায় ওর মুখটা সাদা ছাই হল। কিছুক্ষণ স্থিরিয়ে আবার বলল, ওকে দিয়ে পাশবিকতার শুরু তারপর প্রতিরাতে এক একটি হিংস্র নরখাদক চড়াও হত আমার দেহটা খুবলে খেত। এভাবে কতদিন চলছিল আমার মনে নেই। নার্সিংহোমে নার্সের মুখে শুনেছিলাম অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে ভর্তি করা হয়েছিল। মাথায় সামান্য চিকেটও ছিল। আমাকে সারিয়ে তুলতে বেশ মোটা টাকা খরচ করেছিল ওরা। আমি ধীরে ধীরে সেরে উঠতে লাগলাম। শরীরে মাতৃত্বের অস্তিত্ব অনুভব করে কেমন যেন পালটে গেলাম আমি ভীষণ আনন্দ পেলাম। সন্তানকে বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠলাম। আমার কথামত ডাক্তার নার্স ঘরটি গোপন রাখে ওদের কাছে। এবং আমার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য বেশকিছু দিন নার্সিং হোমে রাখার জন্য ব্যবস্থা করতে বলে। নিজেদের বিপদের কথা ভেবে ওরা শেষটায় নার্সিং হোমে বড় একটা অংকের টাকা আর এলেও ডাক্তারবাবুর কাছে আমার খবর খবর জেনে চলে যেতো। ডাক্তারবাবুর আন্তরিক দয়াতেই আমি দু-মাসের বাচ্চা কোলে নিয়ে এক বাড়িতে একটা ছোট মেয়েকে দেখাশোনার কাজ পাই। অনেক দিন পর আমার বুকের নিঃশ্বাস পড়ল। ওদের ভালবাসা পেয়ে বাবা মাকে মনে পড়ত। তীব্র ইচ্ছে হত ছুটে যেতে। কিন্তু নিজের দুর্বাবহার জন্য মনকে ধমিয়ে রাখতাম। বেশ ভালই কাটছিল দিন। যখন একটু একটু করে বিশ্রী ঔদ্ধত্যটাকে ভুলতে শুরু করেছি, ঠিক তখনই একদিন রাস্তায় একজন নারীপাচার কারী আমায় দেখতে পেয়ে পিছু ধাওয়া করে। আমিও প্রাণপনে ছুটতে থাকি। এদিক সেদিক করে কোনরকমে নিজেকে বাঁচাই। তারপর ঘোমটার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাস্তাকে আশ্রয় করে অনির্দিষ্ট পথে চলতে থাকি। একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে থেমে গেল ও। বেশ কিছুক্ষণ কারুর মুখেই রা সরল না। তারপর মেয়েটি বলল, ডাক্তার বাবু এবার আপনিই বলুন, এই নষ্ট, পচা ক্ষত ধোওয়া কৃৎসিৎ মুখ আমি কি ওদের সামনে নিয়ে যাই। ওরা কি পারবে সব ব্যবধান ঘুচিয়ে আবার আমাকে আগের মত বুকে টেনে নিতে। ঘৃণাভাব সঙ্গে ডাক্তারবাবু বললেন নিশ্চয়ই পারবেন। তোমার মা এখনও মাঝে মাঝে জ্ঞান হারাচ্ছেন। তোমাকে না পেলে হয়তো চিরতরেই অচেতন হয়ে যাবে। আর বাবা দাদার কথাতো তুমি নিজেই জানো। তাছাড়া প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বলছিলে না। সেজন্যই তোমার নিরাপদে আশ্রয় আর অসীম শক্তির দরকার। বাবা মাই হলেন সেই অসীম শক্তির উৎস। ঐতো তোমার বাবা আসছেন তুমি তৈরি হয়ে নাও। মেয়েটি বলল ডাক্তারবাবু আমার ছেলে? ডাক্তার বাবু মাথানীচু করে নীরব রইলেন দেখে ও তীব্র আর্তায় ভেঙ্গে পড়ল। বাবা, ওরে মুখটা বুকে চেপে কান্নাজড়ানো গলায় বললেন, মাগো, তুই দুঃখ করিস নে আমি তোকে আবার পরিপূর্ণ আলোকিত জীবন ফিরিয়ে দেব।

নাট্যকারের প্রাণ ভোমরা প্রোডিউসারের হাতে ঃ চন্দন সেন

নাট্যকার তাঁর পছন্দমত নাটক লিখতে পারেন না। দর্শক এবং কখনও কখনও নির্দেশকের দিকে তাকিয়েই লিখতে হয়.....

(৮০'র দশকে বাংলা নাটকের দর্শকদের কাছে চন্দন সেনের উজ্জ্বল পরিচয় নাট্যকার হিসাবে। সাম্প্রতিক জনপ্রিয় প্রযোজনা 'দায়বদ্ধ' বাংলা থিয়েটারে নতুন মাত্রা যোগ দিয়েছে, পরবর্তীকালে এই দশকে 'কর্ণাবতী'-ও। মঞ্চ সাফল্যের এই অভিজ্ঞতা পালাবদলের মুহূর্তকালে উড়িয়ে দিয়েছে নাটকের প্রতি তার উপেক্ষা, অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য। বিভিন্ন পর্যায়ে দেশী ও বিদেশী নাটক রচনা এবং রূপান্তর করেছেন। আরও পরিণত নির্দেশনায়, 'হ, য, ব, র, ল'-এর নাট্য পরিবার চালনা করেছেন নিজের লেখা বাংলা নাটক 'অনিকেত সন্ধ্যা' নিয়ে। কাব্যিক কথনের পারিপাট্যে, সংলাপের ঋজু, নির্মেদ গঠনে দর্শককে, শ্রোতাকে নিপুণভাবে ধরে রাখেন। প্রমাণ করেছেন 'দায়বদ্ধ', 'কর্ণাবতী', 'অনিকেত সন্ধ্যা'-র মত ফসল নাট্যসাহিত্যের গোলাঘর তোলা যায়। যদিও ভারতের অনর্থনীতির ঘূর্ণিপাকের রাজনীতি এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দাপটে নাটকের দর্শক ক্রমাগতই অস্পষ্ট, অনিশ্চিত হয়ে উঠছে, তবুও থিয়েটারে ইশ্বরী পাটনীর খেয়া পারাপার বোধহয় বন্ধ হয় না কখনও। এই আলোচনায়, প্রশ্নোত্তরে, আজকের নাটকের গতি, প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান মতামত অন্বেষণকারী আশীষ দাস।)

□ নাটক লিখতে গেলে যে সামগ্রিক নাট্যশিক্ষা সেটা কিভাবে সম্পূর্ণ হল। পরে নাট্যকার হয়ে এলেনই বা কেন? কেন অভিনেতা নয়। এখন আপনাকে আমরা নির্দেশকের ভূমিকাতেও দেখতে পাচ্ছি। আপনি যখন নাট্যকার নির্দেশক—কোন ভূমিকায় আপনি বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন।

□□ যদিও কর্মসূত্রে আমার বাবা ছিলেন সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার, নাট্যচর্চাও করতেন (এখনকার এই Form-এ নয়) তবে আগেকার বিখ্যাত কিছু নাটক যেমন সেবলামেবী, চন্দ্রগুপ্ত ইত্যাদি নাটকে বাবার অভিনয় দেখে একটু একটু করে নাটকের প্রতি আকর্ষণ জন্মায়, নাটককে ভালবাসতে থাকে, নাট্যচর্চা শুরু হয়। আজ প্রায় তিন দশক হল আমার নাট্যচর্চার। —এইভাবে বাবার হাত ধরেই। সম্ভবতঃ ৫০-র দশকে ছাত্রাবস্থায় বেথুয়াডহরীতে একটি নাট্যানুষ্ঠানে 'আলেকজান্দার পুরু' নামে একটি ছোট্ট নাটকে একজন সৈনিকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। ওটাই প্রথম অভিনয়। ইতিমধ্যে বাবার কর্মজীবনের অবসর গ্রহণের সময় আমার অবস্থান দিল্লীতে একটি সংস্থায় চাকুরিরত হিসাবে। সেই সময় দিল্লীর বিখ্যাত 'যাযাবর নাট্য গোষ্ঠীর' সঙ্গে যুক্ত হই। ঐ দলের নির্দেশক গোপীনাথ মুখোপাধ্যায়-এর নির্দেশনায় একটি প্রহসনে

নাটকে আমি অভিনয় করতে থাকি। সেটা ১৯৬৪ সাল। দিল্লী ছেড়ে চাকদহে চলে আসি স্কুলে শিক্ষকতার কাজে। এই সময় এখানকার 'ছ, ব, ব, র, ল'-এর সঙ্গে যুক্ত হই। অভিনেতা হিসাবে। পরিচালক ছিলেন নদীয়া জেলার অমল বিশ্বাস। ওঁর পরিচালনায় কিংবা মৈত্র, উৎপল দত্ত, মানোজ মিত্র এঁদের নাটকে অভিনয় করি। এক সময় ঐ পরিচালকের অনুপ্রেরণায় ২০ সাল নাগাদ একটা নাটক লিখি, 'নিহত সংলাপ'। একাঙ্ক। প্রথম নাটক। 'অভিনয়' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। একটি চরিত্রে অভিনয়ও করি। পরে 'দর্পণে ইতিহাস', 'সেই রক্তিম সন্ধ্যা'—এগুলো আমার লেখা, অভিনয়ও করি। এক সময় অনুভব করলাম অভিনয় করা আমার কাজ নয়। নাটক লেখাই আমার কাজ। It is my cup of tea। বুঝলাম নাট্যকার হিসাবে একটা স্বতন্ত্র সত্ত্ব রাখা দরকার এবং সেটা সম্ভব।

নির্দেশক হিসাবে আমি কখনোই কাজ করতে চাই না। আমার নাটক তো কলকাতা বা পশ্চিমবাংলার অনেক ভালো দল অভিনয় করে। কিন্তু আমি নিজে যে দলের সঙ্গে (ছ, ব, ব, র, ল) যুক্ত সেই দলের নির্দেশকের আকস্মিক মৃত্যু ঘটায় খুল ধরতে আমাকেই নির্দেশকের ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে। তবে যে কটা নাটকে আমি নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছি যেমন যে শত্রু ছিল, অলৌকিক আয়না বা দর্পণ সাক্ষী এবং সাম্প্রতিক নাটক 'অনিকেত [illegible]'—যেটা ২১০ রজনী অতিক্রান্ত হল—সেগুলো কোন অঙ্কে তম মঞ্চ সফল নয়।

এর পরেও আমার মনে হয়েছে পরিচালনা আমার কাজ নয়। প্রকৃতপক্ষে একজন যোগ্য পরিচালক পেলে পরিচালনার ঝামেলা বাদ দিয়ে নাটকটা আরও ভাল করে লিখতে পারি।

❑ আপনি নাট্যকার। কিন্তু পেশায় শিক্ষক। পেশা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করে?

❑❑ যেহেতু আমার বিষয় ইংরাজী সাহিত্য। আমাকে অবশ্যই শেক্সপীয়র, বার্নার্ড শ, ইব- সেন, হ্যাবল্ড পিন্টার পড়তে হয়েছে Academically এবং মানসিক চাহিদা মেটানোর—এই দুইয়েরই জন্য। বাংলা সাহিত্যের ছাত্র নয় বলে পরবর্তীকালে আমাকে দ্বিজেন্দ্রলাল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গিরিশ ঘোষ গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হয়েছে। মূলতঃ বিদেশী নাটকের হাত ধরেই নাট্য রচনার শৈলী সম্পর্কে আমার পরিচয়। পরে উৎপল দত্তর লেখা নাটক, তার বিষয়বস্তুর গভীরতা, অভিনয় ইত্যাদি দেখে আমি বাংলা নাটক সম্পর্কে আরো গভীরভাবে আকর্ষণ বোধ করি।

❑ আপনার প্রিয় নাট্যকার কে?

❑❑ কবিতার প্রতি আমার একটা আকর্ষণ থাকায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা, কাব্য নাটক, নাটকের সঙ্গে পরিচিত হই। তারপর থেকে উনিই আমাকে গ্রাস করেন। এখনও পর্যন্ত মোহিত চট্টোপাধ্যায়ই আমার প্রিয়তম নাট্যকার। হয়তো আমি কোনদিন হতে পারব না কিন্তু আমি ওঁর মত নাট্যকার হতে চাই, উনিই আমার কাছে আদর্শ।

❑ কবিতা, কাব্য নাটক ঠিক এই প্রসঙ্গে এখানে সেইভাবে কাব্য নাটকচর্চা হয় না কেন? প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে তবু কিছু চর্চা যেমন শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'—

❑❑ কাব্য নাটক আমাদের মধ্যে কয়েকজন লিখেছেন যেমন রাম বসু, অমিতাভ দাশগুপ্ত, গিরিশঙ্কর, মোহিতদা তো লিখেছেনই। কিন্তু নাটকের জনপ্রিয় হবার যে যে উপাদানগুলো লাগে কাব্যনাটকে সেগুলোর অভাব থাকে। সাধারণতঃ আমাদের নাটকের দর্শকরা যে নাটকগুলোর উত্তরাধিকার বহন করছেন তাদের সেই উত্তরাধিকারের মধ্যে কাব্য নাটক বোধ হয় কাব্য নাটকচর্চা খুব একটা আসেনি বা হয়নি। 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্য নাটক হলেও মূল সুর কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রাম। সেখানে ঐ আবেগটাই কাজ করেছে।

❑ ৭০-এর দশকে আপনি নাটক লিখেছেন, ৮০-র দশকে লিখেছেন, এখনও লিখছেন। বার বার বিষয়বস্তুগুলো পাল্টে আছে। এর পিছনে কি কোন রাজনৈতিক বোধ কাজ করছে? না কি অন্য কিছু—

❑❑ ব্যক্তিগতভাবে আমি একজন রাজনৈতিক (কমিটেড) সাংস্কৃতিক কর্মী। ৭০-র দশকের নাটকগুলোতে প্রতিবাদী নাটক বলে Interpret করেছিলাম- শাসক শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে আঘাত হানব, তাদের মুখোশ উন্মোচন করব এবং সঙ্গে সঙ্গে দিন বদলের পালা ঘোষণা করব। এই ছিল অধিকাংশ নাটকের বক্তব্য। ৮০-র দশকে এসে একটা সরকার ক্ষমতায় এল যখন আমাদের প্রতিবাদের ক্ষেত্রটাও অনেক সঙ্কুচিত হয়ে গেল। তবে এটাও বুঝতে পারলাম যে ৭০-র দশকের লেখা নাটকের ধাঁচ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কারণ এতে শ্রেণী সংগ্রামের সহায়তাও হচ্ছে না। আবার জীবনের যা আসল সত্য যা একটা নাট্যকারের নাটকে তুলে ধরা উচিত সেটাও হচ্ছে না। মানুষের জীবনের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করলাম সামাজিক, পারিবারিক ঘাত-প্রতিঘাতগুলো কসরে আসতে থাকল।

❑ রাজনীতি বর্জিত?

❑❑ না। প্রত্যক্ষ নয় তবে পরোক্ষভাবে রাজনীতি আছেই। আসলে একজন উৎপল দত্তই নাটকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির কথা বলেছেন। Propaganda এবং Literature এর অসাধারণ মেলবন্ধন—ওঁর মত প্রতিভাবান মানুষের পক্ষেই সম্ভব ছিল ঘটানো। যাই হোক, আমরা যেভাবে ভাবি মানে যে সমস্যার কথা ভাবি যেমন, 'দুই হজুরের গল্প' সেটাতেও রাজনীতির কথা আছে। যদিও এটা একটা স্যাটায়ার ; তার আগে জ্ঞানবৃক্ষের ফল, সাংবেস কেওলেতে সমাজ জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতগুলো আসছে যদিও সেগুলো রাজনীতি বর্জিত নয় কিন্তু রাজনীতি সেখানে কখনোই Predominant বা প্রত্যক্ষভাবে আসেনি।

❑ ভালো নাটকের প্রাথমিক এবং প্রধান শর্ত কি ভালো গল্প?

❑❑ নাট্যকারদের একটা ট্র্যাজেডি নিয়ে কাজ করতে হয়। যেহেতু আমাদের এখানে নাটক এখনও পর্যন্ত পাঠ্য বিষয় নয়, মঞ্চ নির্ভরতাই নাটকের পরমায়ুর লক্ষণ। তাই কোন্ নাট্যকারের নাটক বেঁচে থাকবে, কোন্ নাট্যকারের নাটক প্রকাশিত হবে, কোন্ নাট্যকারের নাটক কতটা সংখ্যা এগুলো মাপার যন্ত্রটা হচ্ছে কোন্ নাটক কতটা জনপ্রিয় হল, কতটা মঞ্চায়ন হল। অর্থাৎ সমস্ত নাট্যচর্চাটাই মঞ্চের দিকে তাকিয়ে। আসলে দর্শকের দিকে তাকিয়ে বা কখনও কখনও নির্দেশকের দিকে তাকিয়ে নাট্যকারের নিজস্ব ইচ্ছাকে বলিদান দিতে হয়। নাট্যকার তাঁর পছন্দমত নাটক লিখতে পারেন না। ফলতঃ আমরা যারা নাট্যকার তা কখনোই বিশুদ্ধভাবে অধিকাংশ সময়ে আমাদের নাটক লিখতে পারি না।

❑ অর্থাৎ আপনি বলছেন নাট্যকারের সীমাবদ্ধতার জন্য দর্শক এবং নির্দেশক দায়ী?

❑❑ ব্যাপারটা এইরকম—মোহিতদা যদি মোহিতদা'র মতন করে নাটক লিখতে পারতেন, যদি উনি নিজের মতন একজন প্রোডিউসার পেতেন তাহলে হয়তো আমরা মোহিতদাকে একটু অন্যরকমভাবে পেতে পারতাম। আসলে নাটক এবং নাট্যকারের প্রাণ তোমরা প্রোডিউসারের হাতে। বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন নাটকটা লেখার পর হয়তো মনে হল নির্দিষ্ট একটা সংলাপ পদ্যে না হয় গদ্যে হলে ভাল হত। কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখা গেল দর্শকরা হয়তো ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারছে না। নির্দেশক মনে করছেন এটা দর্শকের পক্ষে too high। সেখানে নাট্যকারকে সেই ইচ্ছা থেকে নিবৃত্ত হতে হয়। Theatreকে আমাদের এখানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই Producers' Theatre

ধাঁচে চলতে হচ্ছে। পাশাপাশি এটাও ঠিক যে আমাদের Theatre কর্মীদের অভিজ্ঞতা এই—দর্শকদের ইচ্ছা অনিচ্ছার দিকে তাকিয়েও তাদেরকে উন্নীত করার চেষ্টায় আমরা কিয়দংশে সফল যাতে করে তাদের চাহিদা, বোধ বিচার বুদ্ধির সংকটটা একটু অন্যরকম হয়েছে। 'তখন বিভোস'-এর মত নাটক তাদের ভাল লাগছে বা 'মাধব মালতী কইন্যা'ও। মাও সে তুং বলেছিলেন, 'আমরা জনগণের কাছ থেকে নেব এবং জনগণকে দেব'—একটা Reciprocdal Process হবে।

❑ বিষয়বস্তু সম্পর্কে আপনার চিন্তা ভাবনা।

❑❑ আমি মনে করি দর্শক নাটকের এই রকম বিষয়বস্তু চায় যাতে তারা জীবনের স্বাদগুলো পাবে। তাদের নতুন কিছু কথা নতুনভাবে শুনবে। যদিও নতুন কথা বলে কিছু নেই। নতুনভাবে বলাটাই নতুন। গুরুগম্ভীর, মস্তিষ্কের ওপর দিয়ে যাবে, নাটকের গ্রহণশক্তি যে দর্শক তাদের বোধবুদ্ধির মধ্যে বিষয়বস্তুকে সহজে প্রবাহিত করা যাবে না, এবং দর্শকাসন পূর্ণ হলেই সেটি একটি 'শান্তি নাটক', বরঞ্চ ওটি কয়েক দর্শক আহা আহা করবে,—'তুমি ধন্য নাট্যকার' বলে এমন নাটা রচনা দরকার আমি এই মতের বিরুদ্ধে। cerebral নাটকে আমি বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি আবেগগত এবং মস্তিষ্কগত এই দুটো দিকের সঠিক মেলবন্ধন থাকলে সে নাটক সফল হবেই। যদিও সাফল্যের ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট Process নেই। 'অনিকেত সন্ধ্যা'-নাটকে ৭০-৮০ বছরের বৃদ্ধ মানুষগুলোর যন্ত্রণার ছবি—সেই নাটকও University'র ছাত্রছাত্রীদের ভাল লেগে যায়। এর থেকেও অনেক ভাল নাটক যেমন—আলেকজান্ডার পুশকিনের জীবন নিয়ে 'ঝড়ের পাখী', আমার প্রিয় নাটক কাফা ব্যঙ্গনাময়—'সাত্রিক' বা 'ব্রেখ্ট গ্যালিলিও' দর্শকদের কাছে ঠিকমত গ্রহণযোগ্য হয়নি। নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি ছিল। এখন একটা রূপান্তরের কাজকরছি। সেটা হল স্ট্রিণ্ডবার্গের 'ফাদার'। জানি না দর্শকরা কিভাবে নেবেন বা কতটা ভাল লাগবে। তবে এই সময় আমার মনে হচ্ছে দর্শক চায় একটা নিটোল গল্প, যে গল্পে তার মনের সঙ্গে সংপৃক্তির একটা ব্যাপার থাকবে।

❑ ঠিক এই অবস্থানে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবাংলার সামগ্রিক নাট্যচর্চা সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন?

❑❑ এ ব্যাপারে আমি নৈরাশ্যবাদী নই। যাঁরা বলছেন এখন কিছুই নাটক হচ্ছে না বা যাঁরা বলছেন এখনই বাংলা নাট্যচর্চার Golden Period আমি কোন পক্ষেই নেই। সর্বকালেই আমাদের এখানে নাট্যচর্চার উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ছিল এখনও আছে। অনেক Oddsকে সামনে রেখে আমাদের চর্চা চালিয়ে যেতে হচ্ছে—

❑ Odds মানে?

❑❑ নাটা প্রযোজনার ব্যয়, টিকিট ঘরে দর্শকদের আনুকূল্যের অভাব—দুটোই ক্রমবর্ধমান হারে। এছাড়াও মিডিয়ার হাতছানির মোহে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে নাট্যচর্চা সম্পর্কে বেশ অনীহা দেখা যাচ্ছে। অধিকাংশে জায়গায় পুরনো চেনা মুখগুলোরই ভিড়, কিন্তু নাট্যচর্চাটা বড়ই জরুরী।

শেষে আমি নিজে থেকেই একটা বিতর্কিত বিষয় না বলে পারছি না।

❑ নিশ্চয়ই বলুন।

❑❑ 'বাজারী নাটক', 'Commercial Success' ইত্যাদি কতকগুলি শব্দ আমার উদ্দেশ্যে অনেকেই বলেন। এ ব্যাপারে আমি Violently react করতে চাই। 'দায়বদ্ধ'র অসামান্য সফলতা বা জনপ্রিয়তার পরের পর নাট্য জগতের একজন নামী বিশিষ্ট পরিচালক একাধিক প্রবন্ধে লিখলেন—Theatre Commercialise করে দেওয়া ব্যাপারটা বন্ধ ও হওয়ার দরকার। এতে Group Theatre-এর ক্ষতি হচ্ছে। আসলে আমার পরে মনে হয়েছে-ভদ্রলোকটা কোথায়—ভদ্রলোকটা হচ্ছে আমাদের যাঁরা এলীট পরিচালক, পত্রপত্রিকায় লেখেন যে নাটক বাজারী হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি তাঁরাই কিন্তু গোপনে একটা ভয়ে লোক পাঠান আমাদের কাছে যে আমি যেন 'দায়বদ্ধ'র মত একটা নাটক লিখে দি যাতে করে তাঁর দলের যে Crisis সেটাকে মেটানো যায়। এই হিপোক্রেসী বা ভণ্ডামীটাই Theatre-এর সবচেয়ে বড় শত্রু। একটি নামী পত্রিকায় একজন প্রবন্ধকার লিখলেন-কি জঘন্য নাটক দেখতে গেলাম 'দায়বদ্ধ' হাউসফুল। আসলে যে দর্শক Academy, Rabindra Sadan বা Girish Mancha-এ যাচ্ছেন তারা হাবী তনবীর, এম কে রায়নার নাটক দেখেছেন, তবে একটা নির্দিষ্ট মান বা রুচি রয়েছে-এটাই ওরা ব্যাখ্যা করতে পারেন না। সেখানে যারা ব্যর্থ হচ্ছেন তাঁরাই আওয়াজ তুলে গোটা পরিবেশটাই কলুষিত করার চেষ্টা করছেন। ভাল নাটক অবশ্যই দর্শকদের আনুকূল্য পাবে। তা না হলে শ্যামবাজারী Theatre এর Producerরা অনেক Group Theatre-এর পরিচালক। অভিনেতাকে নিয়ে যাচ্ছেন, প্রচুর স্টারদের ভিড়ও সেখানে আছে। তবু শ্যামবাজারী Theatre-এর বাজারী সম্পর্কে আমরা সকলেই জানি। যদিও সৌমিত্রদা (চট্টোপাধ্যায়) Theatre Commercialএর একটা অন্য মাত্রা দিতে পেরেছেন। আসলে সবসময়েই নাটকের ক্ষেত্রে একটা সচেতন দর্শকশ্রেণী আছে, যদিও সংখ্যায় বেশি নয়। মজাটা হচ্ছে যাঁরা পরিবারকেন্দ্রিক নাটকের বিরূপ সমালোচনা করলেন তাঁরাই কিন্তু মহেশ এলকুঞ্চওয়ার-এর নাটকের ধুঁয়াত তুলে প্রশংসা করলেন। উনি কি মারাঠি বলে। যে দুটি নাটক প্রযোজনা পরিচালনা করেছেন তার প্রত্যেকটিতে কিন্তু পারিবারিক সমস্যার কথা আছে। পশ্চিম সরকার (প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, নাটা সমালোচক) এর মতে যখন মহেশ এলকুঞ্চ ভাল লেখেন তখন প্রশংসায় পঞ্চমুখ হই ; যখন চন্দন সেন লেখেন তখন জনপ্রিয়তার খপ্পরে পড়ে যান।

❑ আপনার লেখা সাম্প্রতিক নাটক 'কর্ণাবতী' আজকের জনপ্রিয় বাংলা নাটকগুলো থেকে একটু আলাদা। সেটা কি প্রযোজনার গুণে, নির্দেশনার গুণে?

❑❑ 'দায়বদ্ধ'র ধেরাটোপ থেকে আমি বেরোতে চাইছিলাম। আমি এবং মেঘনাদ দুজনেই এই নাটকের তথ্য সংগ্রহের জন্য রাজস্থানে যাই এবং একমত হয়েই লেখা শুরু করি। যদিও গল্পকার অমৃতা প্রীতম। কিন্তু আমি এগিয়েছি আমার নিজের মত করেই। নিজেকে ভাঙতে না পারলে তো এগোনো যায় না। পরবর্তী নাটকে হয়তো দেখা যাবে বিষয়বস্তু, Form-এর সবটাই একেবারে আলাদা। আসলে ব্যক্তিক্রমটা এইখানেই।

❑ নিজেকে ভাঙা মানে সজ্ঞানে পরিবর্তন করার কথা বলছেন। কিভাবে?

❑❑ যেভাবে প্রযুক্তি, প্রকৌশল, বিজ্ঞান এগিয়ে যাচ্ছে সেভাবে আগামী ১০ বছর পর দর্শকরা কি আমাদের নাটক এইভাবে দেখতে রাজি হবেন? নিশ্চয়ই নয়। মর্মান্তিক সত্য এই যে নাটক তার পুরনো জায়গায় থাকবে না। নাট্যকার/নাট্যকর্মী সমাজ বিচ্ছিন্ন নয় বলেই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। সময়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এইরকম নাটকের কথাই ভাবতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তির জানলা দরজাগুলো খোলা রেখেই বিষয়টা ভাবতে হবে। এটাই টিকে থাকার লড়াই। Film Media-র বিশাল বিস্ময়কর পরিবর্তনের সাথে সাথে নাটককেও সেই পরিবর্তনের জায়গায় যাবার ব্যাপারে নিঃসন্দিগ্ধ হতে হবে। তবে একটা ব্যাপার কিন্তু যে Form এর কথাই ভাবি না কেন, যে সময়ই আসুক না কেন মানুষের মধ্যে একটা দিক চিরন্তন,—মানুষ নাটকের মধ্য দিয়ে জীবনকে দেখতে চায়, নিটোল কাহিনীকেই দেখতে চায়। এই প্রাসঙ্গিকতা শেষ হয় চিরন্তন সত্য।

[অনুলিখন :— আশীষ দাস।]

জগৎ যে রকম

(বাবুকের ঐশী দর্শন তাঁরই দ্বারা লিখিত)

Le Monde comme il va ভোলতের (১৭৪৮)

ভাষান্তর অ রূ প ম ণ্ড ল

[অনুবাদক অরূপ মণ্ডল আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ থেকে ফরাসীতে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত।
কর্মসূত্রে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অধিকারিক।]

যে দেবযোনিরা পৃথিবীর সাম্রাজ্যগুলির তত্ত্বাবধান করেন, ইস্ত্রিয়েলের স্থান তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতে। উত্তর এশিয়ার ভার তাঁর উপর। একদিন প্রত্যূষে তিনি অরুণাসের তীরে সীতিয় বাবুকের গৃহে নেমে এলেন। তাঁকে বললেন, "বাবুক পারসীয়দের নির্বুদ্ধিতা আর অমিতাচার আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করেছে; পার্সেপোলিসকে সাজা দেওয়া হবে, নাকি তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হবে এই বিষয়ে গতকাল উত্তর এশিয়ার উপদেবতাদের এক সভা হয়। তুমি যাও সেই নগরে, সব কিছু দেখ ; ফিরে এসে তুমি আমাকে একটি সঠিক বিবরণ দেবে ; তোমার বিবৃতি থেকেই আমি ঠিক করব এই নগরকে সংশোধন করা হবে না সংস্কার করা হবে।"—কিন্তু প্রভু, বিনীতভাবে বলেন বাবুক, আমি কখনোই পারস্যে যাইনি, আমি সেখানে কাউকেই চিনি না।—সেই তো ভালো, বলেন দেবদূত, তোমার বয়ান হবে পক্ষপাতশূন্য। ঈশ্বরের কাছ থেকে তুমি পেয়েছ উপলব্ধি, আমি তার সঙ্গে যোগ করে দিলাম বিশ্বাস সঞ্চার করার ক্ষমতা; যাও, দেখ, শোন, পর্যবেক্ষণ কর, কোনো ভয় নেই ; সব জায়গাতেই তুমি সাদর অভ্যর্থন পাবে।

বাবুক তাঁর উটের পিঠে চড়লেন, রওয়ানা দিলেন ভৃত্যদের নিয়ে। কিছুদিন পর সেনাবের সরভূমির কাছে তিনি দেখলেন পারসিক বাহিনী চলেছে ভারতীয় সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। একজন সৈনাকে অন্যদের থেকে একটু তফাতে দেখে প্রথমে তিনি তার সঙ্গেই কথা বললেন। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন এই যুদ্ধের কারণ কী। "হে ঈশ্বর, বলে সৈন্যটি, তার আমি কী জানি। সে তো আমার ভাবার কথা নয়, আমার কাজ জীবিকা অর্জনের জন্য মারা আর মরা ; আমি কার হয়ে কাজ করছি তাবও কোনো মানে নেই আমার কাছে। কাল থেকে আমি ভারতীয় সৈন্যদলেও যোগ দিতে পারি, পারসীয়দের এই হতভাগা চাকুরিতে যা পাচ্ছি ওরা নাকি প্রতিদিন তার থেকে প্রায় আধ ড্রাক্ম ভাতামুদ্রা বেশি দেয়। যদি কেন আমরা লড়ছি তা জানতে চান, তবে বরং আমার ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলুন।"

সৈনাটিকে একটি ছোট উপহার দিয়ে বাবুক শিবিরে প্রবেশ করলেন। তখনই কাপ্তেনের সঙ্গে আলাপ করে তার কাছে যুদ্ধের কারণ জানতে চাইলেন। "তা আমি জানব কি করে? বলে কাপ্তেন, আর তাতে আমার প্রয়োজনই বা কী? পার্সেপোলিস থেকে দুই শত লীগ দূরে আমার বাস ; কানে এল যে যুদ্ধ ঘোষণা হয়েছে, যেমন আমাদের রীতি বেরিয়ে পড়লাম তক্ষুণি ঘরসংসার ফেলে সৈন্যশ্রেণী বা মধ্যদেশ সন্ধানে, জানি যে আর কিছুই আমার করার নেই।—কিন্তু তোমার সহকর্মীরা, প্রশ্ন করেন বাবুক, তাদের মধ্যে তোমার থেকে বেশি ওয়াকিবহাল কি কেউই নেই?—না, জানায়, কাপ্তেন, একমাত্র আমাদের প্রধান সাত্রাপরা ছাড়া কেউই জানে না কেন আমরা একে অন্যকে জবাই করছি।"

বিস্মিত বাবুক সেনাপতিদের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন ; তাঁদের সাথে আলাপ করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন অবশেষে জানালেন : "কুড়ি বছর ধরে এই যুদ্ধ এশিয়াকে উৎসাদিত করছে, এর উৎস পারস্যের সম্রাটের এক স্ত্রীর জঠরে খোদা আর ভারতের সম্রাটের এক দস্তরের জঠরে কর্ণধিকের মধ্যে বচসা থেকে। বচসা একটি কথাকে কেন্দ্র করে যা হবে তখন এক লক্ষিতের প্রভু হিশ তাগ। ভারতের আর আমাদের প্রধানমন্ত্রীরা অতি যোগ্যতার সঙ্গে তাঁদের প্রভুদের কর আদায় করেন। তাই বচসা বর্ধিত হল। রণভূমিতে সমগ্র দেশ থেকে দশ লক্ষ সৈন্যের এক বাহিনী খাড়া করা হল। প্রতি বছর চার লক্ষেরও অধিক সৈন্য সংগ্রহ করতে হচ্ছে। হত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধ্বংস, লুণ্ঠন বেড়েই চলেছে, জগতে হাহাকার উঠেছে, কিন্তু কোনোরকম নমনীয়তার চিহ্ন নেই। আমাদের ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীরা প্রায়ই ঘোষণা করেন যে তাঁরা যা করছেন সেই সবই মনুষ্যত্বের মঙ্গলের জন্য ; আর প্রতি ঘোষণাতেই কিছু শহর বিধ্বংস হয়, কিছু গ্রামের ছারখার হয়।"

পরদিন প্রাতে শোনা গেল যে যুদ্ধবিরতি শেষ হতে চলেছে। পারসিক সেনাপতি ও ভারতীয় সেনাপতি ছুটলেন রণে ; যুদ্ধ হল রক্তক্ষয়ী। বাবুক যুদ্ধের সবরকম দোষ, সবরকম জঘন্যতা দেখলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন প্রধান সাত্রাপদের রণকৌশল, নিজেদের প্রভুকে খুশানোর সবরকম চেষ্টাই তারা করল। অধিকাংশদের নিজেদের সৈন্যের হাতেই হত্যা হতে তিনি দেখলেন। দেখলেন যে সৈন্যরা তাদের মুমূর্ষু সহকর্মীদেরই জবাই করছে তাদের গায় থেকে কিছু রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন, কর্দমাক্ত পোশাক ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য। আহতদের যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেখানে তিনি গেলেন, দেখলেন যে তাদের মধ্যে অধিকাংশই মারা যাচ্ছে, পারস্যের সম্রাট যাদের প্রভুর অর্থ দিয়ে রেখেছেন তাদের রক্ষা করার জন্য, তাদেরই অমানবিক অবহেলায়। "এরা কি মানুষ, বাবুকের অন্তরে চিৎকার ওঠে, নাকি হিংস্র পশু! আহ্! বেশ দেখতে পাচ্ছি যে পার্সেপোলিসের ধ্বংস আসন্ন।"

এই কথা চিন্তা করতে করতে তিনি ভারতীয় শিবিরে প্রবেশ করলেন। পারসীক শিবিরে তিনি যেমন সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন, এখানেও তেমনই পেলেন ; ইতুরিয়েদের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হওয়ার নয় ; কিন্তু যে সব অনাচার দেখে তিনি শিউরে উঠেছিলেন এখানেও সে সব দেখলেন। "আহ্! আহ্! মনে মনে ভাবেন তিনি, যদি দেবদূত ইতুরিয়েল পারসিকদের সাহায্য করতে চান তবে ভারতের দেবদূতকেও ভারতীয়দের জ্ঞান করতে হবে।" কিন্তু পরে দুই বাহিনীতে যা যা ঘটেছে তা তিনি আরো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হলেন ; তিনি জানতে পারলেন অনেক বিস্মিত মহত্ত্ব, উদার্য ও মানবিকতাপূর্ণ কাজের কথা যা তাঁকে বিস্মিত ও আনন্দ বিহ্বল করল। "আপনার অতীত জানুন, মনে মনে চিৎকার করে ওঠেন তিনি, কি করে তোমরা এত নীচতা আর মহত্ত্ব, এত সততা আর অপরাধকে এক কর!"

ইতিমধ্যে শান্তি ঘোষণা হল। দুই বাহিনীর নেতারা, যারা কেউই বিজয় লাভ করেনি, কিন্তু নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদেরই মত বহু মানুষের রক্তপাত করেছে, তাদের রাজসভায় চলল পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে। সর্বসাধারণের জন্য বিজয়ীতে শান্তির জন্য হর্ষ জ্ঞাপন করা হল, পৃথিবীতে সমৃদ্ধি ও সৌমনস্যের প্রত্যাবর্তন ঘোষিত হল। "ঈশ্বরের জয় হোক। বললেন বাবুক, হিংশোদিত নিষ্কলঙ্কতার আবাস হবে পার্সেপোলিস; দুষ্ট দেবদূতরা যা চাইছে তা হবে না, পার্সেপোলিস টিকে থাকবে কালক্ষেপ না করে দীপ যাওয়া যাক এশিতার সেই রাজধানীতে।"

সেই বিশাল নগরীতে বাবুক প্রবেশ করলেন প্রাচীন প্রবেশদ্বার দিয়ে যা একেবারেই বর্বরসুলভ, যার বিরক্তিকর ধূসরতা চোখকে পীড়া দেয়। পার্সেপোলিসের এই অংশের সঠিক সেই সময়ের গল্প পাওয়া যায় যখন এই শহর প্রথম তৈরি হয়েছিল, আর যদিও বর্তমানকে ছোট করে অতীতকে প্রশংসা করার এক গুরোমি মানুষের আছে, এ কথা অনস্বীকার্য যে সর্বক্ষেত্রেই প্রথম প্রয়াস হয় মোটা দাগের।

বাবুক ভিড়ের সঙ্গে মিশে চললেন, তার মধ্যে আছে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যের সবচেয়ে নোংরা ও ঘৃণ্যসিত সব মানুষ। হতবুদ্ধির মত সেই ভিড় তাড়াতাড়ি গিয়ে ঢুকল একটি বিশাল ও আবদ্ধার প্রকোষ্ঠে। অনবরত গুঞ্জনধ্বনি, মানুষের হাঁটাচলা, বসার অধিকারের জন্য কিছু মানুষ অন্যদের পয়সা দিচ্ছে, এই সব থেকে তিনি ভাবলেন যে জায়গাটি একটি বাজার, সেখানে খড়ের চেয়ার বেচা হচ্ছে। কিন্তু একটু পরেই বেশ কিছু মহিলাকে সামনে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে হাঁটু মুড়ে বসতে দেখলেন তিনি। তাছাড়া পুরুষদের দিকেও দেখে তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি একটি মন্দিরে এসেছেন। তীক্ষ্ণ, কর্কশ, আদিম, বেসুরো সব কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট শব্দে সেখানের ছাদকে প্রকম্পিত করতে থাকল। মনে হতে লাগল যেন পিকৃতাডের সমভূমিতে শিঙার ডাকের উত্তরে বন্য গর্দভের পাল চিৎকার জুড়েছে। তিনি দু'হাতে কান চাপলেন ; কিন্তু একটু পরেই যখন কয়েকজন শ্রমিককে টিমটে ও কোদাল নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেখলেন তখন তার দুই চোখ ও নাকও ঢাকতে ইচ্ছে হল। তারা একটি বড় পাথর সরিয়ে মাটি তুলে দুই পাশে ফেলতে থাকল, সেই মাটি থেকে ঘৃণিত দুর্গন্ধ নির্গত হচ্ছিল। তারপর তারা সেই গর্তের মধ্যে একটি মৃতদেহ রেখে তার উপরে আবার সেই পাথরটিকে রেখে দিল।

"কি! আঁতকে ওঠেন বাবুক, যেখানে এরা দেবতের পূজা করে সেখানেই এরা মৃতদেহ কবর দেয়। কি! এদের মন্দির মৃতদেহের উপর দাঁড়িয়ে। এতে আর আশ্চর্য কি যে প্রায়ই পার্সেপোলিস মরকে ছারখার হয়। পচনগ্রস্ত মৃতদেহ আর একই জায়গায় ঠাসা এত জন পচনগ্রস্ত জীবিত প্রাণী, এতো গোটা পৃথিবীকে বিষাক্ত করে তুলতে যথেষ্ট। আহ্! কি জঘন্য নগর এই পার্সেপোলিস। স্বাভাবিক ভাবেই দেবদূতরা চান এই শহরকে ধ্বংস করে এর জায়গায় সুন্দরতর একটি শহর গড়ে তুলতে, সেই শহরকে এমন মানুষ দিয়ে ভরে তুলতে যারা হবে পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছন্ন, যারা গান গাইবে এর থেকে ভালো। দেবদূতদের কাজের পিছনে যুক্তি আছে ; তাই করুন তাঁরা।"

ইতিমধ্যে সূর্য তার গমনপথের প্রায় শিখরে উন্নীত হয়েছে। বাবুককে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য যেতে হবে শহরের অপর প্রান্তে এক ভদ্রমহিলার গৃহে। তাঁর স্বামী, সেনাবাহিনীর জনৈক অফিসার, বাবুকের হাতে স্ত্রীর উদ্দেশে কিছু পত্র দিয়েছেন। কিন্তু তার আগে বাবুক পার্সেপোলিস অনেকটা ঘুরে নিলেন। প্রচুর মন্দির দেখলেন যাদের গঠনশৈলী অনেক বেশি সুন্দর, যেগুলি অতি উত্তম কারুকার্যখচিত, যারা পরিপূর্ণ মার্জিত সুন্দর মানুষে, যারা অনুরণিত সুরেলা সঙ্গীতে। তিনি লক্ষ্য করলেন বেশ কিছু সার্বজনিক ফোয়ারা, যেগুলোর কলসে হলেও তাদের সৌন্দর্য নজর কাড়ে ; অনেক চক দেখলেন যেখানে পারস্যের মৃত নৃপতিদের কবর প্রতিমূর্তি যেন খাসগুজার করেছে; অনেক চকে শুনতে পেলেন লোকে চিৎকার করে বলছে, "আমাদের প্রিয়

প্রভুকে কখন দেখতে পাব।" নদীর উপর নির্মিত চমৎকার সব সেতু, সুন্দর ও উপযোগী সব রোড, তাহিনে বাঁয়ে নির্মিত সব প্রাসাদ, একটি বিশাল বাড়ি যেখানে প্রতিদিন অগুনতি বৃদ্ধ আহত ও বিজেতা সৈন্যরা সেনাবাহিনীর ঈশ্বরের উদ্দেশে তাদের প্রণাম নিবেদন করে—এ সবেরই বাবুক তারিফ করলেন। অবশেষে তিনি সেই ভদ্রমহিলার গৃহে প্রবেশ করলেন। তিনি আরো অনেক মাননীয় ব্যক্তির সঙ্গে বাবুকেরই প্রতীক্ষা করছিলেন। বাড়িটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সাজানো গোছানো, ভোজন অতীব সুস্বাদু, ভদ্রমহিলা আন্তরিকতা, সুন্দরী, কৌতুকপ্রিয়া, রমণীয়া, অভ্যাগতরাও তাঁরই যোগ্য; তখনই বাবুক মনে মনে ভাবলেন, "এমন মনোরম নগরকে ধ্বংস করতে চেয়ে দেবদূত ইতুরিয়েল নিশ্চয় পৃথিবীর সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।"

কিন্তু তিনি লক্ষ্য করলেন যে ভদ্রমহিলা যদিও শুরুতেই বয়সী পলায় তাঁর কাছে স্বামীর খবর জানতে চেয়েছিলেন, ভোজনের পর তিনি আরো বেশি প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে এক অল্প বয়স্ক পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলছেন। একজন ম্যাজিস্ট্রেট এসে নিজ পত্নীর সামনেই অতি যাচ্ছেতে এক বিধবাকে আলিঙ্গন করলেন আর সেই বিধবাও পরম প্রশ্রয়ে এক হাতে ম্যাজিস্ট্রেটের গলা জড়িয়ে ধরে শত চুমো দিয়েছেন এবং অতি সুদর্শন ও নগ্ন যুবকের হাতে। ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী সবার আগে টেবিল ছেড়ে উঠে পাশের এক প্রকোষ্ঠে স্বামীর অভিকর্তার চিত্তবিনোদন করতে গেলেন। অধিকর্তাটি এসেছিলেন অনেক দূরিতে, ভোজনের সময় সবাই তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। ভদ্রলোক অতি বাকপটু, সেই কক্ষের মধ্যে তিনি এমন উদ্দীপনাময়, এত মধুমিশ্রিত সব কথা বললেন, যে ভদ্রমহিলা কিরলেন অশ্রুসিক্তনয়না, রক্তিমকপোলা, স্খলিতচরণা, কম্পিতবক্ষা। বাবুকের ভয় হতে থাকল যে দেবদূতেরা ইতুরিয়েল হয়তো ঠিকই করছেন। তাঁর বিশ্বাস উৎপাদনের ক্ষমতার বলে তিনি সেইদিনই গৃহকর্ত্রীর সব গোপন কথা জানতে পারলেন; ভদ্রমহিলাই তাঁকে জানালেন অল্প বয়সী পুরোহিতটির প্রতি তাঁর আকর্ষণের কথা, এও জানালেন যে বাবুক তাঁর গৃহে যা দেখছেন পার্সেপোলিসের ঘরে ঘরে সেই একই জিনিস দেখতে পাবেন। বাবুক ভাবলেন যে এমন সমাজের ধ্বংসে অবশ্যম্ভাবী ; ঈর্ষা, বিরোধ, প্রতিহিংসা সব ঘরকে ছারখার করে দিতে বাধ্য ; প্রতিদিন বইবে রক্ত ও রক্তের স্রোত, নিশ্চয় স্বামীরা স্ত্রীর প্রেমীদের হত্যা করবে নয়তো তাদের হাতে প্রাণ হারাবে, আর শেষ পর্যন্ত যদি ইতুরিয়েল নিজে ধূর্বিপাকগ্রস্ত এই নগরকে এক লহমায় সংহার করেন তবে সে ভালোই হবে।

যখন বাবুক এইরূপ নিরানন্দ চিন্তায় নিমজ্জিত, তখন গায়ে কালো কোট পরিহিত এক গম্ভীর ব্যক্তি এসে অতি বিনয়ের সঙ্গে অল্প বয়স্ক ম্যাজিস্ট্রেটটির সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। ম্যাজিস্ট্রেট যেমন উপবিষ্ট ছিলেন তেমনই রইলেন, লোকটির দিকে তাকালেন না পর্যন্ত। শুধু জন্য মনস্কভাবে অতি অবহেলার সঙ্গে কিছু কাগজপত্র দিয়ে তাঁকে বিদায় করলেন। বাবুক লোকটির পরিচয় জানতে চাইলেন। গৃহকর্ত্রী নিচু গলায় জানালেন : "উনি শহরের একজন শ্রেষ্ঠ উকিল ; বিগত পঞ্চাশ বছর ধরনের উনি আইন ব্যবসায় করছেন। মহাশয় ম্যাজিস্ট্রেট, তাঁর বয়স মাত্র পঁচিশ, আজ দু'দিন হল আইনের সাত্রাপ নিযুক্ত হয়েছেন। একটি মামলার বিচার করবেন উনি। কিন্তু তা পড়ে দেখার সময় ওঁর এখনো হয়ে ওঠেনি। তাইই সংক্ষিপ্তসার করতে দিলেন উকিলকে।—এই নির্বোধ যুবক একজন বৃদ্ধের সাহায্য চেয়ে বুদ্ধির কাজই করেছে, বলেন বাবুক ; কিন্তু ওই বৃদ্ধই কেন বিচারক হলনি?—আপনি নিশ্চয় ঠাট্টা করছেন, ভদ্রমহিলা বলেন, বাঁয়ে প্রেমপূর্ণ অবস্থান গণে থেকে বৃদ্ধ হল তাঁরা কখনোই উচ্চপদে পৌঁছাতে পারেন না। ওই যুবক এত গুরুত্বপূর্ণ পদ পেয়েছেন শুধু এই কারণেই যে ওঁর পিতা ধনী আর এখানে বিচার করার ক্ষমতা ফেতি জমির মতই কিনতে পাওয়া যায়।—হা নয়ন। হা হতভাগা নগর। আর্তনাদ করেন বাবুক, এতো দুর্দান্ত বিশৃঙ্খলা ; যারা বিচার করার ক্ষমতা ক্রয় করে তারা নিশ্চই বিচারকে বিক্রয়ও করবে ; এখানে তো অবিচারের অতলস্পর্শী গহ্বর ছাড়া আমার আর কিছুই চোখে পড়ছে না।"

যখন বাবুক এইভাবে তাঁর কষ্ট ও বিস্ময় ব্যক্ত করছিলেন তখন সেইদিনই সৈন্যবাহিনী থেকে প্রত্যাগত এক অল্প বয়স্ক যোদ্ধা তাঁকে বললেন "বিচারকের পেশায় ক্রয়-বিক্রয় আপনার না চাওয়ার কারণ তো বুঝলাম না। আমিও তো আমার নেতৃত্বের দুই হাজার সৈন্যের সামনে দাঁড়িয়ে বুক্তার সম্মুখীন হওয়ার অধিকার ক্রয় করেছি; এই বাবদ তার জন্য আমাকে দিতে হয়েছে চল্লিশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রিক, পরিবর্তে পেয়েছি পদ পদ তিরিশটি নগ্ন রক্তিম পোশাকে মাটিতে শুয়ে কাটানো, পেয়েছি দুটি দারুণ তীরের আঘাত যার যন্ত্রণা এখনো টের পাচ্ছি। যদি যাঁকে আমি কখনো দেখিনি সেই পারস্যের সম্রাটের জন্য আমি নিজের এমন ক্ষতি করতে পারি, তবে শ্রীযুক্ত আইনের সাত্রাপ নিশ্চয় ফরিয়াদীদের দেখা দেওয়ার আনন্দলাভের জন্য ভিন্ন মূল্য ধরে দিতে পারেন।" যে দেশে শান্তি ও যুদ্ধের মর্যাদাকে নিলামে চড়ানো হয় বিরক্ত বাবুক আপন অন্তরে সে দেশকে অভিশাপ না দিয়ে পারলেন না; তিনি তৎক্ষণি ভাবলেন যে এ হেন দেশে নিঃসন্দেহে সবাই দুষ্ট ও আইনকানুনকে অবজ্ঞা করছে, ভাবলেন যে যদি ইতুরিয়েল এদের সংহার নাও করেন তবুও এদের ঘৃণ্য শাসন ব্যবস্থার জন্যই এরা ধ্বংস হবে।

এক অতি স্থূল ব্যক্তির আগমনে বাবুকের খারাপ লাগা আরো বর্ধিত হল। লোকটি সবাইকে খুব অন্তরঙ্গভাবে অভিবাদন জানিয়ে অল্প বয়স্ক অফিসারটির কাছে গিয়ে বলল "আপনাকে আমি পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণ দারিকের বেশি ধার দিতে পারব না, কারণ আসলে এবার সম্রাজ্ঞীর শুল্ক থেকে আমি মাত্র তিন লক্ষ দারিক পেয়েছি।" বাবুক জানতে চাইলেন এত অল্প আয়ের জন্য দুঃখ করছেন যিনি কে শুনলেন যে পার্সেপোলিসে চল্লিশজন জনসাধারণের রাজা আছেন, তাঁরা পারস্য সাম্রাজ্যের ইজারা নিয়েছেন, পরিবর্তে তাঁদের আয়ের কিয়দংশ তাঁরা সম্রাটের হাতে তুলে দেন।

ভোজনের পর নগরের সব থেকে উৎকৃষ্ট মন্দিরগুলির মধ্যে একটিতে তিনি গেলেন ; সময় কাটানোর জন্য একদল স্ত্রী-পুরুষ সেখানে এসেছে, তাদের মধ্যে গিয়ে বসলেন তিনি। একটি উন্মুক্ত যজ্ঞের উপর এক পুরোহিত দেখা দিলেন, বহুক্ষণ ধরে পাপ-পুণ্যের কথা বললেন তিনি। যাকে ভাগ করা নিষ্প্রয়োজন তাকে তিনি অনেক ভাগ করে দেখালেন, যা জলের মত পরিষ্কার তা তিনি নিয়মানুযায়ী প্রমাণ করলেন, যা কিছু সবাই জানে তাই তিনি শিক্ষা দিলেন। ধীরে ধীরে তিনি উত্তেজিত হলেন, যখন ভাষণ শেষ করলেন তখন তিনি ঘর্মাক্ত কলেবর ও ঘমঘুট। সবাই উঠে দাঁড়াল, মনে করল যে কত না শিক্ষা বুঝি তার লাভ করেছে। বাবুক বললেন : "এই লোকটি একঘেয়ে কথায় পুণো-তিনশো নগরবাসীকে বিরক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে তা সত্যি, কিন্তু ওর উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, পার্সেপোলিসকে ধ্বংস করার কোনো কারণ তো এতে দেখি না।"

সেই সমাবেশ থেকে বেরোনোর পর কয়েকজন তাঁকে একটি সার্বজনীন উৎসব দেখাতে নিয়ে গেল। এই উৎসব বছরের প্রতিদিনই হত ; উৎসবটি সৃষ্টিল এক ধরণের কাজিলিকার মধ্যে যার প্রান্তে একটি প্রবোদ দেখা যাচ্ছিল, সেখানে সব থেকে সুন্দরী নগরবাসিনীরা ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাত্রাপরা সুবিন্যস্তভাবে বসে এমন নয়নাভিরাম শোভা সৃষ্টি করেছিলেন যে বাবুক তো প্রথমে ভাবলেন এইটাই বোধহয় উৎসব। একটু পরেই রাজা ও রাণী বসে প্রতীয়মান দু'তিনজন প্রজাদের দরবারানে দেখা দিলেন। তাঁদের ভাষা জনসাধারণের ভাষার থেকে অনেক অন্যরকম ; সুবিবেচিত, শুদ্ধধ্বনি, সুরভিযুক্ত। একজনও ঘুমিয়ে পড়ল না, সকলেই গভীর নৈঃশব্দে তাঁদের কথা শুনতে থাকল। নৈঃশব্দ কেবল মাঝে মাঝে ভাঙছিল জনসাধারণের সংবেদনশীলতা ও প্রশংসার মোহক শব্দে। রাজাদের কর্তব্য, সততার প্রতি স্নেহ, বহুবিস্তৃতনিষ্ঠ বিশদ এত জীবন্ত, এত মর্মস্পর্শী সব নজির দেখিয়ে তাঁরা ব্যাখ্যা করছিলেন যে বাবুক অল্প পর পর হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে

কোনো সন্দেহ রইল না যে এইমাত্র যীশুর কথা শুনলেন সেই নায়ক-নায়িকারা, সেই রাজা-রাণীরাই এই সাম্রাজ্যের ধর্মোপদেষ্টা ; এমন কি তিনি মনস্থির করে ফেললেন যে ইতুরিয়েলকে এখানে এসে এঁদের কথা শুনতে অনুরোধ করতে হবে ; এমন ঘৃণ্য দেখলে তাঁর এই শহরের সঙ্গে বিরোধ চিরদিনের মত দূর হতে বাধ্য।

উৎসব শেষ হতেই বাবুকের ইচ্ছা হল প্রধানা মহিষীর সঙ্গে দেখা করেন যিনি সেই সুন্দর প্রাসাদে এত মহৎ, এত বিশুদ্ধ সব নীতি কথা ছড়িয়ে দিয়েছেন। রাজ্ঞীর কাছে আপন পরিচয় পাঠিয়ে দিলেন তিনি; একটি ছোট সিঁড়ি দিয়ে তাঁকে তৃতীয় তলে নিচুমানের আসবাবপত্রে সজ্জিত একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে সস্তা পোষাক পরিহিতা এক নারী অতিথিকে কিন্তু সর্বস্বান্ত কণ্ঠে তাঁকে বললেন "এই কাজে আমার প্রয়োজন হয় না ; যে রাজপুরুষদের দেখলেন তাঁদের মধ্যে একজনের ঔরসে খুব শীঘ্রই আমার সন্তান হতে চলেছে ; আমার অর্থ নেই, আর অর্থ না থাকলে সন্তান হওয়াও নিরর্থক।" বাবুক তাঁকে এক শত স্বর্ণ দারিক দিয়ে মনে মনে ভাবলেন : "এই শহরের যদি এই মাত্র দোষ হয়, তবে এত কষ্ট হয়ে ইতুরিয়েল ভুল করছেন।"

সেখান থেকে অপ্রয়োজনীয় ঝাঁকজমকের ব্যাপারীদের কাছে তিনি সন্ধ্যাটা কাটাতে গেলেন। এক সদা পরিচিত ঔদ্ধত্যী ব্যক্তি তাঁকে সেখানে নিয়ে গেলেন। বাবুক যা ভালো লাগল তাই কিনলেন, বিক্রেতা তাঁকে অনেক অতিরিক্ত সম্মান দেখাল। ঘরে ফিরে তাঁর বন্ধু তাঁকে দেখালেন যে তিনি অনেক ঠকে এসেছেন। নগরের শান্তির দিনে যাতে ইতুরিয়েল সেই ব্যবসায়ীকে বিশেষ করে চিনতে পারেন সেই জন্য বাবুক ফলকের উপর তার নাম খোদাই করে রাখলেন। যখন তিনি লিখছেন, সেই সময় দরজায় করাঘাত শোনা গেল : ব্যাপারী স্বয়ং বাবুকের টাকার থলি ফিরিয়ে দিতে এসেছে, বাবুক ভুল করে তা দোকানে ফেলে এসেছিলেন। "এই সব তুচ্ছ জিনিসের জন্য ন্যায্য মূল্যের চার গুণ বেশি নিতে আপনার লজ্জা হয়নি, চিৎকার করেন বাবুক, অথচ এখন এত বিষণ্ণ, এত উদার হলেন কি করে!" "এই নগরে একটু নামজাদা এমন কোনো ব্যবসায়ী নেই, উত্তর দেয় বিক্রেতা, যে আপনার থলি ফেরত দিতে আসত না ; কিন্তু যে আপনাকে বলেছে আমার দোকানে যা আপনি কিনেছেন তার জন্য আমি ন্যায্য মূল্যের চার গুণ অতিরিক্ত নিয়েছি সেই আপনাকে ঠকিয়েছে আমি আপনার থেকে সঠিক মূল্যের দশ গুণ বেশি নিয়েছি, আর একথা এত ঘুর সত্যি যে যদি এক মাস পরে আপনি এগুলো বেচতে যান তাহলে এই দশ ভাগ লাভও আপনি পাবেন না। কিন্তু এর থেকে ন্যায্য আর কিছু হয় না : মানুষের খেয়ালই এই সব তুচ্ছ জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করে ; এই খেয়ালের জন্যই আমার একশজন আত্মিয় খেতে পরতে পাচ্ছে, এই খেয়ালই আমাকে একটি সুন্দর বাড়ি দিয়েছে, একটি আরামদায়ক রথ দিয়েছে, দিয়েছে ঘোড়া, এই খেয়ালই শিল্পকে প্রোৎসাহিত করছে, সুরুচিকে ধারণ করছে, প্রাচুর্যের প্রবাহকে বজায় রেখেছে। এই একই সব তুচ্ছ জিনিস আমি প্রতিবেশী রাজ্যগুলির কাছে আপনার কাছে যা নিয়েছি তার চেয়েও বেশি মূল্যে বিক্রি করি, আর সেই জন্যই আমি সাম্রাজ্যের কাছে উপযোগী।" বাবুক একটু চিন্তা করে ফলক থেকে ব্যবসায়ীর নাম মুছে দিলেন।

পার্সেপোলিস সম্পর্কে কী যে ভাববেন তা একেবারেই স্থির করতে না পেরে, বাবুক পুরোহিত ও বিদ্বজ্জনদের সঙ্গে দেখা করবেন ঠিক করলেন। এদের মধ্যে এক দল জ্ঞান ও জন্য জন্য ধর্ম শিক্ষা দেয় ; তাই তিনি মনে করলেন যে এরাই নিশ্চয় বাকি আর সব নগরবাসীদের জন্য মার্জনা আনতে পারবে। পরদিন সকালে বাবুক পুরোহিতদের একটি সংঘে গেলেন। প্রধান পুরোহিত তাঁর কাছে স্বীকার করলেন যে পারিয়েত্র রত নিলে এক লক্ষ এক আত্মা পাওয়া যায় আর তৃপ্তারণি সুরীত ধারার পশ্চাদ্ধর বলে তিনি এক কিলন সাম্রাজ্যেরও আধকারী। এরপর তিনি বাবুককে এক যাজকের হাতে তুলে দিলেন। তিনি তাঁকে অতি সম্মানপূর্বক স্বাগতম জানালেন।

যাজকটি তাঁকে এই প্রায়শ্চিত্তের গৃহের ঝাঁকজমক ঘুরিয়ে দেখালেন, এমন সময় গুজব রটে গেল যে বাবুক এসেছেন এই সব প্রতিষ্ঠানকে বাতিল করার জন্য। তক্ষুণি এদের সবার বিবৃতি তাঁর কাছে এসে পৌঁছাল ; সেগুলির প্রত্যেকটিরই মূল সুর হল : নিজেকে বাঁচাও আর অন্য সবাইকে শেষ কর। তাদের কৈফিয়ত শুনলে মনে হয় যে এই সব কটি সমাজই অতি প্রয়োজনীয়। তাদের একে অপরের প্রতি অভিযোগ শুনলে মনে হয় যে এদের সব কটিকেই বিনাশ করা উচিত। তিনি চমৎকৃত হয়ে দেখলেন যে এদের মধ্যে একটিও নেই যেটি জগৎকে শিক্ষা দেওয়ার নাম করে জগৎকে নিজের সাম্রাজ্য বানাতে চায় না। একটি ছোটখাটো লোক তাঁর সঙ্গে এসে আলাপ করল; সে এক উপ-পুরোহিত। সে বাবুককে বলল "বেশ দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কাজ এবার সম্পূর্ণ হতে চলেছে ; কারণ জারাথুস্ত্র আবার ফিরে এসেছেন ; বালিকারা সামনে চিমটের আঘাত আর পেছনে ছপটি মেরে এই ভবিষ্যদ্বাণীই করছে। আপনি বড়ো-লামার কাছ থেকে আমাদের রক্ষা করুন।—সে কি! বলেন বাবুক, তিব্বতের যাজক-রাজার কাছ থেকে?—হ্যাঁ, তাঁর কাছ থেকেই।—তোমরা তাহলে ওনার সঙ্গে যুদ্ধ করছ, ওনার বিরুদ্ধে সৈন্য খাড়া করেছ?—না, কিন্তু তিনি বলেন যে আমরা নাকি স্বাধীন। অবশ্য তা বিশ্বাস করি না। আমরা তাঁর বিরুদ্ধে পুস্তিকা লিখি, তিনি সে সব পড়েও দেখেন না। তিনি আমাদের কথা শুনেছেন কিনা সন্দেহ ; শুধু তিনি আমাদের নিষিদ্ধ করেন যেন নিজের বাগানের সব গাছ থেকে শুঁওপোকা নির্মূল করার হুকুম দিচ্ছেন।" জ্ঞান যাদের পেশা তাদের এহেন নির্বুদ্ধিতা, যারা সব কিছু ত্যাগ করেছে তাদের এহেন ষড়যন্ত্র, যারা বিনয় আর ঔদাসীন্যের শিক্ষা দেন তাদের এহেন উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অহঙ্কার আর লোভ দেখে বাবুক শিহরিত হলেন। স্থির করলেন যে এই সব ঘৃণ্য মানুষকে নাশ করলে ইতুরিয়েল ঠিকই করবেন।

ঘরে ফিরে, নিজের বিরক্তি প্রশমিত করার জন্য বাবুক কিছু সদ্য প্রকাশিত বই আনতে পাঠালেন—একটু আনন্দ করার জন্য কয়েকজন বিদ্বজ্জনকে ভোজনের আমন্ত্রণ পাঠালেন। যত জনকে ডেকেছিলেন তার দুই গুণ এসে হাজির, যেন মধুর গন্ধে আসা বোলতার ঝাঁক। এই পরজীবীরা ছুটি উৎসাহে ভোজন আর বাগাড়ম্বরে ব্যস্ত হল। তারা প্রশংসা করল দুই ধরনের মানুষের, মৃতদের আর নিজেদের, একমাত্র বাড়ির কর্তা ছাড়া আর কোনো সমসাময়িক ব্যক্তির প্রশংসা তাদের মুখে এল না। তাদের মধ্যে কেউ যদি একটি ভালো কথা বলে ফেলল, তো অন্যরা চোখ নামিয়ে সে কথা নিজেরা বলতে পারেনি এই দুঃখে ঠোঁট কামড়াতে থাকল। পুরোহিতদের ফুলদানির তাদের মধ্যে রাখা ঢাকা অনেক কম কারণ পুরোহিতদের মত এত বড় মাপের আকাঙ্ক্ষা তাদের নেই। তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যুগপৎ নগরের চাকরি আর বড় মানুষের খাতির জন্য তোষামোদ করতে থাকল, অপমানকর কথা এ ওর মুখের উপর বলে তারা মনে করল যেন বড় একটা রসিকতা হল। বাবুকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের কিছুটা ধারণা ছিল। তাদের মধ্যে একজন নিচু গলায় বাবুককে অনুরোধ করল যে তিনি যেন এক লেখককে সাহায্য করেন, লেখকটি আজ পাঁচ বছর হল তার যথেষ্ট প্রশংসা করেননি। আরেকজন এক নগরবাসীর হাসে কামনা করল যে তার হাসকৌতুকে কোনোদিন হাসেনি। এক তৃতীয় ব্যক্তি চাইল আকাঙ্ক্ষেমির অকালমৃত্যু, কেননা কখনোই তার সঙ্গ ছেড়ে উঠতে পারেনি। ভোজন শেষে তাদের প্রত্যেকেই সেখান থেকে একা বেরোল কারণ তাদের মধ্যে এমন দুইজনও ছিল না যারা একে অপরকে সহ্য করতে পারে, এক সঙ্গে থাকা তো দূরের কথা। বাবুক ভাবলেন যে এই সব কীট যদি নগরের সাথে সাথে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তবে এমন কিছু ক্ষতি হবে না।

এদের কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েই বাবুক কিছু নতুন বই নিয়ে বসলেন। সেগুলির মধ্যেও তিনি যেন অতিবিদেরই দেখতে পেলেন। এই সব কেজাব ইলতাত্মার, কামনা, নীচতা আর ঘৃণার দ্বারা পরিচালিত এই সব কুকীর্তির সাগ্রহ, এই সব নীচ প্রহসন যা শত্রুদের বাঁচিয়ে রূপোতস্কে ধিক্কারিত করে, যেসবরকম কল্পনাশক্তিশূন্য এই সব উপন্যাস আর মধ্যে লেখকের অপবিচিত এই সব নারী চরিত্রের সমারোহ তাঁর মনে ঘৃণা আর ক্রোধের সঞ্চার করল।

ওই সব জঘন্য রচনা আগুনে নিক্ষেপ করে বাবুক সন্ধ্যেবেলায় বেড়াতে বেরোলেন। এক বৃদ্ধ মনীষীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল, পরস্পরকের ছিড় বাড়াতে তিনি তাঁর ভোজসভায় আসেননি। তিনি সর্বদাই ছিড় বাঁচিয়ে চলেন, মানুষকে চেনেন আর সেই জানকে কাজে লাগান, কথা বলেন অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে। বাবুক এই পণ্ডিতকে বহু মনস্কোষ্টে যা পড়েছেন ও দেখেছেন সেই কথা জানালেন।

"আপনি সত্যিই অনেক দেখ জিনিস পড়েছেন, মনীষী তাঁকে বললেন ; কিন্তু সকল যুগ, সকল দেশ ও সকল রীতিতেই খারাপের প্রচুর দেখা যায়, ভালো সত্যই বিরল। আপনার অতিথি হয়ে যারা গিয়েছিল তারা পণ্ডিত সমাজের জঞ্জাল, কারণ সকল পেশাতেই যারা প্রথমে আসার সব চেয়ে অযোগ্য তারাই সব থেকে নির্লজ্জভাবে দেখা দেয়। যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী তাঁরা এরই মধ্যেই বাস করেন, নির্জনে, শান্তিতে। এখনও আমাদের মধ্যে এমন মানুষ ও এমন গ্রন্থ আছে যা আপনার মনোযোগের যোগ্য।" তাঁরা যখন এইভাবে বাক্যালাপ করছেন তখন আরেকজন পণ্ডিত এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন ; তাঁদের কথোপকথন ছিল এত আনন্দদায়ক ও শিক্ষাপূর্ণ, সব রকম গোঁড়ামির থেকে এত দূরে উর্ধ্বে আর এতই ন্যায়সঙ্গত যে বাবুক স্বীকার করলেন যে এমনটি তিনি আর কখনো শোনেননি। "এঁরা এমন মানুষ, চাপা গলায় বলেন তিনি, যাঁদের খুঁতে ইকুইজিশনের সাহস হবে না, আর নয়তো বলতে হবে যে তিনি একেবারেই নির্বোধ।"

বিচক্ষণদের সঙ্গে মানিয়ে নিলেও বাকি পারসীয়দের উপর তাঁর রাগ তখনও ফোটে। "আপনি বিদেশী, যে বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনিই আবার বললেন, আপনার চোখে যত বিকৃতিই ধরা করে এসে ধরা দিচ্ছে, যা ভালো তা আছে লুকিয়ে, অনেক সময় এই সব বিকৃতি থেকেই তার জন্ম, সেগুলি কিন্তু আপনার নজর এড়িয়ে যাচ্ছে।" পরে বাবুক জানতে পারলেন যে পণ্ডিতদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছেন যাঁরা হিংসুক নন, এমন কি পুরোহিতদের মধ্যেও যথার্থই ধার্মিক মানুষ রয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি উপলব্ধি করলেন যে যদিও এই সব বড় বড় সংগঠনকে দেখে মনে হয় যে পরস্পরকে আঘাত হেনে এরা নিজেদের ধ্বংসই ডেকে আনছে তবুও যথার্থ উপযোগী প্রতিষ্ঠানগুলির পিছনে কিছু রয়েছে এরাই। বুঝতে পারলেন যে পুরোহিতদের প্রতিটি সমাজ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রহারের কাজ করে: বুঝলেন যে যদিও এই সব প্রতিস্পর্ধীদের মতামতে মাঝে মাঝে পার্থক্য দেখা যায় তবুও এরা সবাই কিন্তু একই নীতিশাস্ত্রের শিক্ষা দেয়, এরা জনসাধারণকে শিক্ষা দেয় আর নিজেরা আইনের বশ্যতা স্বীকার করে, ঠিক যেমন গৃহশিক্ষকরা ছাত্রের উপর নজর রাখেন ও গৃহকর্তা তাঁদের উপর। বাবুক এঁদের অনেকের সঙ্গেই আলাপ করলেন, অনেক স্বর্গীয় জ্ঞানের পরিচয় পেলেন। তিনি এমন কি এও জানতে পারলেন যে যেসব উন্মাদরা বড়-লামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে চাইছে, তাদের মধ্যেও অনেক মহান ব্যক্তি আছেন। শেষে তাঁর সন্দেহ হতে থাকল যে পার্সেপোলিসের রীতিনীতি হয়তো সেখানের অট্টালিকাগুলির মতই যেগুলির কোনোটির প্রতি তাঁর করুণা হয়েছিল আর কোনোটি তাঁকে প্রথমবার পরাজয়মুখ করেছিল।

বাবুক সেই পণ্ডিতকে বললেন : "আমি যেন বুঝতে পারছি যে যে পুরোহিতদের আমি অত বিপজ্জনক ভেবেছিলাম, তারা আসলে খুবই উপকারী, বিশেষ করে যখন বিচক্ষণ সরকার তাদের অতিরিক্ত অপবিত্রতা হতে উঠতে দেন না। কিন্তু আপনাকে অকপটে একথা স্বীকার করতেই হবে যে যে সব অপরিণত বয়স্ক ম্যাজিস্ট্রেটরা ঘোড়ায় চড়তে শেখার সঙ্গে সঙ্গে ই বিচারকের পদ ক্রয় করে তারা নিঃসন্দেহে বিচারালয়ে সবচেয়ে হাস্যকর অজ্ঞসন্বিতা আর সর্বাধিক বিকৃত অধিকারের স্রোত বইয়ে দেয়। এর থেকে নিশ্চয় এই সব পদ সেই বৃদ্ধ আইনজ্ঞদের বিনামূল্যে দেওয়া ভালো যাঁরা তাঁদের সারা জীবন কাটিয়েছেন ন্যায়াধর্ম ও বিপক্ষের যুক্তির ওজন করে।"

মনীষী উত্তর দিলেন "পার্সেপোলিসে পদার আগে আপনি আমাদের সেনাবাহিনী দেখেছেন ; আপনি জানেন যে আমাদের অল্প বয়স্ক অফিসাররা খুবই ভালো লড়াই করে যদিও তাদের পদ ক্রয় করেছে ; হয়তো আপনি দেখবেন যে এই সব যুবাদী ম্যাজিস্ট্রেটরাও আমাদের বিচার করে না যদিও তারা বিচার করার অধিকার ক্রয় করেছে।"

পরদিন তিনি বাবুককে বৃহৎ ধর্মাধিকরণে নিয়ে গেলেন; সেখানে সেদিন এক গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় দেওয়া হবে। সকলেই এই মামলার ব্যাপারে অজ্ঞাত। যে সব বৃদ্ধ উকিলরা এই মামলা সম্বন্ধে কথা বলছিলেন, তাঁদের সবার মতামতই বড় ভাসা-ভাসা; তাঁরা শপথনেক আইন উদ্ধৃত করলেন যেগুলির একটিও এই বিষয়ে যথার্থ প্রযোজ্য নয়। তাঁরা মামলাটিকে শুরু থেকে দেখলেন যাদের কোনোটিই পরিষ্কার নয়; উকিলরা অনিশ্চয়তায় যত সময় কাটালেন বিচারকরা তার থেকে অনেক শীঘ্র সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন। তাঁদের রায় হল প্রায় সর্বসম্মত ; তাঁরা সত্যিই সুবিচার করলেন, কারণ তাঁরা পথ চলেছিলেন যুক্তির আলোয়। অন্যদের মতামত ছিল অকেজো কারণ তাঁরা কেবল বইই ঘেঁটে ছিলেন।

বাবুক সিদ্ধান্ত করলেন যে বিকৃতির মধ্যে প্রায়ই অনেক ভালো জিনিস লুকিয়ে থাকে। যে ধনিকশ্রেণীর সম্পদ তাঁর কাছে অত ঘৃণ্য মনে হয়েছিল, সেদিন থেকেই তিনি উপলব্ধি করলেন যে তারও অনেক চমৎকার ফলশ্রুতি হতে পারে ; কারণ যদি সম্রাটের অর্থের প্রয়োজন হয় তবে সাধারণ পথে হয় তাঁকে তা পাবেন না তা তিনি এখান থেকে মাত্র এক ঘণ্টায় যোগাড় করতে পারেন; বাবুক বুঝলেন যে পৃথিবীর শিশির বিন্দু থেকে যে সংগ্রহ করে বৃষ্টিপ্রায় এই কিসলে সব মেঘেরা ধারাবর্ষণে পৃথিবীকেই সব ফিরিয়ে দেয়। তাছাড়া প্রাচীন পরিবারের সন্তানদের থেকে নব্য ধনী পরিবারের সন্তানেরা প্রায়শই বেশি শিক্ষিত হয়, তাই তাদের মূল্যও অনেক। সুবিবেচক পিতা জানলে সন্তানকে উৎকৃষ্ট বিচারক, নির্ভীক যোদ্ধা, কিংবা বিচক্ষণ কূটনীতিক হওয়া থেকে বাধা দেয় কার সাধ্য।

নিজের অজান্তেই বাবুক ধনিকশ্রেণীর লোভকে মার্জনা করলেন, গভীরে দেখতে গেলে এরা অন্য মানুষদের থেকে বেশি লোভী নয়, তা ছাড়া এরা উপযোগীও বটে। তিনি বিচার করার জন্য কিংবা যুদ্ধ করার জন্য নিজের অতি সাধনের নির্বুদ্ধিতাকে ক্ষমা করলেন, কারণ এই নির্বুদ্ধিতাই শ্রেষ্ঠ ম্যাজিস্ট্রেট ও বীরদের সৃষ্টি করে। তিনি পণ্ডিতশ্রেণীর ঈর্ষাকে ক্ষমা করলেন কারণ এদের মধ্যেই তিনি এমন মানুষদেরও দেখেছেন যাঁদের জন্য পৃথিবী উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও ষড়যন্ত্রকারী পুরোহিতদের সঙ্গেও তিনি মিটমাট করে নিলেন কারণ তাদের ছোট ছোট যা দোষ আছে তার থেকে গুণ আছে অনেক বড়। কিন্তু পার্সেপোলিসের বিরুদ্ধে তবুও তাঁর প্রচুর অভিযোগ থেকে গেল, বিশেষ করে নারীদের অবৈধ অভিসার ও তার পরিণতিতে নিশ্চিত ঘৃণ্য-দুর্ঘটনার কথা ভেবে তাঁর মন উৎকণ্ঠা ও আতঙ্কে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

জনকজহার প্রতিটি আনাচ-কানাচে ঢুকে দেখাই বাবুকের ইচ্ছা, তাই তিনি এক মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন ; পথে কম্পমান বাবুকের চোখের সামনেই খাদীর হাতে এক মহিলা নিহত হলেন। গন্তব্যে পৌঁছে তাঁর

আগমনের কথা মন্ত্রীকে জানানোর পূর্বে তাঁকে পার্শ্বকক্ষে দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল, জানাবার পরে কাটতে হল আরো দুই ঘণ্টা। অপেক্ষা করতে করতে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে ইভুরিয়েলকে বলবেন এই মন্ত্রী আর এঁর উদ্ধত ব্যবহারের নাম তাঁদের খাতায় তুলবে। পার্শ্বকক্ষটি সমস্ত শ্রেণীর মহিলা, সব প্রদেশের পুরোহিত, বিচারক, ব্যাপারী, অফিসার ও পণ্ডিতে ঠাসা; সকলেই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। কৃপণ ও সুবিধার বলছে : "নিঃসন্দেহে লোকটা রাজ্যপাট লুটন করছে", খামখেয়ালি বলছে লোকটা বড় উদ্ভট ; যে ইন্দ্রিয়পরায়ণ সে বলছে, "মূর্তি করা ছাড়া লোকটার আর কোনো চিন্তা নেই"; কুচক্রী গর্ব করে বলছে যে খুব শীঘ্রই তার বড়যন্ত্রে মন্ত্রীর পতন হতে দেখা যাবে; মহিলারা আনন্দ প্রকাশ করছে যে হয়তো খুব তাড়াতাড়ি এর চেয়ে আরো বড়ো এক মন্ত্রী পাওয়া যাবে।

বাবুক এদের কথোপকথন শুনতে শুনতে বলে ফেললেন "এই মানুষটি সত্যিই সৌভাগ্যবান : এঁর যত শত্রু সবাই এঁর পার্শ্বকক্ষে হাজির; যারা এঁকে হিংসা করে তাদের ইনি আপন ক্ষমতায় বলে চুরমার করেন ; আর নিজের পায়ের কাছে দেখেন তাদের মাথা এঁকে ঘৃণা করে।" অবশেষে বাবুক ঢুকলেন দেখলেন এক বৃদ্ধকে, অনেকগুলি বছর আর অনেক কাজের চাপে তিনি নুয়ে পড়েছেন কিন্তু এখনও তিনি জীবনশক্তি ও উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ।

বাবুককে তাঁর ভালো লাগল, বাবুকেরও মনে হল যে ইনি শ্রদ্ধার পাত্র। স্বাক্ষাৎলাপ চিত্তহর্ষক হয়ে উঠল। মন্ত্রী বললেন যে তিনি বড় দুঃখী; সবাই মনে করে যে তিনি ধনী কিন্তু আসলে তিনি দরিদ্র; সকলে মনে করে যে তিনি সর্বশক্তিমান অথচ সবাই তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করে; যাদের তিনি সাহায্য করেছেন তারা সকলেই অকৃতজ্ঞ; চল্লিশ বছরের বিরামহীন এই চাকরিতে তিনি এক মুহূর্তও সান্ত্বনা পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। মন্ত্রীর কথা বাবুকের মর্মস্পর্শ করল ; তিনি ভাবলেন যে যদি এই ব্যক্তি কোনো দোষ করে থাকেন যার দেবদূত ইভুরিয়েল এঁকে শাস্তি দিতে চান তবে এঁকে নাশ করার কোনো প্রয়োজন নেই, তাঁকে এই মন্ত্রিত্বে রেখে দেওয়াই হবে যথেষ্ট শাস্তি।

তিনি যখন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন সেই সময় আচমকা সেই সুন্দরী মহিলা সেখানে প্রবেশ করলেন যাঁর গৃহে বাবুক মধ্যাহ্নভোজনে গিয়েছিলেন। তাঁর নয়নে ও ললাটে রুষ্ট ও ক্রোধের চিহ্ন। ঢুকেই তিনি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগে কোর্ট পড়লেন, অনেক অনুযোগ করলেন; ভিক্ততার সঙ্গে অভিযোগ করলেন যে তাঁর স্বামীকে যে পদ দিতে অঙ্গীকার করা হয়েছে তাঁর বংশ মর্যাদাই তাঁকে সেই পদপ্রার্থী হওয়ার অধিকার দিয়েছে, তাঁর সেবা ও তাঁর জন্য তাঁকে সেই পদের যোগ্যপ্রার্থী করেছে; তিনি তাঁর বক্তব্য এত জোরালোভাবে উপস্থাপন করলেন, অভিযোগ করলেন এত সুচারুভাবে, এত কৌশলে সমস্ত প্রতিবাদকে ধূলিসাৎ করলেন, তাঁর যুক্তিগুলিকে এমন বাকপটুতায় সুশোভিত করে তুললেন, যে স্বামীর কাজ ফিরিয়ে তাবেই তিনি মন্ত্রীর কক্ষ থেকে বেরোলেন।

বাবুক ভদ্রমহিলার ব্যবহারে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। "এও কি সম্ভব, মহাশয়া, তাঁকে বললেন তিনি, যে কেই মানুষটিকে আপনি একেবারেই ভালোবাসেন না, যাঁকে ভয় করার আপনার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, তাঁর জন্যই আপনি এত কষ্ট করলেন?—যাকে আমি একেবারেই ভালোবাসি না! চিৎকার করে উঠলেন মহিলা। জানবেন যে গোটা পৃথিবীতে এত ভালো স্বামী আর আমি খুঁজে পেতাম না, একমাত্র আমার প্রণয়ীকে ছাড়া এমন আর কিছুই নেই যা আমি ওর জন্য ত্যাগ করতে পারি না, সেও আমার জন্য সব করতে পারে একমাত্র তার প্রণয়িনীকে ত্যাগ করা ছাড়া। আমি তার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব ; সে খুবই রমণীয় মহিলা, প্রণয়কলায়, সবরকম সম্ভোগের অধিকারিণী। আজ সন্ধ্যায় সে আমার এখানে খেতে আসবে, আমার স্বামী ও আমার প্রিয় পুরোহিতও থাকবে চলুন, আমাদের আনন্দ ভাগ করে নেবেন।

ভদ্রমহিলা বাবুককে নিজের গৃহে নিয়ে গেলেন। তাঁর স্বামী অবশেষে ফিরলেন, খুশিতে নিমজ্জিত হয়ে; স্ত্রীকে দেখে তিনি কতই আনন্দ আর কৃতজ্ঞতায় বিহ্বল হয়ে পড়লেন ; এক এক করে তিনি তাঁর স্ত্রীকে, স্ত্রীর প্রণয়িনীকে, পুরোহিতটিকে ও বাবুককে আলিঙ্গন করলেন। ভোজনের মূল সুর হল মিলন, আনন্দ, উৎসব ও কৃতজ্ঞতা। "শিখে রাখুন, বাবুককে বললেন সুন্দরী গৃহকর্ত্রী, যে মাঝে মাঝে যে নারীদের দুশ্চরিত্রা বলা হয় তাঁরা কিন্তু প্রায় সর্বদাই প্রকৃত সচ্চরিত্র পুরুষদের নিছনে থাকেন। যদি এই ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে চান তবে কাল চলুন আমার সঙ্গে সুন্দরী তেওনের গৃহে ভোজসভায়। অন্তেকজন বৃদ্ধা সতীসাধ্বী এর নিন্দা করলেও ও একা ওদের সকলের থেকে অনেক বেশি ভালো কাজ করে। অতি বড় স্বার্থ থাকলেও ও কখনোই কোনো অবিচার করে না তা সে অবিচার যত ছোটই হোক না কেন; প্রেমিককে সে উপদেশ দেয় পরম উদারে; তার গৌরবই তেওনের একমাত্র লক্ষ্য; তার প্রেমিকও ভালো কাজ করার একটি সুযোগও হাতছাড়া হয়ে গেলে তেওনের সামনে অতি লজ্জিত হয়ে পড়বে, কারণ যে রমণীনীর শ্রদ্ধা কাম্য সেই যদি আচার-ব্যবহারের সাক্ষী ও বিচারিকা হয় তবে তার থেকে বড় সৎকর্মের প্রতি উৎসাহ আর কী হতে পারে?"

বাবুক এদের সাক্ষাৎকারের সুযোগ ছাড়লেন না। তিনি দেখলেন যে সেই গৃহে সকল রকম সুখের রাজত্ব, আর সে সবের উপরে রাজত্ব করছেন তেওন। তিনি সবার সার্থে তাঁদের প্রণয়ের ভাষায় কথা বলেন ; তাঁর স্বাভাবিক চরিত্রগুণ সকলকে স্বাচ্ছন্দ করে, প্রায় বিনা প্রয়াসে তিনি সকলকে খুশি করেন। তিনি যেমন দয়ালু তেমনই পরহিতপরায়ণ ; আর তাঁর এই সব সদ্‌গুণকেই আরো বাড়িয়ে তুলেছে তাঁর সৌন্দর্য।

যদিও তিনি সীতিয় ও এক উপদেবতার প্রেরিত দূত, বাবুক বুঝতে পারলেন যে আর বেশি দিন পার্সেপোলিসে থাকলে তিনি তেওনের প্রভাব ইভুরিয়েলকে ভুলে যাবেন। তিনি এই নগরকে ভালোবেসে ফেলেছে, এখানের লোকেরা লঘুচরিত্র, পরনিন্দুক ও ধার্মিক হওয়া সত্ত্বেও মার্জিত, অমায়িক ও পরহিতপরায়ণ। বাবুকের ভয় হতে থাকল যে আর দেরি করলে হয়তো পার্সেপোলিসের বিরুদ্ধে রায় বেরোবে, এমন কি ইভুরিয়েলের কাছে বিবৃতি দেওয়ার কথা ভেবেও তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

এবার শুনুন বাবুক কি করলেন। নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ কারিগরকে দিয়ে তিনি একটি ছোট্ট মূর্তি তৈরি করালেন, সেটি তৈরি হল সব চেয়ে মূল্যবান আর সবচেয়ে খেলো সব ধাতু, মাটি ও পাথর দিয়ে; সেটিকে ইভুরিয়েলের কাছে নিয়ে গিয়ে তিনি বললেন : "সম্পূর্ণ স্বর্ণ ও হীরক নির্মিত নয় বলে কি আপনি এই সুন্দর মূর্তিটিকে ভেঙে ফেলবেন?" আর বিলম্ব করে না বললেও ইভুরিয়েল সবই বুঝতে পারলেন ; তিনি স্থির করলেন যে পার্সেপোলিসকে এমন কি সংশোধন করার চিন্তাও তিনি আর করবেন না, জগৎ যে রকম চলছে তেমনই চলুক। কারণ, ভাবলেন তিনি, সব কিছু ভালো যদি নাও হয়, সবই চলনসই। তাই পার্সেপোলিস যেমন ছিল তেমনই রইল; আর কথাই বাকল্য যে জিনোভেহ্‌কে ধ্বংস করা হচ্ছে না বলে জোনাস্ যেমন ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, বাবুক এতে একেবারেই তেমন কোনো অভিযোগ করলেন না। কারণ বুঝতেই পারছেন আরো আর কয়েকটি দেখে, ও উত্তম সন্দীপনের সাথে আয়ুর করে যেমন আনন্দে থাকা যায়, তিনদিন ধরে তিমির পেটে থাকলে তেমন খোশমেজাজে থাকা অসম্ভব।

ব · ই · প · ত্র

সুখ দুঃখের পালকে মোড়া একগুচ্ছ কবিতা

সুখ দুঃখের কবিতা—সম্পাদনা : কালিদাস ভদ্র মৌমাছি প্রকাশনী, ১৫৭ বেলে রোড ওয়েষ্ট, নবব্যারাকপুর, ২৪-পরগনা (উঃ) মূল্য :-৩৫ টাকা

উত্তর চব্বিশপরগনার নবব্যারাকপুর থেকে ক্ষুদ্র পত্রিকা মৌমাছি রণপায়ে হেঁটে পঁচিশ বছর অতিক্রম করল। সময়ের সীমানা ধরে সম্পাদক কবির দীর্ঘ ভ্রমণ, কবিতার প্রতি তীব্রিষ্ঠ ভালবাসা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে নিশ্চয়ই।

সম্প্রতি পত্রিকাটির পঁচিশ বছর পূর্তিতে দু'বাংলার বিশিষ্ট কবির কবিতা সহ বহু প্রতিশ্রুতিবান কবিতা নিয়ে এই কাব্য সংকলন 'সুখ দুঃখের কবিতা'। বিশিষ্ট শিল্পী অংশু দাশগুপ্তের যথার্থ প্রচ্ছদ চিত্র বইটিকে অর্থবহ করে তুলেছে।

সংকলনটির প্রথম কবিতাটিই দীনেশ দাশের গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত একটি মূল্যবান কবিতা দিয়ে শুরু। এছাড়াও আশাপূর্ণা দেবী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু গুণ, অলি মাহমুদ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তসলিমা নাসরিন প্রমুখের কবিতার ডালিতে পূর্ণ। এদের সাথে বিমল সেন, মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, নিমাই মাল্লা, অশোক ভট্টাচার্য, নিলাদ্রী ভৌমিক, পান্নালাল মল্লিক, কল্পনা ভট্টাচার্য্য, সংঘমিত্রা শর্মা পীযূষ মিত্র, অজিত কিবেদী, রাসবিহারী দত্ত, কালিদাস ভদ্র, উপানন্দ পাঁজলী, আবির সিংহ, অমল কান্তি চট্টোপাধ্যায়, তানাজী বসু, উৎপল হোমরায়, সনৎ বসু, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, রতন চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল সেন, উৎপল রায়, সন্ধ্যা চক্রবর্তী, মানিক ঘোষ, হান্নান আহসান, শৈবাল চাকী, সঞ্জয় ঘোষ, নন্দ দুলাল ভট্টাচার্য, ঝুমরা ভদ্র, সলিল দত্তরায়, রমেন রায়, মেঘধাসা বসু, শিখা সেন প্রমুখের মোট চুয়াত্তিশটি কবিতা রয়েছে।

প্রতিষ্ঠিত কবি নয় শুধু কবি, এমন কয়েকটি কবিতার উদ্ধৃতি তুলে ধরার লোভ সংবরণ করা যায় না। যেমন বিমল সেনের "তোমার পদ্য আসার কবি/পদ্য ভাসায় জলে/ছেলে মেয়ের হাত ধরে গল্প/ নিরুদ্দেশ চলে", পান্নালাল মল্লিকের "কাঁচ পোকার টিপ এখন আর পোয়েনা/ সবুজ শাড়িতে এখন আর সোজোনা/ মাঠে ফসল ফলেনি এবার," পীযূষ মিত্রের "আকাশতরা অলস ডাকে ঘুপুর/ বাজার বসে নুপুর, সেই নুপুর," সনৎ বসুর "বিকেলের কালো মুখ, পথ ছাড়ো, সখে/ নয়তো, একটার সূচীমুখে বিদ্ধ হও, মরো, রতন চট্টোপাধ্যায়ের, "অবিনশ্বর ঘুরে যায়/ তুমি আমি আমরা সকলে," রাসবিহারী দত্তের "মোমটার আকাশ থেকে বেপথু স্বাধীনতায়/ তারা এখন ঘোর বেহায়াচারী," শৈবাল চাকীর, "আ প্রমিথ্যুস, আমাকে ডেকোনা, নন্দ দুলাল ভট্টাচার্যের "অশ্বখুরের আওয়াজ তুলে/ ডাকতেই হয় গ্রামদেবী থাক", কালিদাস ভদ্রের "একলা তখন বাউল কিশোর/ খুঁজতে বসে কাশের বনে/ ছেলেবেলার নদী," উৎপল হোমরায়ের "ঘসতে ঘসতে, ঘসটে ঘসটে / শ্যামল বিকেল মিলিয়ে গেল।"

সাঁতা সৃষ্টির ফুলগাঁথে এ এত আশ্চর্য সুখ দুঃখের কবিতামালা। একে সযত্নে সংরক্ষণ করা উচিত।

স্বাধীনতা শব্দ শূণ্য শব্দ শোনা কান পেতে বসে থাকা

বিকেল ফুরিয়ে যায় কালিদাস ভদ্র ওয়ানটাচ প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, কলিকাতা-১৪, মূল্য-২০টাঃ

সত্তর দশকের প্রথম দুপুরে ক্ষুদ্র-পত্রিকা সম্পাদনার সাথে সাথে কবিতা লেখা শুরু। সত্তরের সেই যুগসন্ধিক্ষণ, ছিন্নমস্তা রাষ্ট্র শক্তির রক্তাক্ত নুপুরে পথ চলা এ কবি কখনও কখনও হয়তো একদম এগিয়েছেন আবার দু'কদম পেছিয়ে গেছেন। তবু কলম, কবিতা পত্রিকা একেবারে ছাড়তে পারেন নি।

মনে পড়ে জরুরী অবস্থার সেই কালো দিনে "নপুংসক নও তুমি/বলিষ্ঠ মুষ্ঠিতে তাজো /সত্তরের এ দশক" কবিতার জন্য তাকে নিগৃহীত হতে হয়েছিলো। তার পত্রিকা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রকাশ্য রাস্তায়। (সেদিন তার সাথী ছিলেন বিশিষ্ট কবি শৈবাল চাকী) তার কবিতাও জোড় উৎপন্ন করেছিল সেদিন যাদের।....)

প্রতিবাদে এই কবির কলমে সৃষ্টি হয়েছিল প্রতিবাদী এক চরণ কবিতার। এভাবেই গেড়া খুঁড়ে খুঁড়ে নিজস্ব অনুসন্ধানে আজ একপুর আত্মসমাহিত কবিকে পাওয়া যায় সম্প্রতি প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থটিতে। এক অদ্ভুত নষ্টালজিয়ায় ভরা এই পর্বের কবিতাগুলি। দেশভাগ-এর ব্যথা স্মৃতির দর্পণে ভেসে ওঠে এক যুবক নষ্টালজিয়ার" চাঁদ ডাকছে.....খুলনার খালিশপুর যাবার শৈশব পড়াঘর, চিলেকোঠা ছাদে/ বাদুড় উড়ছে" (পৃষ্ঠা-৩১) কিংবা" গমার গহন দেশের স্বপ্ন জোয়ার/ উঠুক মেতে তৈরব নদীর বুকের ভেতর" (পৃষ্ঠা-২৮)।

নিজের দেশ, ভাষা, মাতৃভাষা বিপন্ন হলে কবি একুশের ধ্রুব সত্যের কথা উচ্চারণ করেন দৃপ্ত কণ্ঠে "ভাষার আকাশ/ ধারাল বাতাস/ একুশ এলে/ ফেব্রুয়ারী, বর্ণমালার তুলো ওড়ে/মাতৃভাষা জমিন জুড়ে/বাংলা ভাষা নয় শিমুল গাছ"। (পৃষ্ঠা-২৭) আবার পরীক্ষাধর্মী দুটি মূল্যবান কবিতা 'যুগলকবী' ও 'অনুরোধ সংলাপ' যা নতুনভাবে নাড়া দেবে। শক্তি সবলে কবিতাটির কথা না বললে হয়তো অনেক অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে তাই "ধিক রে মরণ, কাঙাল তুই জীবনে / দাঁড়াস কেন অসময়ে। "পংক্তিটি তুলে ধরতে হয়" (পৃষ্ঠা-৩০)।

চিত্রকল্প প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত এ কবির "নতুন বছর জীর্ন, জরা ফেলে / এলোচুলে অভাব ঝনায় / সিঁদুরে টিপ পরে / আশাবরী একতারাতে বাজিয়ে বাতাস / ভাসায় বাউল ভাটিয়ালি।" (পৃষ্ঠা-২১)। বা "যু তুলে জেলে ডিঙি / ঢেউ ভাঙে" (পৃষ্ঠা-১৮) অথবা "বাবিশাল একসপ্রেস / কু কু ঝিক ঝিক /.....শিয়ালদহ বেনাপোল রেলপথ / দীর্ঘ ছায়ায়" (পৃষ্ঠা-১১)। লক্ষ ভাঁতির ঘর ঝিনু চিত্রকল্প যা নদী শান্তিতে বুনেছেন কবি তাও বহু যত্নে তোলা থাকবে নিঃসন্দেহে।

শুধু পরিশেষে যন্ত্র সভ্যতার আগ্রাসনে ব্যথিত কবির কণ্ঠে কলতে ইচ্ছে হয় "জোয়ান ব্যাটা দু'হাত কাটা, আলো ঝিকো কলে ঘোরে। কাজ খোওয়া যে আজ এক রূপকথা। যন্ত্রমানব ঘুরছে এখন পার্কিব এ মাটির ঘরে ঘরে। স্বাধীনতা শব্দ শূণ্য শব্দ শোনর কান পেতে বসে থাকা।" পৃষ্ঠা-২৯।

গ্রন্থটির প্রচ্ছদ শিল্পী 'নন্দন' পত্রিকার শিল্প নির্দেশক দেবাশিষ মিত্র। 'প্রচ্ছদটি বইটির আর এক জনন্য আকর্ষণ।

প্রতীক চট্টোপাধ্যায়

সাত ঘোড়ায় টানা সোনারগাড়ি

উট চলেছে মরুর দেশে
পরেশ সরকার
বঙ্গসাহিত্য ও লোক
সংস্কৃতি পরিষদ—
দঃ ২৪-পরগনা, মূল্য-২০টাঃ

'মরুরাজার রাজপ্রসাদে হোমরা চোমরা রাজার বাড়ি/ দেখাচ্ছো না ওই এসে গেছে সাত ঘোড়ায় টানা সোনার গাড়ি''—পরেশ সরকারের এ নির্মাণে ভুতানি নেই, সংবেদনশীল ভাবনা এসে মিশেছে কল্পনায়। ছড়ায় জন্ম নিয়েছে গল্প গাথা। কিশোর জীবনের স্বপ্ন। কক্ষ, নিষ্প্রাণ ঘর মরুর মধ্যেও তার ছড়াপুরীর সৌকর্য ও বিস্তার ঘটিয়েছেন।

পঁয়তাল্লিশটি ছড়া আর একটি ছড়া নাটিকা নিয়ে এই গ্রন্থ 'উট চলেছে মরুর দেশে'। প্রথম ছড়া সোনার কেল্লার দেশে কিশোর মনকে কল্পনা ভেলায় চড়িয়ে কবি যাত্রা সুরু করেছেন 'চারিদিকে তার বিশাল প্রাচীর/কত যে প্রাসাদ কত যে উজির'। আবার কখনও ঝরনাগরের পল্লী প্রকৃতির গন্ধে ভরপুর ছড়ায় পাওয়া যায় 'ঘাবে নাকি নদের দেশে/বৃন্দাবনী শীতে বেড়াব ভেসে' নস্টালজিয়া। করুণ ব্যথাও কবি-দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি বলেই চড়ক তলার লোকজ সংস্কৃতির চিত্রকল্পে গ্রাম্য দুঃখ, যন্ত্রণাকে তুলে ধরেছেন 'সেই মেয়েটা' ছড়ায় 'পায়ে জড়ায় ধুলোর মেলা/মুখ ভারি তার, সে হাসে না/কদিন আগে চৈত্র মাসেই/না তার পেয়ে মেয়ের দেখে/বিশ্বকাপ ফুটবল, বাদলা দিন, সুন্দরবনের বাঘমামার গল্পও সমানভাবে কিশোর মনকে মাতিয়ে রাখবে। রোমাঞ্চে টানটান মন এক নিশ্বাসে পড়ে নেবে'' সৌদর বনের তিনি শিকার নথর লেজটি নাড়ে। বিশাল ভালে সোনালি রঙের নথর হরিণ মারে/বনবে বাঁপায় খোপ মেজাজে যখন ছাড়ে ডাক/ঝরা বাথার পাছে যাঁরা পাখিরা বলে ভাগ। কিংবা 'অন্ধকারে ভূতের ছড়া গোলাছিল ঠ্যাঙ/চামচিকেটা সে ঠ্যাঙ ধরে দুলছে দোদুল দুল' ভোলা যায় কি?

পরিশেষে বলতে হয় 'ছড়া নাটিকা' 'মরুরাজার মেয়ে মরনামতী' বইটিতে কবি একটি উঁপরি পাওনা আমাদের দিয়েছেন। যা দুর্গম এবং মরুভূমির মধ্যে মরুদ্যানের মত লোভনীয়। ছড়ার ছন্দের জন্য অপেক্ষা নয়—কবিতার আবহমান ধারায় মিশে মিশে গেছে। আমজনতার কবি পল্লীপ্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে লালিত পরেশ সরকার তাই জীবনের সুখ, দুঃখ, স্বপ্ন, আনন্দকে ছড়াপুরীর দোরগোড়ায় তাজাঁপড়ার রহস্যময়ী সাহসী স্রষ্টা কারিগর রূপে হাজির করেছেন।

ছন্দময় সংলাপ নাটকীয় সংঘাতে পোশন সম্বন্ধে একটু একটু করে উন্মোচন করে গভীর ব্যঞ্জনায় অনুরণন তোলেন কবি 'তুমি তো মরুরাজার মেয়ে'।

তবে 'আর্থিক' সীমাবদ্ধতায় সম্ভবত বইটির ভেতরে অলংকরণ অনুপস্থিত রয়েছে। ফলে খানিকাংশে খুশ হবে। এ, ভট্টাচার্যের প্রচ্ছদ খুবই আকর্ষণীয়।

কালিদাস ভদ্র

ব্যাঙমা বলে ব্যাঙমী

ভোড়ায় বাঁধা ছড়া
কালিদাস ভদ্র
ক্রান্তিক প্রকাশনী

ছড়ায় সুর, ছড়ায় গান বা ছড়ায় ছবি, এককথায় ছবি ও গান লেখা হয়েছে কালিদাস ভদ্রের ভোড়ায় বাঁধা ছড়ার সব কটি রচনাতেই। শুধু লেখাই নয়, ছন্দের ভোড়ায় ও কথার স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে ছড়াগুলি ঝরণার অনাবিল আনন্দে যেন নেচে নেচে উঠেছে। 'ঝরণার নাচ' এই বইটির শেষ ছড়াটির নাম। কবি লিখেছেন, ওর ওর মেঘ ডাকে/ঝুরু ঝুরু ঝরণা/পাহাড়ের গা বেয়ে/নেচে নেচে নামে/ বনপথ পেরিয়ে/ কত দেশ বেড়িয়ে/শেষ শেষে সাগরে/নাচ তার থামে/

শিশুরা ছড়া শুনতে ভালোবাসে, কিশোরেরা পড়তে ভালবাসে আর বয়স্কেরা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করতে চায় সেই শিশু-কিশোর পাঠ্য ছড়াগুলি। অর্থাৎ, ছড়ার পাঠক-পরিধিতে বয়সের কোন সীমারেখা টানা যায় না। ছড়া সব বয়সের সকল মানুষেরই কড়ই আদরের ধন। কালিদাসের ছড়াগুলিও সব বয়সের সব পাঠকের আলাদা-আলাদা রুচির চাহিদা মিটিয়ে দিতে পারবে বলেই মনে হয়। তবে এ প্রসঙ্গে তার প্রেরণা ও প্রভাবের উৎস সন্ধানও দরকার। আমাদের শিশু-কিশোর সাহিত্যে 'হাসি খুশি'-কে নিয়ে এখনও চলেছে মাতামাতি, সুনির্মল বসুর সেই কবি মনস্তত্ত্বী তাবুক কিশোরটির আকাশে ওঠা সূর্য টকটকে লাল অথবা তার ছন্দ পড়া ও ছন্দ ভাঙার সেইসব অবিস্মরণীয় ছড়াগুলি এবং সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' ও অন্যান্য যুগন্তকারী কবিতাগুলি আর ইদানিংকালের ছড়ার রাজা প্রদাশঙ্করের সেই বেড়ালটা না ফেরালটা বা তেলের শিশি ভাঙলো বলে অথবা মশায়, দেশান্তরী করলে আমায় কেশনগরের মশায়-এর সেই বকবকে সংযোজন 'মশাবি যে মশার অবি/ শুনেছি কাহিনী/ দুষমনকে ধোর খুলে ধোব/ পঞ্চম বাহিনী ইত্যাদি প্রবাদ প্রতীম ছড়াগুলি চিরকাল শিশু কিশোর যুবা ও প্রবীন পাঠকদের তাতিয়ে মাতিয়ে রাখবে। এরা কালিদাসকেও ছড়া লেখার জন্য সমানভাবে তাতিয়ে দিয়েছে। এমন কি তার ছন্দ ভাষা ও ভঙ্গিকেও প্রভাবিত করেছে।

কালিদাসের ছড়ায় এইসব স্বনামধন্য পূর্বসূরীদের প্রেরণা ও প্রভাব কালিদাস কিন্তু সগর্বে স্বীকার করে নেবে। কারণ কবি হিসাবে এতে তাঁর মর্যাদা বেড়ে যাবে। একটু বিশদ করে বলি, মহাজনের পন্থা অনুসরণ করে তো শিশু সাহিত্যের মূল স্রোতে সে সামিল হবার সুযোগ পেল। সাহিত্যের সমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করলো। কালিদাসের কবি জীবনে এর মূল্য কম নয়।

অবশ্য তাঁর আধুনিক ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী মনের প্রেরণায় কালিদাসের অনেকগুলি ছড়া যে মৌলিকতায় সমীর হয়ে উঠেছে সে কথাও আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। যদিও সেই বৈশিষ্ট্য অপেক্ষাকৃত প্রবীন পাঠকের চোখেই ধরা পড়ার সম্ভবনা।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ সংকলনের প্রথম ছড়াটির কথাই বলা যাক।

ব্যাঙমা বলে ব্যাঙমী/ কথাটা শোন খুব দামী/ ওই দেখেছিস মস্ত পুকুর/ ওর ওপরে রাজার বাড়ি,/ রাজার আছে সাতটা কুকুর/ পেট ভরে খায় মাংস কাঁড়ি। /আমরা মরি কিদের জ্বালায় /খু-খেলা খাই পোকা মাকড়, /গায়ে যদি থাকতো রে জোর /ইচ্ছে করে ঠুকরে মারি...

(ব্যাঙমা বলে ব্যাঙমী—পৃঃ)

কালিদাসের ছড়া বাচ্যার্থে সরল হলেও ভাবার্থে যে গভীর অর্থবহ ব্যাঙমা-ব্যাঙমীর কথোপকথন কি সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে না।

'ভোড়ায় বাঁধা ছড়ার' সামগ্রিক সাফল্যের কৃতিত্ব কিন্তু কবির একলারই নয় শিল্পী-সুদর্শন চক্রবর্তীর চক্ষু সুখকর ও মনোরঞ্জনকর ছবিগুলি এই বইএর আকর্ষণ যে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে, একথা কালিদাস নিজেই মেনে নেবেন। আমরা তো মানবোই।

মোটকথা, কবি কালিদাসও শিল্পী সুদর্শনের আরো অনেক যুগলবন্দী আমরা দেখতে চাই, শুনতে চাই পড়তে চাই।

বিমল সেন

স্বাধীনতার স্বরূপ

বিমল দাস ঃ মূল্য-২৫ টাকা
ক্রান্তিক প্রকাশনী ব্লক-৫,
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৭৩

স্বাধীনতার ৫০ বছরে শ্রী বিমল দাসের স্বাধীনতার স্বরূপ নিশ্চিত ভাবেই একটি মূল্যবান গ্রন্থ। লেখক তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন—'নব প্রজন্মের কথা মনে রেখে জীবনের একটি পবিত্র কর্তব্য পালন করি।

তথ্যনিষ্ঠ এই বইটিতে তদানীন্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী আর্ল এটলি সহ বহু বিদেশী ও স্বামী বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে বহু ভারতীয় লেখকদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। এর সাথে যোগ হয়েছে প্রায় ২০০ বছরের কৃষক বিদ্রোহ ও গণআন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। নেতাজীর একটি লেখাকে ভিত্তি করে লেখা ''মুখোশের অন্তরালে বৃটেন''—এইপর্বে বৃটেন কিভাবে হিটলারের উত্থান পর্বে মদত দিল তার এক প্রামাণ্য প্রতিবেদন লেখক রেখেছেন। ইতিহাসের গর্ভে লুকিয়ে থাকা একটি সত্যের উন্মোচন করেছেন। 'এক নদী রক্ত' পর্বটি খুবই মর্মস্পর্শী। ১৯৪৬-৪৭ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাটি আসলে কি ছিল ও তার ফলে হিন্দু মুসলীম সাধারণ ভারতবাসীর কত রক্ত ঝরেছিল তার একটি প্রামাণ্য বিবরণ দিয়েছেন। 'ক্ষমতা হস্তান্তর হল কেন'—পর্বে যেমন বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করেছেন তেমনি 'প্রবনতা দেশে দেশে'— পর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর—জ্বালে দেশে দেশে বৃটেনের চালাকিটিও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 'কমনওয়েলথ' কি 'আমবাসাডর' ও 'হাই কমিশন' -এ পার্থক্য কি এগুলি যেমন আছে তেমনি আছে 'ভারত শাসনবিধি' ১৯৩৫, Indian Independence Act ও ভারতীয় সংবিধান সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা, আছে কংগ্রেসের জন্ম কিভাবে, তার মানসিকতা কি ছিল ও তার ক্রম- বিবর্তন, এবং কংগ্রেস, মুসলীম-লীগ ও কম্যুনিষ্ট পার্টির তৎকালীন অবস্থান।

বইটিকে ১২টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি পর্বই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনে হয় লেখক বইটির প্রতি একটু অবিচারই করেছেন। বিষয়গুলি আরও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হলে ভাল হতো। লেখক যদিও এ বিষয়ে সজাগ। তাই তিনি বলেছেন—'আরও বহু তথ্য সন্নিবেশিত করা যায়। বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি ও পাঠকের ধৈর্যচ্যুতির কথা মনে রেখে তা থেকে বিরত রইলাম।' নিম বাইন্ডিং-এ ৮০ পৃষ্ঠার বইটির প্রচ্ছদ আকর্ষনীয় তবে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ পরিলক্ষিত হয়।

সুন্দর রায়।

কেমন করে অস্বীকার করি

নলীগোপাল দাস

তরুণ কবি ননীগোপাল দাসের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কেমন করে অস্বীকার করি'। নতুন কবিতার বইয়ের মলাট হল প্রথমেই সেটি আগ্রহোদ্দীপ্ত পড়ে নিতে ইচ্ছে করে। জানতে ইচ্ছে করে কবির মনের কথা কেমন করে ফুটে উঠেছে তাঁর কাব্যের পরিসরে। এই আগ্রহ থেকেই কবিতাগুলি পাঠ করা যখন সম্পূর্ণ হল তখন দেখলাম আকারে ছোট কবিতাগুলি কিছু কিছু ভাব প্রস্ফুটিত করেছে এবং তা খুবই সংহত ও সমাজমনস্ক। কাব্য নির্মাণের অনাড়ম্বর রূপে সহজেই একটা টান অনুভূত হয় এবং কবিকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারা যায় না। প্রথম আকাশ কবিতায় কবি যখন বলেন আমার গৃহদাহ আছে অবারিত/ অন্তরে আসতে পারো/যদি সাথী হও/কলকাতা হয়ে উড়ব কোথাও। তখন মনে হয় কবি একা নন, একা হয়তেও তিনি চাননা। ব্যাপক মানুষের সাথে সখ্য, মানুষীর সাথে প্রেম, সমুদ্রের মুখোমুখী হয়ে তার প্রণোদ্যাসে আন্দোলিত হওয়া এইতো জীবনের নির্ভেজাল রহস্য।

কিন্তু, শুধু প্রণোদ্যাসে ভেসে যাওয়া নয়, মৌচাক ভাঙতে যাবার রোমাঞ্চকর শিহরণও কবির অন্তরতলে করে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তেমনি কবি বেঞ্জামিন মোলায়েজের ফাঁসিতে আলোড়িত হয়েছেন ননীগোপাল। পথ চলার কঞ্চ কবির কবিতায় বারে বারে এসেছে। শ্রমিক কৃষক শোষণ বঞ্চনা সব কিছুকেই ধরেছেন কবি তাঁর কবিতায় ইঙ্গিতে। আলোর নিশানাহীন পথকে কবি নিজের ভাষায় বারে বারে অঙ্কিত করেছেন। কবির এই নিজস্ব ভাষাই তাঁর স্টাইল। শেষতক সেটা ভালোই লাগে। আশাকরি ননীগোপালের এই কাব্যগ্রন্থ, ননীগোপালের এই আন্তরিক প্রয়াস পাঠকবর্গকে একটা সুন্দর অভিজ্ঞতা দিতে সক্ষম হবে। তবে ভালো কবিতার পাঠক হিসাবে আমাদের প্রত্যাশা বিস্তৃত। আগামী দিনে কবির কলমে আমরা সেই প্রত্যাশা আরো বেশি করে লক্ষ্য করব এমনটা ধরে নিতে পারি। পরিপাটি এই বইটির দাম ২২.০০ টাকা।

বৈদ্যনাথ কলেজপাড়ার

সামাজিক বোধের আলো শিশুমনে

ভুটিয়া

ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য
ক্রান্তিক প্রকাশনী,
কলকাতা-৭৩
মূল্য-তিরিশ টাকা

আত্মপ্রকাশের মুহূর্ত থেকেই ঋতুপর্ণা কেনে ফেলেছে গল্প ছাপা হলেই গল্পের লাইন চুরি যায়। ওর এই উপলব্ধির মধ্যে শিশুসুলভ মনোবৃত্তির প্রকাশ ঘটেছে।

সাহিত্য যে 'জীবনের সমালোচনা', বোধে পৌঁছানোর জন্য ঋতুপর্ণাকে সাহিত্য-সমালোচনা আলোচনার সাহায্য নিতে হয়নি। নিজস্ব ভাবনার জগত থেকেই এই সত্যকে সে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তার গল্পে স্বাভাবিকভাবেই এসেছে সমসাময়িক সমাজ ও মানুষ, মূল্যবোধের অবক্ষয়, স্বার্থপরতা, বন্ধুত্ব, সহানুভূতি-সম্ভার মানবিক সৌন্দর্য। আধুনিক শিশু সাহিত্যে অপরাধ-কাহিনীর প্রধান্য যে তার মনকে প্রভাবিত করেনি, তা সত্যিই লক্ষনীয় ব্যাপার।

সাত বছর বয়সেই ঋতুপর্ণার প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায়। 'তিন মাছের গল্প'। লাল, কালো আর নীল রঙের মাছ এক দীঘিতে বাস করত। ওদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। একদিন কালো মাছের সঙ্গে লাল মাছের ঝগড়া হতেই, লাল ও নীল মাছ সেই দীঘি থেকে তাড়িয়ে দিল কালো মাছকে। কিন্তু ওরা একদিন বুঝতে পারল বন্ধুকে তাড়িয়ে দিয়ে খুবই অপরাধ করেছে। সে কথা কারো কাছে প্রকাশ করতে না পেরে নিজেরাই মনস্তাপে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। একদিন সেই কালো মাছের প্রাণহীন দেহ ওরা দেখতে পেল পুকুরের পাড়ে। হয়ত আত্মহত্যা করেছে। কাকগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। ওরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গল্পটা এইখানেই শেষ হলে ভালো হতো। মাছেরও অভিমান আছে, ভালোবাসা আছে—গল্পের শেষে এই কথাগুলো লেখা না হলেও পাঠক বুঝে নিতে পারত গল্পের মধ্যে কোন বক্তব্য লুকিয়ে আছে।

ক্যানসার রোগের ওষুধ তৈরি করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গবেষণা চলছে এ খবরও ঋতুপর্ণার কাছে পৌঁছে গেছে। 'মৃত্যুঞ্জয়' গল্পে

সেই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত অসহায় মানুষের চিকিৎসার জন্য শুধুই আবিষ্কারের ঘটনা নিয়ে এক আবেগসঞ্জল কাহিনী বয়ন করেছে ঋতুপর্ণা। ডঃ হেন মাকে দুরিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আর কোন মাকে এই রোগে আক্রান্ত শিশুর মৃত্যুবরণ করতে দেবেন না। তাঁর পরিশ্রম সফল হলেও তিনি নিজেই আক্রান্ত হলেন সেই ব্যাধিতে। যিনি নিজের জীবনের বিনিময়ে মারণ ব্যাধির হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার ওষুধ আবিষ্কার করেছেন তিনি তো সত্যিই মৃত্যুঞ্জয়। পোষা বেড়ালকে নিয়ে কাহিনী শুরু করতে গিয়ে ঋতুপর্ণা আমাদের বুঝিয়ে দেয় ভালোবাসা আর বাইরের সৌন্দর্যের তফাৎ কোথায়। ভুলো বেড়াল টুসুর কপালে জুটেছে অবজ্ঞা যেহেতু নতুন বেড়াল ন্যাপ-এর দৌলতে সৌন্দর্য বাড়ির সকলের মন আকর্ষণ করেছে। সেই ভোঁদু যখন মারা গেল, এক বিয়োগান্ত পরিণতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঋতুপর্ণার উক্তি—প্রায় কোনদিন এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর বুকে জন্ম নিস না, এখানে ভালোবাসার কোন অধিকার নেই, আছে শুধু সৌন্দর্যের দান—আমাদের নতুন উপলব্ধিতে পৌঁছে দেয়। বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার প্রসঙ্গ বারেবারে এসেছে ঋতুপর্ণার গল্পে। মিথ্যাবাদী, ভালবাসার ওরী, অভিমান, ভুটিয়া-প্রভৃতি গল্পে ঋতুপর্ণা দেখাতে চেয়েছে মানুষের মনে ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব অনেক দুঃখময় স্মৃতি এঁকে দিয়ে যায়। 'ভুটিয়া' গল্পে অবশ্য বন্ধুত্ব থেকে কর্তব্যবোধই বড়ো হয়ে উঠেছে। বিচারক অপরাধী ভুটিয়াকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেও তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেনি মিঠাদিদি। ভুটিয়াকে নির্দোষ প্রমাণ করার সুযোগ থাকলেও সামাজিক ন্যায়নীতি বোধ মিঠাদিদিকে অন্যায়ের পথে পা বাড়াতে দেয়নি। 'বাবার উপহার', 'সেই ছেলেটা', 'ঠাকুমা', 'স্মৃতি', 'সেই হাঁসটা', 'কৃতি'—প্রভৃতি গল্পের পরিণতি বিয়োগান্ত। জীবন দিয়ে যাকে শুধু হারিয়ে যাবার খেলা, এই বাস্তবিক উপলব্ধি ঋতুপর্ণার বোধের জগতকে পরিণত করে তুলেছে। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই কাহিনী-বিন্যাসে আবেগের উপস্থিতি ঘটনার সম্ভাব্যতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। 'ঠাকুমা' গল্পে ঋতুপর্ণা লিখেছে—'ঠাকুমা বলল, আমি দেব কিছুনি, সবার আগেতে ঠাকুমা কিছুনি নিলেন।' এমন ঘটনা কি সত্যিই ঘটতে পারে? সবে শুরু করেছে ঋতুপর্ণা। এখনই আমাদের নিশ্চিত করে তোলার মতো অবকাশ এখনো ঘটিয়েছে। ও আরো পরিণত হয়ে উঠবে এই আশা নিশ্চয়ই করা যায়।

গল্প-সংকলনটির মুদ্রণ-পরিপাট্য প্রশংসার যোগ্য। প্রচ্ছদ ও অলংকরণে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন দর্শীপ দাশ ও শান্তনু চক্রবর্তী।

প্রণব সেন

তুমি নির্মম হলে বলেই

সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়
সেঁজুতি, মধ্যমগ্রাম

কবি সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ইতিমধ্যেই পাঠক সাধারণের নজর কেড়েছে। এই সংকলনের প্রত্যেকটি কবিতা শৈলী ও সৌকর্যের নবীনতায় উদ্ভাসিত। বাংলার কবিতার জগতে এই উজ্জ্বল সংযোজনের জন্য কবি সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের প্রাপ্য।

কবিতা সেতো কবিতাই। মনের কোনও সীমান্ত থাকে না। কবির কবিতায় আছে বিষণ্ণ উদাস ছবি। অব্যক্ত বেদনা, বিষাদে মেদুর। খুলে দিয়েছেন বহু ভণ্ডামীর মুখোস। মেলে ধরেছেন বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার এক অপরূপ প্রতিচ্ছবি এমনকি তাঁর ভাবনার অনুষঙ্গগুলি আকর্ষকও বটে। সুরজিৎ বাবুর কেন কয়েকটি কবিতার অনুভূতিশীল মনের পরিচয় সর্বত্র ছড়ানো। তার সঙ্গে 'নবজন্ম', 'সুখ', 'কারো চোখে চোখ রেখে', 'স্মৃতি তুমি', 'সৃজন' ইত্যাদি।

কবিতাগুলি পড়লে মনের গভীরে সৃষ্টি হয় অন্তর্দাহন, পাওয়া যায় অনুভবের ভাষা।

কবিতার ভুবিতে সুরজিৎ বাবু নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে যাবেন নিজগুণে কিন্তু তাঁকে মনে রাখতে হবে কবিতা সাধারণত ধরে রাখে কবির অনুভব উদ্ভাস ও পরিপার্শ্ব।

পরেশ বসু

ভূমিজ দর্পনে সভ্যতা

বিমলেন্দু চক্রবর্তী
দীপশিখা প্রকাশন
২২/২এ বাগবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা-৩

বাংলা ভাষায় শুভাচিত্র সম্বন্ধে পরিচিত লেখক শ্রী বিমলেন্দু চক্রবর্তী একজন সফল চিত্রশিল্পী। উপন্যাস রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। কিশোর সাহিত্যেও তাঁর সমান পদ সঞ্চার। জীবন সমাহারে তাঁর বোধ বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটেছে বর্তমানে আলোচ্য "ভূমিজ দর্পনে সভ্যতা" নামক নিবন্ধ গ্রন্থে। বিভিন্ন সময়ে রচিত অথবা সেমিনারে প্রদত্ত ভাষণের মুদ্রিত রূপ সাতটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সংকলিত। বাংলা ভাষা ও বাঙালীর সংস্কৃতির বিবর্তন সম্পর্কে কিছু সারগর্ভ আলোচনা করেছেন সুবিজ্ঞ লেখক, যা আমাদের অবরুদ্ধ বুদ্ধির দিগন্তে আঘাত করে।

"সিন্ধুর পদতলে বাঙলা ভাষা" প্রবন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন "ইংরাজী ভাষা আমাদের পুষ্টির উপায় না হয়ে, অবলুপ্তির পথ খুলে দিয়েছে" কিনা? তিনি বলেছেন প্রত্যেকটি জাতির একটা জাতীয় উদ্দেশ্য আছে। জাতির রীতিনীতি আচার-আচরণগুলির নেপথ্যে চালিকা শক্তি হচ্ছে সেই জাতীয় উদ্দেশ্য। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বাঙালীর জাতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধি ইংরাজী ভাষা ব্যবহারের দ্বারা বাধিত হয় নি। ইংরাজী ভাষার প্রতিষ্ঠা লেখক দেখেছেন বণিকদের উত্থানের মধ্যে। হীনমন্যতা বোধ ইংরেজী ভাষা প্রতিষ্ঠার পটভূমি।

লেখকের মূল বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়েও বলা যায়, তিনি সংস্কৃত ভাষার প্রসঙ্গ অনাবশ্যক টেনে এনেছেন। আমাদের মনে হয়েছে এইখানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অনৈতিহাসিক। এই প্রসঙ্গে আছে নানা ভাবের সংঘাত। অনেকটা আপ্ত বাক্যের মতো তিনি উচ্চারণ করেছেন—লোকায়ত বাঙালী শিক্ষিত বাঙালী অপেক্ষা অনেক বেশি পরিমাণে মানবিক নীতিবোধ পূর্ণ ও মুক্ত চেতনার মানুষ। এই লোকায়ত মানুষকে তিনি বলেছেন ভূমিজ। এদেরই দর্পনে তাঁর আলোচনা চলেছে বিভিন্ন প্রবন্ধে।

'ভূমিপুত্র ও মানব সভ্যতা'। প্রবন্ধে লেখক বলেছেন : "মানবিকতার বিকশিত রূপ আছে ভূমি পুত্রদের জীবন চর্যায়। মানুষ ও জীবন চর্যা রূপ নেয় ভূমি অবলম্বনে।" মনে হচ্ছে লেখকের চিন্তাধারা একটু একপেশে। হিন্দু রিচুয়ালস্ তাঁর চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। "লেখক যারো প্রমাণ করতে চেয়েছেন আমরা সভ্য মানুষেরা অমঙ্গলহীন অবাস্তবিক এক জীবনের নমুনা। আমাদের ভাবনা চিন্তা যুক্তি বুদ্ধি জীবন যাপনের পদ্ধতি স্বভিরোধের পথ ধরে চলে।" তাই 'ভূমিপুত্র ও মানব সভ্যতা' প্রবন্ধ যত না বক্তব্য ভূমিপুত্রদের সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশি আমাদের মত সভ্য মানুষের স্ববিরোধিতা ও অন্তঃসারশূন্যতার কথা।

পরের প্রবন্ধে 'লোক চর্চার তামস মিনার'। মানব কেন্দ্রিক চিন্তা থেকে যতগুলি বিজ্ঞান জন্ম নিয়েছে লোক চর্চা তার একটি। সেই লোক চর্চা বিজ্ঞান সঠিক পথে এতবার নির্দেশ দিয়েছেন লেখক এই প্রবন্ধে। লেখক দেখিয়েছেন ইউরোপে রেণেসাঁর যুগে সূচনা হয়েছিল লোক চর্চার। লোক সমাজ কুসংস্কার ত্যাগিদের পশ্চাতে আছে উপনিবেশ করায়ত্ত রাখার প্রচণ্ড আগ্রহ। তাই প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে কিন্তু জাতির মানস লোকের সন্ধান করা হয় নি। আমাদের লোক চর্চার ঘুটো ধারা স্পষ্ট। একটা কোরিয়ার নির্ভর কেতাবী ধারা। অন্য ধারা সুপ্ত মনের আকুতি। দ্বিতীয় ধারাই লোক চর্চার যথার্থ ধারা। লোক চর্চা হল : "হারিয়ে যাওয়া স্বজনদের খুঁজে বেড়াবার এক আবেগময় অভিযান।"

"আদি বাঙালী ও পরবর্তী কাল"। প্রবন্ধে ইতিহাসের জন্ম এইভাবে বিবৃত করা হয়েছে : "আত্মকামী মানুষেরা লোক সমাজের বিদ্রোহীর জন্মদাতা নায়ক। সমষ্টি চেতনার সমনে বিপরীত চরিত্রে এরা আত্মপ্রকাশ করে আত্ম প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা তাদের চরিত্রের প্রধান রূপ। সমাজের সম্মুখভাগে থেকে মানুষের মৌল ধর্ম বিরোধীরা বনে কাহিনীর নায়ক হয়ে ওঠে। এই সব ব্যক্তিকেন্দ্রিক, মানুষের ইতিহাস হলো মানুষের সভ্যতার ইতিহাস।" এইভাবেই উচ্চ বর্গের উত্থান ঘটে। তাই লেখক দেখান যে, চতুর ব্যক্তি স্বার্থ সন্ধানী মানুষের আবির্ভাব ঘটে বলে শ্রেণী বিভক্ত সমাজের পটভূমিকায় প্রাচীন বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাসের ছবি দিয়েছেন লেখক। এই প্রবন্ধে লেখক ইতিহাসে ব্যক্তির উত্থান সম্পর্কে চিন্তাকর্ষক বক্তব্য রেখেছেন "ইতিহাসের ক্ষেত্রপটে ব্যক্তি তার অনুগামীদের মধ্যযোগিতার মধ্যমন হিসাবে আত্মোদ্ধাসে ওদেরকে চূড়ান্তভাবে নিজ কামনা বাসনা চরিতার্থতার দিকে প্রবাহিত করে দেয়। ব্যক্তি প্রতিভার অনুগামীরা অংশীদার হয়ে ভাগ পায়। এইভাবে ক্ষমতালোভী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে।" —বিতর্ক মূলক বক্তব্য কিন্তু অস্বীকার করা খুব কঠিন।

'ভূমির ভাষায় সভ্যতার স্বরূপ'। এই গ্রন্থের সবচেয়ে ভাল প্রবন্ধ—মূল্যবান চিন্তাকণায় সমৃদ্ধ। এই প্রবন্ধের ভাব পরিষ্কার, ভাষা বেশ প্রাঞ্জল, কিন্তু বিশ্লেষণের আরো প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয়েছে।

শিল্প ও শিল্পী সম্বন্ধে তাঁর প্রশ্ন অতীব তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যঞ্জনাময়। তিনি বলেন : "শিল্পী বিশেষ কালের বিশেষ পটভূমিকাতে জাতীয় আবেগের রূপকার মাত্র" তাই বলে শিল্পীর গরিমা কমে যায় না। কেননা তাঁর ভাষায় : "সময়ের পরিপেক্ষিতে মানব চেতনার অস্পষ্ট আবেগকে রূপায়িত করার সামর্থ রাখে শিল্পী"—এটা ôঁ÷ ঈôঁôp - ÐÅ Personification of social thinking—এর চমৎকার বঙ্গীকরণ। এই চিন্তনের পটভূমিকায় লেখক ভারতের গুহা চিত্রের সঙ্গে পৃথিবীর গুহাচিত্রের তুলনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন "কোন জাতি, গোষ্ঠী এবং কালের বুকে মানব চেতনার যথার্থ ইতিহাস একমাত্র শিল্প স্পষ্ট চরিত্রে প্রকাশ করতে সমর্থ।"

'ভূমিজ দর্পণে ও মানব সভ্যতা' প্রবন্ধে লেখকের মূল চিন্তাধারা স্পষ্ট প্রকাশিত ও উদ্ভাসিত। প্রথম প্রবন্ধের সঙ্গে এই প্রবন্ধের মিল আছে। এই প্রবন্ধ আমাদের যথেষ্ট চিন্তার খোরাক যোগায়।

কী সে চিন্তা? সে চিন্তা হচ্ছে : "ভূমিজ প্রবন্ধ থেকে বিচ্যুত বাঙালীর প্রতিভা অনুকরণ ও অবলম্বনের সহজ পথে পা বাড়িয়েছিল।" তাই আলোর লোক সাহিত্যের পাশে শালীন সাহিত্য কেন কৃত্রিম মনে হয়। কেননা, সেই শালীন সাহিত্য ছিল বৃহত্তর জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন নির্বিচার বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণ নির্ভর। তাই লেখকের আক্ষেপ : "চণ্ডী মঙ্গল থেকে যে ধারা ছিল, সেই লেখক ধারা দেশ থেকে হারিয়ে গেল।" এই সম্পর্কে এইটুকু মাত্র বলা যায়, এই হারিয়ে যাওয়া ভাল হয়েছে না মন্দ হয়েছে তা মহাকাল বিচার করবে। আমাদের মনে হয় মহাকাল যাকে গ্রহণ করেছে আর যাকে বর্জন করেছে তা যেন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সাহিত্য সৃষ্টির যেসব উপাদান তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পেরেছেন, রাজটীকা তাঁর ভাগ্যে জুটেছে।

শেষ প্রবন্ধ 'বাঙালী ও বাঙালীয়ানা'। যথার্থ বাঙালীয়ানা কী এবং বাঙালীয়ানার স্পর্শযোগ্য রূপ কেমা তৈরির উদ্যোগে লেখক ইতিহাস রচনার পদ্ধতির কথা তুলেছেন। লেখকের মতে : "মানুষ ও মানুষের জীবন চর্চা ধ্যান ধারণার অন্তরালে থাকে এক গভীরতর উদ্দেশ্য। আছে নির্দারিত এক ধারা এবং প্রতিনিয়ত চলার মধ্যে থেকে অর্জিত কর্মফল হল জাতির যথার্থ পরিচয়"। এই ভূমিকা প্রকল্পনাতেই ইতিহাস রচনা করা দরকার। আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলে সব অল্টার্নেটিভ—তার দিকে লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন। বাঙালীদের কয়েকটা দিক তিনি এখানে দেখিয়েছেন—যেমন, "সুস্পষ্ট বিরোধিতার যে শক্তির পরিচয় তাই হল বাঙালীর বাঙালীয়ানা এবং ভূমিজ বাঙালীয়ানা গড়ে ওঠার প্রধান উপাদান। স্বধর্ম নিষ্ঠা ও স্বভাব বিরোধী উপাদানের বিরোধিতা করার বাঙালীর রক্তে ধর্মের প্রবাহ। বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ বাঙালীর রক্তে প্রবাহিত আবহমান কাল, সেই তা সনাতনধর্মী।

গ্রন্থে লেখকের ইতিহাস চেতনা নিজস্ব দৃষ্টি ভঙ্গীতে প্রকাশ। এখানে কোন অনুকরণের ছাপ নেই। তা সত্ত্বেও আবেগ নির্ভর আপ্ত বাক্য উচ্চারণের দিকে লেখকের ঝোঁক বেশি। তিনি বিশ্লেষণ একটু কম করেন, যুক্তির শৃঙ্খলাকে মনে রাখেন না।

ঋগ্বেদের ঋষি ঋতের পথে যাবার জন্য আকুল আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই ঋতের পথে যেতার জন্য লেখকের আকুতি আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। সেই ঋতের পথে আজো অনেকে আছেন। তাঁদের কাছে প্রত্যাবর্তন আজ আমাদের জরুরী হয়ে উঠেছে। ঋতের পথে কারা আছেন। লেখকের মতে ভূমিপুত্ররা বা ভূমিজ সভ্যতার ধারা সৃষ্টি তারা, ঋতের পথে আছেন।

যারা সত্য বিষয়ই গভীরভাবে ভাবতে চান, তাদের ভাবনাকে উদ্দীপ্ত করবে এই বই। লেখক রবীন্দ্র ভাবনায় ভাবিত। রবীন্দ্র চিন্তায় সমৃদ্ধ। এটা আমাদের উপরি লাভ। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-গ্রন্থরূপে এর সমাদর আমাদের কাম্য।

অমিয় শঙ্কর চৌধুরী
আখাউড়া

সগর্বে ফিরে দেখা—
পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট
সরকারের কুড়ি বছর

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ উন্নয়ন—
একটি নতুন দিগন্তের উন্মেষ

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য সদাই উজ্জীবিত। দারিদ্র ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য সামনে থেকে নেতৃত্বদান করে সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পূর্ণ রূপায়িত। ভূমির সংস্কার ও কৃষকদের মধ্যে বন্টন একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এতে পিছিয়ে থাকা গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করে সারা রাজ্যে অগ্রগতির জোয়ার এনেছে, যা আর একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপের সূচনা করতে চলেছে।

পঞ্চায়েতের কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কর্ম-পরিচালনার বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হয়েছে। গ্রামীণ উন্নয়নের রূপায়ণে পঞ্চায়েতের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে প্রমাণিত। ভূমিসংস্কার ও পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার জন্যই কৃষি উৎপাদনে সফলতা সম্ভব হয়েছে।

বিশেষ সাফল্য :

মার্চ ১৯৯৫-এ ৯.৫১ লক্ষ একর জমির সংস্কার ও বন্টন হয়েছে

শস্যের উৎপাদন ৬.৪ শতাংশ হারে প্রতি বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং খাদ্যের সবচেয়ে বেশি উৎপাদন সম্ভব হয়েছে

ভূমি সংস্কারে পঞ্চায়েত গ্রহণ করেছে এক দায়িত্বশীল ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামোন্নয়ন এখন একটি অনন্য সন্ধিস্থলে, একটি নতুন যুগের সূচনায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

D. O. NO.—3833 / ICA /
dt. 26.10.98

সংগ্রহ করার মত সাম্প্রতিক কালের কিছু উল্লেখযোগ্য বই

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর ভূতের দেশে হঠাৎ এসে (গল্প) বোকারাম চোখারাম (গল্প) ডুডুম ডুম (ছড়া)	**আনসার উল হকএর** কু ঝিক ঝিক রেলে গাড়ি (ছড়া) আইকম বাইকম (ছড়া) চিরন্তন (কবিতা)
মনোরঞ্জন পুরকাইত-এর আয় ছুটে আয় (ছড়া) দাঁড় ছপ ছপ নৌকো (ছড়া) এ নদী শঙ্খচিলের (কবিতা)	**হান্নান আহসান-এর** ছড়ার গাড়ি (ছড়া) ঝিকির ঝিকির (ছড়া) রহস্যময় রশ্মি (গল্প)
সুখেন্দু মজুমদার-এর ইচ্ছে নদীর গান (ছড়া) স্বপ্নের ঝুলি (গল্প) টাপুর এবং টুপুর (গল্প)	**বন্দনা ভট্টাচার্য-র** এসো কিছু ছড়া শিখি (ছড়া) ছোচ মামার ট্রাজেডি (গল্প) হুড়ুম রাজার বাঁশি (গল্প)
প্রণবকুমার পাল-এর পঞ্চ পুরুষ ও পাঞ্চালী (কাব্যগ্রন্থ) গোপাল দরজা ছুঁয়ে (কবিতা) ডাম্পি (ছড়া)	**বিশ্বনাথ রাহা-র** নিধু খুড়োর ঢাক (ছড়া) টুনটুনির পাঠশালা (ছবি ও ছড়া)
চন্দ্রচূড় ঘোষ-এর জিরাফ বুড়ো (গল্প) বোকারাম চোখারাম (গল্প)	**মানসী বালা-র** উড়লো টিয়ে জানলা দিয়ে (ছড়া)

● প্রাপ্তিস্থান ● ক্রান্তিক প্রকাশনী, স্টল নং ৩১, ব্লক-৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭২

গ্রাম বাঙলার পত্রপত্রিকা সমিতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

প্রবেশ সরকারের গ্রন্থাবলী :

কবিতা : দিগন্তে সবুজ ◻ উর্বশীর পূর্বাশা ◻ ভূত চতুর্দশী ◻ মীরা ফিরে এসো ◻ নিঃস্ব হয়ে যেতে ভালোবাসি ◻ ভালোবাসা ধূসর বিষাদ ◻ যন্ত্রণাবোধ

ছড়ার বই : পক্ষীরাজের বাড়ি ◻ উট চলেছে মরুর দেশে ◻ মজার মজার ছড়া (সারস্বতী পালের সাথে যৌথ ছড়ার গ্রন্থ)

গানের বই : মনের মধ্যে মনের মানুষ ◻ আমি কোথায় পাব তারে

ছোটদের গল্পের বই : দুয়েক রকম গল্প ◻ সোনালী সবুজের স্বপ্ন

অনুবাদ উপন্যাস : এই দেহ এই মন

সম্পাদিত ছড়া গ্রন্থ : মজার মোড়া একশ ছড়া

Selected Poems of Praesh Sarkar

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে : গল্পগ্রন্থ-স্বয়ম্বরা ◻ উপন্যাস-মাটির কাছাকাছি ◻ ভ্রমণ কাহিনী-ভারততীর্থের কথা কাহিনী,

পাওয়া যাবে : বঙ্গ সাহিত্য ও লোক সংস্কৃতি পরিষদ,

আনন্দম, ১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

গঙ্গা ভাগীরথী ও পক্ষীরাজের বাড়ি প্রকাশনী

আমতলা, পোঃ কল্যানগর, দক্ষিণ ২৪-পরগণা

With Best Compliments From :—

Singer India Limited.

ZONAL OFFICE 29 WATERLOO STREET
CALCUTTA—700069
Phone 248-3927, 3954, 3967
FAX 033-2486413

Automatic Zig Zag Sewing Machine
Home Appliances.
Refrigerator & Washing Machine
Colour & B / W Television
Needle & Oil
Audios.

SINGER
your Family Company.

হুকেল

সিঁদ কাটে গাট কাটে
কেটে করে চুরি
এমন চোর তো আছে
কত চুরি ডুরি
ইদানিং চুরি করে
কিছু ভুঁই ফোঁড়
চোরের আদলে তারা
বিদ্যুৎ চোর
ধক করে ট্যাপ করে হুকেল হুকেল
এইসব চোরেদের
স্থান হল জেল।

বিদ্যুৎ চুরির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

No-PR/28/1072
Dt. 20.11.98

With Best Compliments From

MAKHAN LAL RAY

FULIA TOWNSHIP, HOUSE NO. 4/W/3. P. O. FULIA COLONY,
WEST BENGAL. Pin-741402

Manufacturer of All Kinds of Handloom, Loom Parts, Warping Drum, Jacquard Machine, Dobby, Press Mechine, Charka, Loom Accessories, Govt. Order Suppliers throughout India.

শুধু ঘর নয়, ঘরের সাজসজ্জাই আসল

রুচিসম্মত ফার্ণিচার (কাঠ ও স্টীল)
পরিবেশনায়

শ্রী বিষ্ণু ফার্ণিচার

১ নং রেলগেট যশোহর রোড
হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

With
Best
Complements

ELDYNE ELECTRO
SYSTE□ S PVT. LTD.

8. MADAN STREET.
CALCUTTA-700072

Space

donated

by

A

Well

Wisher

দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের
শীর্ষ প্রতিষ্ঠানরূপে গ্রামবাংলার উন্নতিতে নিয়োজিত

দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল

স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এণ্ড রুরাল
ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড,
২৫ ডি, সেকস্‌পিয়ার সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০১৭

টেলিফোন নং ঃ- ২৪০-১১৩৮, ২৪৭-৭৮৭২, ফ্যাকস্ নং ঃ- ২৪৭-৭১২৮

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ উন্নতিতে শুধু কৃষিতেই নয় কৃষিজ বিভিন্ন শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারে কৃষিজ পরিবহনের ক্ষেত্রে ও গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পে ব্যাংকের ঋণ আজ অল্প সুদে সহজলভ্য। বর্তমান আর্থিক বছরে ১১৭·২৫ কোটি টাকা ঋণের পরিকল্পনা বিভিন্ন উন্নতিখাতে দেওয়া হচ্ছে। নবতম সংযোজন আমানত গ্রহণ, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি হতে—সাথে আছে অধিক সুদের সুবিধা।

With

Best

Compliments of

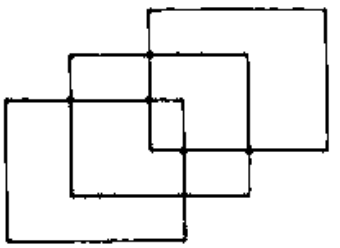

Modi Xerox

শত্রু যখন সাম্প্রদায়িকতা

প্রতিবাদ না করাই তখন অপরাধ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ-

D. O. NO.—3148-ICA \

বামফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্য

পঞ্চায়েতের অনুকূলে ক্ষমতা ও সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণ

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে বামফ্রন্ট সরকার এক অনন্য নজীর গড়ে তুলেছে। প্রকল্প রূপায়ণে স্থানীয় মানুষের সহায়ক কমিটি গঠনের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম আরও গণমুখী হয়ে উঠেছে। গ্রামসোয়নের পরিকল্পনা তৈরি ও কার্যকরী করার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ এবং তপশিলী জাতি উপজাতিদের জন্য জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী আসন সংরক্ষিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

D. O. NO.—3148-ICA \

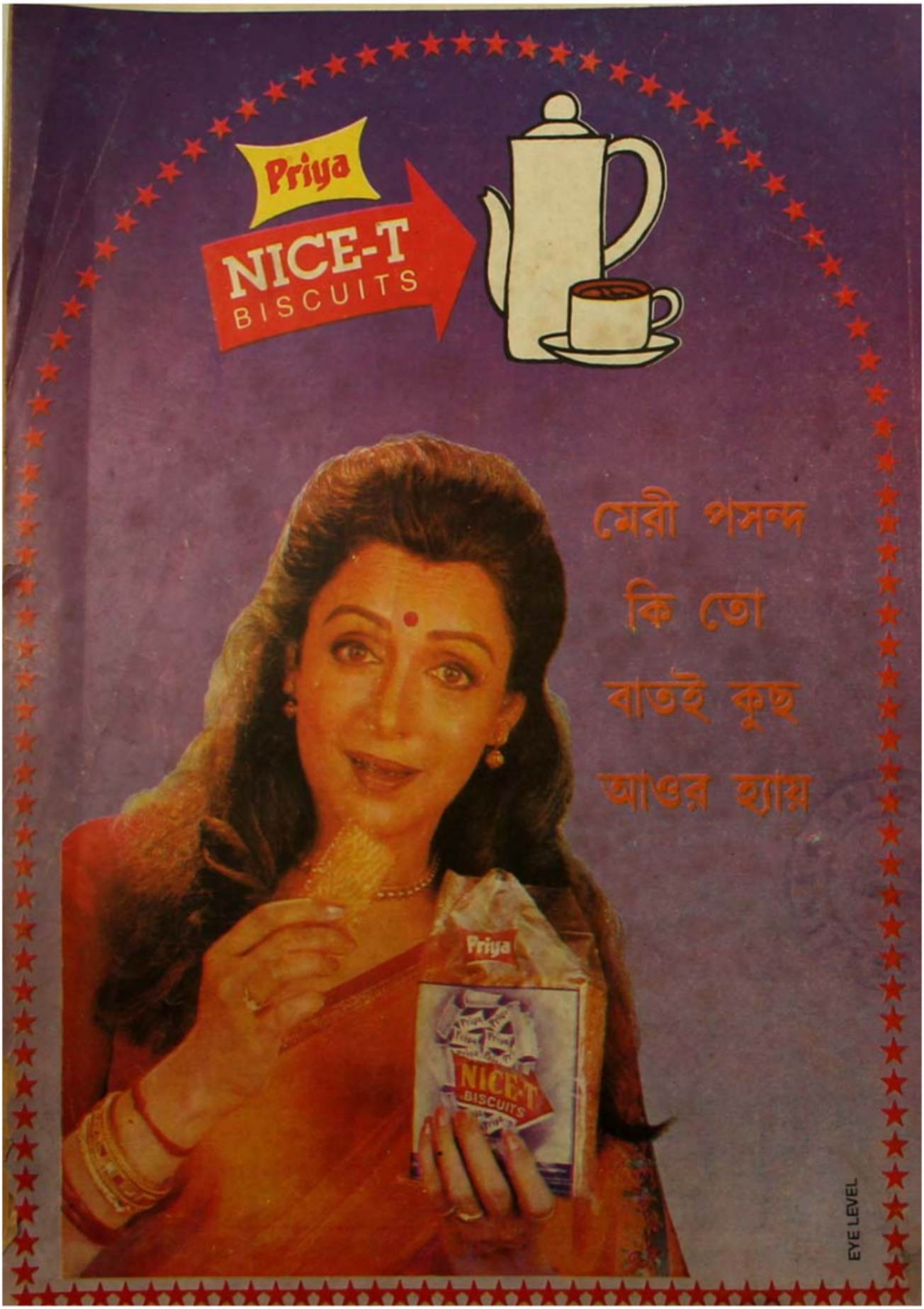
Priya
NICE-T
BISCUITS
মেরী পসন্দ
কি তো
বাতই কুছ
আওর হ্যায়
Priya
NICE-T
BISCUITS
EYE LEVEL